# মনের অভিযান

রিচার্ড থ য়েলসেন এবং জন কবলার

অনুবাদক

পরীক্ষিৎ

আর্ট য়্যাণ্ড লেটার্স পাবলিসার্স
৩৪, চিত্তরঞ্জন এভিনু
জবাকুসুম হাউস: কলিকাতা-১২

প্রকাশ করেছেন :
শ্রীপার্বতী সেন
আর্ট য্যাণ্ড লেটার্স পাবলিশার্স
৩৪, চিত্তরঞ্জন এভিন্যু
জবাকুসুম হাউস
কলিকাতা-১২


Published by Vintage Books, Inc.

প্রচ্ছদ-পরিকল্পনা করেছেন :
ভাস্করানন্দ রায়

ব্লক করেছেন :
লাইন য্যাণ্ড টোন
২, বেনিয়াপুকুর লেন,
কলিকাতা-১৪

ছেপেছেন :
শ্রীহরিপদ পাত্র
সত্যনারায়ণ প্রেস
১, রমাপ্রসাদ রায় লেন,
কলিকাতা-৬

# ভূমিকা

মন পাখা মেলে উধাও হয়ে চলে, আবার নিজের মধ্যে আত্মস্থ হয়ে বসে। যদি এই বই পাঠকের মনে কখনও আশঙ্কা ও কখনও আশ্বাসের সৃষ্টি করে তবে বুঝতে হবে এখানে কতকগুলি লোক মনের ওই দুই কঠিন কাজ নির্ভিকভাবে সম্পন্ন করেছেন। আর সে কাজ করেছেন বর্তমান যুগকে কেন্দ্র করে। ' মানুষের মনের দ্বৈত সত্তা আছে। মনের কাজও দ্বিবিধ। বাইরের জগতে সে অভিযানে বার হয়, আবার নিজের মধ্যে গুটিয়ে বসে। সে নূতনকে আবিষ্কার করে আর পুরাতনের স্মৃতির মধ্যে বিচরণ করে। দুটি কাজই করতে হলে প্রতিভার দরকার, আর সেই প্রতিভার স্বাক্ষর এই বইয়ের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। মানুষের জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যের নিদর্শনে, এই বইয়ের প্রতি পাতা আমাদের কখনও জানা জগতের কথা মনে করিয়ে দেয়, কখনও অজানা জগতে বিচরণের সুযোগ সৃষ্টি করে। এর যে-কোন একটি কাজ বন্ধ হলে সত্যই ভয়ের কারণ ঘটবে। অবশ্য এই বই-এর প্রবন্ধগুলি পড়লে আমাদের মনে সংশয় জাগবেই। কিন্তু এরই মধ্যে আশ্বাসের পথটাও দেখা যাবে। আলোড়ন জাগান বই-এর তালিকা তৈরি হচ্ছে শুনে একজন দার্শনিক মন্তব্য করেছিলেন, "ভাল কথা ; কিন্তু এমন সব বই-এরও একটা তালিকা চাই যা আমাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিকে দৃঢ়তর করতে সক্ষম হয়েছে, যা ঘূর্ণি হাওয়া নয়, কূল ভাসান সমুদ্রের তরঙ্গ নয়, পর্বতের বিশাল দৃঢ়তার সঙ্গে সে-সব বই হবে তুলনীয়। এই মনোজ্ঞ পুস্তকে সমুদ্র তরঙ্গের প্লাবন আর পর্বতের বিশালতা এই দুটোই আছে।

আর তা আছে এর বিভিন্ন বিভাগে। সত্যই বিভিন্ন বিভাগে একে ভাগ করা চলে কিনা জানি না। কিন্তু এই বই-এর লেখকদের মধ্যে কেউ বৈজ্ঞানিক কেউ ধর্মশাস্ত্রবিদ্, কেউ বা নৈয়ায়িক, কেউ বা ইতিহাসবেত্তা, কেউ বা শিল্পী। তবু বলব এক গভীর অর্থে এঁদের জীবন-জিজ্ঞাসার মধ্যে একটা ঐক্য রয়েছে। এই জিজ্ঞাসা বিভিন্নভাবে ও ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এঁদের মূল প্রশ্নটা বোধহয় এই যে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া আমাদের যে মন ও বুদ্ধি তার অব্যবহার ও অপব্যবহারের ফলে আধুনিক মানুষ কি

অবশেষে পাগল হয়ে যাবে? এই প্রশ্ন আজ অনেকের মনেই জেগেছে। এই বিজ্ঞানের যুগে যখন জ্ঞানের বিরাট যজ্ঞ চলেছে তখন আমরা কি করছি আমরা তা কি জানি? আমরা জগতকে রক্ষা করার পথে চলেছি, না তাকে ধ্বংস করতে চলেছি? আমরা প্রকৃতিকে আয়ত্তে এনেছি, না তারই নির্দেশে, তারই বশীভূত হয়ে চলেছি? ভয়ার্তকণ্ঠে প্রশ্ন জাগছে, "কে এর জবাব দেবে? কে এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে?" প্রশ্ন হচ্ছে, "আমাদের পৃথিবীর কি কোনও কেন্দ্র আছে? কেউ কি জানে সে কোথায়? সেখানে কি ঘটছে সে তো পরের কথা।" একটা সান্ত্বনার কথা এই যে বহুজনের সঙ্গে কয়েকজন জ্ঞানী-গুণী মানুষও এই উদ্বেগ বোধ করছেন। সমস্যাকে প্রথমে বুঝে ভাষায় প্রকাশ করা দরকার। তারপরে তার সমাধানের চেষ্টা করতে হয়। মানুষ তার প্রকৃত কোন সমস্যার সমাধান হয়তো কোনদিনই খুঁজে পায়নি। কিন্তু তার গৌরব এইখানে যে সে সমস্যাগুলি বুঝে ভাষায় প্রকাশ করতে পারে। এই বই-এর একুশজন লেখক আমাদের বর্তমান সমস্যার সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করছেন আমরা কি জানি আমরা কোথায় চলেছি?

আমরা, অর্থাৎ আমরা সকলে। কারণ মানবিক সত্তাকে যদি ভুলতে বসে থাকি তবে সেটা সকলের দোষ! পল টিলিস জানাচ্ছেন যে আজ আর কেউ শেষ প্রশ্নের কথা তোলেন না। যাজক দারসি বলছেন, "বিশ্বাসহীন মানুষের মন দুঃস্বপ্নে ভরা।" তাঁর মতে এই দুঃস্বপ্ন আজ সার্বজনীন হয়ে উঠেছে। এঁরা ধর্মশাস্ত্রের লোক, কাজেই এ প্রশ্ন তাঁদের মনে জাগা হয়তো স্বাভাবিক। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে কয়েকজন বৈজ্ঞানিকের মনেও এই জিজ্ঞাসা দেখা গেছে। পদার্থ বিজ্ঞানের গূঢ় তত্ত্ব-জিজ্ঞাসায় লিপ্ত ফ্রেড্ হয়েল বলছেন "এর জটিলতার কি কোন শেষ আছে," অর্থাৎ মানুষ পার্থিব জগতের নীতিগুলি হয়তো কোনদিনই বুঝতে পারবে না। রবার্ট ওপেন্‌হেমার তাঁর সুচিন্তিত প্রবন্ধের শেষে অনুচ্চ স্বরে বলছেন, "আমরা সহজে হার মানব না।" কিন্তু পরাজয়ের সম্ভাবনা যে রয়েছে তা তাঁর কথায় বোঝা যায়। তাই যদি হয়, যে-পৃথিবীকে একদিন করতলগত ভেবেছিলাম সে-পৃথিবী কোথায়? লরেন আইজলি চিন্তিত ভাবে প্রশ্ন করছেন, মানুষ কি জগতের সব চেয়ে বড় কুগ্রহ হয়ে দাঁড়িয়েছে? প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণের জন্য যন্ত্রের অনুসন্ধানের আগ্রহে সে কি নিজের পরিচয় ভুলে গেছে? বৈজ্ঞানিকেরা সম্পূর্ণ আশাহত না হলেও, তাঁদের মধ্যেও সন্দেহ জেগেছে। ইতিহাসবেত্তাদের মধ্যে আর্থার এম, স্লেসিনজার

ছোট ) ( Arthur M. Schlesinger, Jr. ) অভিযোগ করছেন যে যাঁরা বড়, যাঁরা মহৎ তাঁদের উপর আমরা বিশ্বাসের শক্তি হারিয়েছি। এডিথ্‌ হ্যামিলটন যখন সন্দেহ প্রকাশ করছেন যে আমরা গ্রীকদের স্বাধীনতার যে আদর্শ তার সঠিক ধারণা করতে পারি না, তাদের মত জ্ঞান-বুদ্ধির চর্চায় যে আনন্দ তা উপভোগ করতে পারি না, তখন তিনি বোধহয় সেই একই কথা বলছেন। স্যার হার্বার্ট রীডের মতে ওই জ্ঞান-বুদ্ধির আমরা অপব্যবহার করছি। আমরা এখন বস্তু-জগতের সঙ্গে মিলে, তার অংশীদার হয়ে তার ব্যবহারের মধ্যে নিজেদের পরিচয় ফুটিয়ে তুলি না। জগতকে বিমূর্ত-চিন্তাগত করার মত আবেগে শিল্পী হিসাবে আমরা ভুলে গেছি যে এই পৃথিবী, যাকে দৃশ্যগত ভাবে দেখছি ও অনুভব করছি তা আমাদের অস্তিত্বের মূল বস্তু। অন্যদিকে ক্লেমেণ্ট গ্রীনবার্গ বিমূর্ত শিল্পের সপক্ষে বলছেন যে সেই শিল্প-সৃষ্টি আমাদের ত্যক্ত মনে শান্তির প্রলেপ হবে। জ্যাকে বারজুন বলছেন মানবিকতার শিক্ষা একটি আয়না যার মধ্যে আমরা মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার অর্থপূর্ণ বিশৃঙ্খলতার ছবিটা দেখতে পাই।

আবিষ্কার করা ও স্মৃতির মধ্যে অবগাহন করা, এই দুই কাজের দায়িত্ব বিরাট ও এই বই-এ সেই দায়িত্ব প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এই জন্যই এর বিষয়বস্তু বহু পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় হবে। আমি সেই গুরুত্বজ্ঞান-সম্পন্ন পাঠকের কথা বলছি যারা সহজ উত্তরের জন্য ব্যস্ত নয়, যারা আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ মানুষের সঙ্গে কঠিন সমস্ত সমস্যার বিচার করতে প্রস্তুত। "মানুষ কি ?" এই প্রশ্ন অনন্তকাল থেকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে কিন্তু কোনও সময়ে এর স্পষ্ট জবাব পাওয়া যায় নি। কিন্তু সে কথা জেনেও যাঁরা এই প্রশ্নের উত্তর শুনতে চান তাঁরাই মহৎ পুরুষ, তাঁরাই অসাধারণ। এই প্রশ্নটা উঠেছিল সৃষ্টির গোড়ায় অতএব তার বয়স অনেক বলা চলে। কিন্তু নবজাত শিশুর মনেও এই প্রশ্ন জাগে, অতএব তাকে চির নূতনও বলতে পারি।

—মার্ক ভ্যান ডোরেন

# সূচীপত্র

## লরেন আইজলি

যুক্তরাষ্ট্রের নেব্রাস্কার অধিবাসী ও পরে কাম্‌জাস্‌ ও ওহায়োর ওবেরলিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লরেন আইজলি এখন পেন্‌সিলভেনিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের সভাপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের যাদুঘরের আদিম মনুষ্য বিভাগের কিউরেটর বা তত্ত্বাবধায়ক। The Immense Journey (১৯৫৭) নামে বই প্রকাশের পর ডাক্তার লরেন আইজলি তাঁর কল্পনা ও গীতি প্রকৃতি পরিবেষ্টিত মানুষ ও মানুষের প্রকৃতির বর্ণনার জন্য বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। Darwin's Century (১৯৫৮) বই-এ ডাক্তার আইজলি বিবর্তনবাদের ইতিহাসের কথা বলেছেন।

## জ্যাকে বারজুন

জ্যাকে বারজুন বলেন, "মানসিক প্রচেষ্টার আনন্দেই মানুষের শিক্ষার পরীক্ষা ও উপকারিতা। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের Dean of Faculties ও Provost, স্বাধীনতা, সঙ্গীত ও সাহিত্যের উপর বহু বই ও প্রবন্ধের লেখক, ডিন বারজুন নিজের পরিচয় দেন "সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ছাত্র" বলে। নামকরা লেখক ও পণ্ডিত হেন্‌রি বারজুনের পুত্র, জেক্‌স বারজুনের জন্ম ফ্রান্সে। ১৯১৯ সালে পিতার সঙ্গে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে যান ও কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া-শোনা করে পরে সেখানকারই ইতিহাসের অধ্যাপক হিসাবে কাজ সুরু করেন। জেক্‌স্‌ বারজুন তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেছেন। সমালোচক চার্লস জে, রোলোর কথায় তাঁর লেখা "বিরাট পণ্ডিত্বপূর্ণ, সহজ, সুন্দর ও বাঙ্ময়, তাঁর মধ্যে একটি অত্যন্ত বিদগ্ধ মনের ব্যাপক ছাপ ও শিল্প-জীবন সম্বন্ধে গভীর দৃষ্টির পরিচয় রয়েছে।"

## উইলিয়াম এস, বেক

উইলিয়াম এস, বেক্ সাধারণ পাঠকের কাছে আধুনিক জীববিদ্যার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাকারীদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর সর্বাধুনিক বইএর ( Modern Science and the Nature of Life ১৯৫৭ ), যাতে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার রয়েছে, যথেষ্ট খ্যাতি হয়। তিনি U. C. L. A. পারমাণবিক শক্তি কার্য-ব্যবস্থা ও N. Y. U.-এর সঙ্গে সংযুক্ত। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ঔষধ-বিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক ও জৈব-রসায়ন বিজ্ঞানের শিক্ষক হিসাবে ও ম্যাসাচুসেট্সের সাধারণ হাসপাতালের রক্ত সংক্রান্ত গবেষণাগারের অধ্যক্ষ হিসাবে ডাক্তার বেক্ কোষের রাসায়নিক রূপান্তর, এন্জাইমতত্ত্ব ও স্তন্যপায়ী প্রাণীর জীবকোষের জন্ম-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে গবেষণারত।

## পল টিলিস

পল টিলিস্ হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও Dvinity School Facultyর সভ্য। "বর্তমান মানব-সঙ্কটের প্রশ্ন ও ধর্মের প্রাচীন প্রতীকের অর্থের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয়ের পদ্ধতি" তাঁর ধর্মশাস্ত্র চর্চার বিষয়। হিটলারের অভ্যুত্থানের আগে তিনি জার্মানীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন। পরে নাৎসিজমের বিরুদ্ধে খোলাখুলি সমালোচনা করার ফলে তাঁকে স্বদেশ ছাড়তে হয়। ১৯৩৩ সালে ইউনিয়ন থিয়োলজিকাল সেমিনারির ( Union Theological Seminary ) আমন্ত্রণে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে যান ও ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত সেখানে অধ্যাপনা করেন। তাঁর কয়েকটি প্রধান প্রধান বইএর নাম : Systematic Theology , The Courage to Be ; Love, Power and Justice

## জে, রবার্ট ওপেনহেমার

জে, রবার্ট ওপেনহেমার ১৯৪৭ সাল থেকে প্রিন্সটনের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ( Institute for Advanced Study ) নির্দেশকের কাজ করছেন। হার্ভার্ড, কেমব্রিজ ও গোটিনজেন ( Gothingen ) বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞানে শিক্ষাপ্রাপ্ত, ডাঃ ওপেনহেমার ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ও California Institute of Technologyতে ১৮ বছর পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক হয়ে ছিলেন। ১৯৪৩-৪৫ সালে তিনি লস এলামসের ( Los Alamos ) গবেষণাগারের ( যেখানে প্রথম পারমাণবিক বোমা তৈরি হয় ) নির্দেশক ছিলেন। এই কাজে তাঁর অবদানের জন্য তাঁকে মেডেল ফর্ মেরিট ( Medal for Merit ) পুরস্কার দেওয়া হয়। পরে তিনি পারমাণবিক শক্তি কমিশন, হোয়াইট হাউস, স্বরাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা বিভাগে উপদেশকের কাজ করেন। ১৯৫৪ সালে তাঁর বিরুদ্ধে মকর্দমার শুনানির পরে, যে শুনানি সম্বন্ধে এখনও ঘোর মতবিরোধ রয়েছে, তাঁর নিরাপত্তা পত্র বাতিল করে দেওয়া হয়। তাঁর সর্বাধুনিক বই The Open Mind ( ১৯৫৫ )।

## এডিথ হ্যামিলটন

এডিথ হ্যামিলটন গ্রীক-রোমীয় সভ্যতার বিশেষজ্ঞদের অগ্রগণ্য। ওই সভ্যতার অনুশীলনে তাঁর জীবনের অর্ধকালের উপর কেটে গেছে। ১৮৬৭ সালে তাঁর জন্ম হয়। এই মহিলার লেখা দুটি বই The Greek Way ও The Roman Way এই বিশেষ ক্ষেত্রে ক্ল্যাসিকাল সাহিত্যের মর্যাদা পেয়েছে। Bryn Mawr কলেজ ও Leipzig ও Munich বিশ্ববিদ্যালয়ে এডিথ হ্যামিলটন উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৮৯৬ থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত তিনি Bryn Mawr স্কুলের প্রধান অধ্যাপিকা ছিলেন। ১৯৫৭ সালে, তাঁর পাণ্ডিত্য ও প্রগাঢ় সাধনার স্বীকৃতি হিসাবে গ্রীক সরকার তাঁকে এথেন্সের সম্মানসূচক নাগরিক পদ দেন।

# অল্‌ডাস্‌ হাক্সলি

প্রবন্ধকার স্যাটাযারিস্ট, সমালোচক, সাহিত্য-সাংবাদিক ও বহু উপন্যাসের লেখক ( Antic Hay, Point Counter Point, Brave New World, The Genius and the Goddess ইত্যাদি ) অলডাস হাক্সলির বিজ্ঞানেব সঙ্গে পবিবারগত যোগ আছে। তাঁব পিতামহ টি, এইচ, হাক্সলি ইংল্যাণ্ডের একজন বিখ্যাত প্রাণীবিদ্যাবিদ ছিলেন, তাঁর ভ্রাতা জুলিয়ান হাক্সলি সমসাময়িক যুগের প্রখ্যাত জীববিদ্যাবিদ। মন-পরিবর্তক মাদক সম্বন্ধে অলডাস হাক্সলির আগ্রহ এতই বেশী যে কয়েক বছব আগে মেস্‌কালিন ও সেই শ্রেণীর মাদকেব প্রভাব দেখার জন্য তিনি নিজের উপরেই পরীক্ষা করতে দেন। এই অভিজ্ঞতার উপব তিনি দুটি বই লেখেন। হাক্সলির জন্মস্থান ইংল্যাণ্ড ও শিক্ষা অক্সফোর্ডে। তিনি এখন লস এঞ্জেলসে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন।

# বিবর্তনবাদীর চোখে আধুনিক মানুষ

**নরেন আইজলি**

যে যন্ত্রযুগে আমরা বাস করছি ও যে যুগ তার প্রকৃতি জয়ের বার্তা স্বগর্বে ঘোষণা করছে সে যুগে নৃতত্ত্ববিদের কাছে একটি জিনিস স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। প্রকৃতিকে সত্যই আমরা জয় করতে পারিনি, কারণ নিজেদের উপরেই আমাদের আধিপত্য নেই। আধুনিক মানুষ নিজেকে "বুদ্ধিমান জীব" বলে জাহির করে। কিন্তু এই বুদ্ধিমান জীবটিই আজ মানুষের কাছে এক অজানা দুঃস্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষের নিজেরই দীর্ঘ কালোছায়া তার অস্থির রাত্রিকে আচ্ছন্ন করছে, সেই ছায়াই নিঃশব্দে রাজনীতিকদের পাদচারণ অনুসরণ করছে।

বেশীদিনের কথা নয়, আমি দেশের একটা বড় যাদুঘর ঘুরে দেখছিলাম। সেখানে একটি ঘরে মানুষের ক্রমবিবর্তনের ঐতিহাসিক নিদর্শন সংরক্ষিত রয়েছে। প্রদর্শন ব্যবস্থায় সহায়তা করেছেন দেশের বড় বড় পণ্ডিতেরা। আশা করেছিলাম এখানে মানুষের নিয়তির কোন চাবিকাঠি খুঁজে পাব, অল্প কথায় —তার প্রকৃতির পরিচয় পাব। একটা আণবিক যন্ত্রের সামনে এক বিরাট প্রশ্নবোধক চিহ্ন, আর বর্তমান মানুষের হাতে যে অবিশ্বাস্য শক্তির সম্ভাবনা রয়েছে তারই একটা নক্‌শা দিয়ে প্রদর্শনীটি শেষ হয়েছে। প্রদর্শনীকক্ষে যে প্রশ্ন দিয়ে মানবতার ইতিহাস শেষ করা হয়েছে তার সঙ্গে আমি এক মত, একথা বলাই বাহুল্য।

এবার আমি পেছনের দিকে ফিরলাম। যুগের পর যুগ অতিক্রম করে সুদূর অতীতে যেখানে এসে দাঁড়ালাম সেখানে দেখি খড়কুটোর আগুনের সামনে একটি জীব উবু হয়ে বসে আমার দিকে তার লোমশ ভ্রূ তুলে চেয়ে আছে, জীবটিকে মানুষ বলে চেনাই শক্ত। "শক্তির সোপান বেয়ে শিল্প-বিজ্ঞানের দিকে মানুষের প্রথম পদক্ষেপ—আগুনের আবিষ্কার"—শিরনামায় লেখা। ইতস্ততঃ এদিকে-ওদিকে ঘুরে আবার সেই ছোট্ট আগুনের সামনের জীবগুলির কাছে এসে দাঁড়ালাম, তার মধ্যে শিশুকে বুকে আঁকড়ে একটি নারীও বসে আছে। বড় হলঘরটার চারিদিকে আবার খুঁজে দেখলাম। মানুষের ইতিহাসের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ। বিজ্ঞান এর বাইরে কিছু দেখতে

চায়নি বা দ্রষ্টব্য বলে বিবেচনা করেনি। এখানে শিকারীর হাতিয়ার দেখান হয়েছে, কৃষির আবিষ্কারে অর্থনৈতিক বিপ্লব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। চোখের সামনে জনসংখ্যার বৃদ্ধি, নগর ও সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন সবই দেখলাম। আর দেখলাম এরই মধ্যে মানুষ তার শক্তির ভাণ্ডার পূর্ণ করে চলেছে।

আরও একটা দ্রষ্টব্য ছিল। অস্ত্র-সজ্জিত সামরিকবাহিনী। এই সামরিক শক্তি বেড়েই চলেছে যতদিন না এক মহাদেশ আর একটি মহাদেশের সামনে রণমূর্তিতে এসে দাঁড়িয়েছে। জটাধরা মুক্ত-কেশ নারী ও আগুনের সামনে উবু হয়ে বসা, তার পুরুষ-সঙ্গীর বংশধরদের হাতে পৃথিবীকে ধ্বংস করার শক্তি এসে জমা হয়েছে।

অতীতের ওই বিস্মৃত যন্ত্রগুলির সামনে আমি একটু দ্বিধান্বিত চিত্তে এসে দাঁড়ালাম। মনে হল মানব-জীবনের কোন সূত্র এখানে হারাচ্ছি, তার প্রাণের মূল বস্তুটা যেন খুঁজে পাচ্ছি না। ওই পাথরের অস্ত্র, শাণিত তরবারি ও গুলতিগুলিকে আমরা দূর থেকে একটা বিস্ময় দৃষ্টি নিয়ে দেখছি। "এই হল মানুষের ইতিহাস" চোখের সামনে লেখাটা ভেসে উঠল এবং তখনই বুঝলাম কোথায় ভুল হচ্ছে। বিংশ শতাব্দীর একজন আধুনিক আমেরিকান বা রুশীয়র চোখ দিয়ে অতীতকে আমবা দেখছি। আধুনিক আমেরিকান ও রুশীয়-দৃষ্টির মধ্যে মূলত কোনও প্রভেদ নেই।

সেই প্রদর্শনীতে শস্য, খনিজ তৈল ও আগুনের যে শক্তি আছে তার নানা নিদর্শন সর্বত্র ছড়ান ছিল, কিন্তু মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্বন্ধ, তাকে ঘিরে তাদের যে স্বপ্ন সে বিষয়েব কোন উল্লেখ দেখা গেল না। অথচ বার্নাড শ'র ভাষায়, মানুষ একমাত্র কাগজে-কলমে ও মস্তিষ্ক চালনার মধ্য দিয়েই তার জৈব ক্ষুধা-তৃষ্ণা, তার ইচ্ছা-অনিচ্ছাও তার সাধারণ ব্যক্তিত্বের উপরে উঠতে পেরেছে। জীব-জগতের যেটা সব থেকে বিস্ময়কর ও অসাধারণ কাহিনী, মূল্য-বোধযুক্ত মানুষের অভ্যুত্থান ও তার অস্পষ্ট স্বপ্নগুলির পরিশোধন ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আধুনিক জগতের মধ্যে তার বিকাশ, সে বিষয়ের সামান্যতম ইঙ্গিতও ওই বিরাট কক্ষের কোথাও ছিল না।

উদ্ভিদ ও পশুজগতের সঙ্গে মানুষও যে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অশেষ বিবর্তনের পথে সৃষ্টি হয়েছে, বিজ্ঞানের এ বিধান শিক্ষিত মানুষ আজ স্বীকার করে নিচ্ছে। কিন্তু তার মনে এ প্রশ্ন জাগছে না যে মানুষের ও পশুর বিবর্তনের মধ্যে প্রভেদটা কোথায়, বিবর্তনে মানুষের কী পৃথক

দায়িত্ব ও বিপদ বহন করতে হচ্ছে। গত যুগের উন্মত্ত ধার্মিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আমরা অতি সহজে বিজ্ঞানের অন্ধ প্রকৃতিবাদকে স্বীকার করে নিয়েছি। ফাউষ্টের শয়তানের মত একদিকে এই প্রকৃতিবাদ আমাদের নৈতিক দায়িত্বগুলি সীমিত করেছে, মার্জনীয় করেছে, কারণ আমরা প্রাকৃতিক বিবর্তনের নিয়মে লাঙ্গুলহীন বানরের বংশধর ছাড়া আর কিছু নই। অন্যদিকে ওই প্রকৃতিবাদ প্রকৃতির উপর আমাদের অশেষ ক্ষমতার অধিকারী করেছে, পার্থিব ভোগের সব পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

ডারউইন ও তাঁর শিষ্যের দল সেকালের মানব-ইতিহাসের সম্পূর্ণ নূতন ও বিস্ময়কর ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টায় পশুর সঙ্গে মানুষের যে সম্বন্ধ তার উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। সে সময় প্রস্তরীভূত জীবদেহ পরীক্ষা করে মানুষের বিবর্তনের কথা স্পষ্ট করে উপলব্ধি করার উপায় ছিল না। সেই কারণেও মানুষ যে নিম্নস্তরের জীবের থেকেই সৃষ্টি হয়েছে তা প্রমাণ করার আগ্রহে ডারউইন এপ্‌ম্যানের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক স্থাপনের জন্য কিছু আতিশয্য দেখিয়ে ছিলেন। ফলে মানুষের বিবর্তনের প্রথম অবস্থার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ডারউইন দ্বিধায় পড়েন। তাঁর এক মতে মানুষ সমুদ্রের মধ্যে ইডেন উদ্যানের মত কোন নির্জন দ্বীপে স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে প্রথমে জন্মলাভ করে। দ্বিতীয় মতে দেখা যায় সে প্রধান একটি মহাদেশে অন্যান্য জীবের সঙ্গে হিংস্র যুদ্ধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে নিজের অস্তিত্ব জাহির করেছে।

এই দুই সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ও একদেশদর্শী মতবাদের উল্লেখ করবার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে আমি বোঝাতে চাই মানুষের বিশেষ কয়েকটি গুণের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ডারউইন কি রকম দ্বিধায় পড়েন। আজ আমরা স্থির-নিশ্চয় যে মানুষ প্রাচীন কোন নরাকৃতি পশুর বংশধর। প্রতি বছর প্রস্তরীভূত জীবদেহ এর কোনও না কোন প্রমাণ আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরছে। সাধারণ মানুষ মানব-ইতিহাসের এই ব্যাখ্যায় অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। তারা মোটামুটি মেনে নিচ্ছে যে এই বাস্তব জগতে সংগ্রাম ও হীন কলহের মধ্যেই আমাদের বেঁচে থাকতে হবে। ডারউইন থেকেই এই ধারণার সূত্রপাত।

কিছুদিন আগে আমার এক বন্ধুর চিঠি পাই তাতে তিনি তাঁর মেয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন। তিনি দুঃখ করে জানিয়েছিলেন যে তাঁর মেয়েকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে মানুষ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—এক কড়া,

শক্ত প্রকৃতির মানুষ ও দ্বিতীয়, নরম প্রকৃতির। "তার অধ্যাপক কোন বিজ্ঞানে দক্ষ তার উল্লেখ কবার প্রয়োজন নেই, কিন্তু তিনি আমার মেয়েকে শিখিয়েছেন যারা কড়া মেজাজী তারাই জীবন-যুদ্ধে জয়লাভ করবে।"

এই পূর্ব-প্রচলিত বিকৃত মতবাদ আমাকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছে, ব্যথিত করেছে। এই বিশেষ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যাঁরা নিঃস্বার্থ পণ্ডিত তাঁরা অবশ্যই এমন কথা বলেন না। কিন্তু ওই মন্তব্য যে মনোভাব ব্যক্ত করছে তার প্রতিবাদ দরকার। ওই প্রতিবাদেব মধ্যেই মানুষের সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের কথা প্রকাশিত হবে। মানুষ যে তার কঠোর প্রকৃতির জন্য জীবন-যুদ্ধে জয়ী হয়েছে তা নয়, বরং তার কোমলতাই তাকে তার অস্তিত্ব। বজায় রাখতে সহায়তা করেছে। মানুষেব এই প্রকৃতি ডারউইন ও ওয়ালেসের মত বড় বিবর্তনবাদীকেও দ্বিধান্বিত করেছিল। উদ্ধত মানুষ হয়তো বলতে পারে শক্তিশালীরই জয় এবং দয়া স্নেহ ও প্রীতি দুর্বলতার লক্ষণ। কিন্তু ওই প্রচলিত মতবাদ সত্ত্বেও সত্য এই যে মানুষের হৃদয়ে যদি অন্য মানুষেব জন্য প্রীতি না থাকত, সে তার নিজস্ব বিশেষ নিয়মে অন্যকে যদি না ভালবাসতে পারতো, তবে বহুকাল আগেই তার হাড় আফ্রিকার জঙ্গলের বুনো কুকুরের খাদ্য হত। মনে রাখতে হবে ওই জঙ্গলেই মানুষ হয়ে ওঠাব চেষ্টায় সে সফল হয়েছিল। যে অধ্যাপকের কথা হচ্ছিল, যিনি ভবিষ্যৎ মায়েদের ক্লাশে কড়া মেজাজী হওয়ার উপদেশ দিয়েছিলেন, তাকেও এক সময়ে অতি দীর্ঘস্থায়ী ও অতি অসহায় শৈশব কাটাতে হয়েছিল। যদি আমাদের পিতা-মাতারা অধুনা প্রচলিত কয়েকটি জীবন-দর্শনকে মেনে চলতেন, যদি আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা এতদূর সংস্কৃত হতেন যে ক্ষণিক সুখের জন্য তাদের সামাজিক দায়-দায়িত্ব বিসর্জন দিতে পারতেন, তাহলে আমাদের অনেকের আজ আর জীবন ধারণের আনন্দ উপভোগ করা সম্ভবপর হতো না।

প্রকৃতিব অতুলনীয় দান মস্তিষ্ক, যা দিয়ে মানুষ তাপ ও পরমাণুর গবেষণা করে, তা আমাদের জন্মের নয় মাসের গর্ভ অবস্থার মধ্যে পরিণত হয়ে গড়ে ওঠে না। এই মেধা আবার এমন ধৃতিশীল বস্তু দিয়ে তৈরি যা আমাদের সামাজিক পরিবেশের ছাপ গ্রহণ করতে পারে। এখানে পশুদের সহজ প্রবৃত্তির বিকাশ অল্প। শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমাদের মস্তিষ্ককে পরিণত হয়ে গড়ে উঠতে হয়। এবং এই মস্তিষ্ক গঠন সম্ভব হয় জন্মের পরে। ফলে শিশুকে এই জগতে প্রবেশ করতে হয় অত্যন্ত

অপরিণত ও অসহায় অবস্থায়। মানুষের শৈশব দীর্ঘস্থায়ী কারণ জন্মের পরে তাকে তার সমাজের কাছ থেকে অনেক তথ্য জানতে হয়, ব্যবহারিক রীতি-নীতি শিখতে হয়। তাকে কথা বলার জটিল যন্ত্রটিকে আয়ত্তে আনতে হয়।

অন্যান্য জীবের তুলনায় মানব-শিশুদের শিক্ষার দায় অনেক বেশী। এইজন্য নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে যেখানে একটা সাময়িক যৌন-জীবনই যথেষ্ট সেখানে মানুষের জন্য চাই অবিরত পারিবারিক আবহাওয়া। ছোটখাটো বিষয়ে বিভিন্ন সমাজের পারিবারিক জীবনে পার্থক্য আছে। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে শিশুর লালন-পালনে স্নেহ ও যত্নের যে প্রয়োজন তা সব সমাজেই সমান।

সব সম্প্রদায়েই যে সামাজিক নিয়ম-কানুন রয়েছে তার পিছনে রয়েছে শিশুর মঙ্গল কামনা। পিতামাতার ভালবাসা দিয়ে মানুষের জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতার সুরু হয়। এই স্নেহ তার সমস্ত শৈশবকালটা ঘিরে থাকে। অতএব যে মানুষ তার হৃদয়ের প্রেমকে অস্বীকার করে, যে দায়িত্ব গ্রহণের ফলে তার নিজের অস্তিত্ব সম্ভব হয়েছে সেগুলিকে উপেক্ষা করে এবং বেঁচে থাকার জন্য কঠোরতা ও সংগ্রামের প্রয়োজনের কথা জোর গলায় জাহির করে, সে মানুষ নিজের মানব-ঐতিহ্যকেই অস্বীকার করতে চায়। কারণ মেধার ক্রমবর্ধন ও সেই সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে শিশুর লালন-পালনে স্নেহশীল অভিভাবকের আগ্রহ না থাকলে বহুদিন আগেই মানুষের অস্তিত্ব লোপ পেয়ে যেত।

আমরা মানব-জীবনের সরল তথ্যগুলি অবাধে, তাব গুরুত্ব না বুঝেই মেনে নি। শিশুর সঙ্গে প্রাপ্তবয়স্কদের পারস্পরিক জীবনের বিস্ময়কর সম্বন্ধ ও সমন্বয় বিবর্তনের ছাত্রের কাছে জীব-জগতের এক অদ্ভুত ঘটনা। পৃথিবীতে কয়েক কোটি বছর আগে প্রাণের সঞ্চার হয়েছে। বিস্ময়ের কথা এই যে ওই কয়েক কোটি বছরে শুধু এক শ্রেণীর জীবে, মানুষের অভ্যুত্থানের মধ্যে, অমন একটি অদ্ভুত সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে। আমাদের মনুষ্যত্বের যা-কিছু সত্য, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের শিক্ষা ইত্যাদি তার মূলে রয়েছে আমাদের পারিবারিক জীবন। মানুষ স্নেহ-প্রীতির মধ্যে জন্মায় ও অন্যান্য জীবের তুলনায় দীর্ঘকাল ধরে স্নেহ-প্রীতির মধ্যেই বেড়ে ওঠে। কিন্তু মজার কথা এই যে ওই মানুষই প্রেম-প্রীতিকে তাদের জীবন-দর্শন থেকে বাতিল করতে চাইছে কঠোরতার মধ্যে, শক্তিমত্তার মধ্যে বাঁচতে চাইছে।

দেখা যাক্ কি করে নূতন প্রাণোদ্ধত ও একদা উচ্চাশার অধিকারী মানুষের পূর্ব-পুরুষ বিমূর্ত চিন্তার আধাররূপে তার মস্তিষ্ক সৃষ্টি করে প্রকৃতির বিশিষ্ট ফাঁদ থেকে মুক্ত হতে পেরেছিল এবং আজ কি করে সেই মানুষই ওই ফাঁদে ধরা পড়ার বিপদ ডেকে এনেছে। এমারসন বলেছেন, "মানুষ নিজের কাছে একটি বামন মাত্র।" আজ এত শক্তির অধিকারী হয়েও, মানুষ বোধহয় এত ক্ষুদ্র শক্তি আর কখনও ছিল না। তার একটিমাত্র স্বাস্থ্যের লক্ষণ এই যে সে আজও তার নিজেরই সৃষ্ট যান্ত্রিক-কীর্তির আবরণ ভেদ করে তার চারিপাশের জগতের দিকে অসন্তোষের দৃষ্টিতে তাকাতে পারে।

তার এ মনোভাবের যথেষ্ট কারণ আছে। মানুষ ইতিপূর্বে বহির্জগতের এত বিরাট কীর্তির মধ্যে কখনও বাস করেনি, যন্ত্রের মধ্যে নিজেকে কখনও এতটা দান করেনি। কিন্তু সেই সঙ্গে মানুষের স্বপ্নের যা-কিছু মহৎ দিক তা তার জীবনে নিষ্ফল হয়েছে। সেদিক দিয়ে সে ঘোর নিরাশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। পশু-জীবনের স্মৃতি মানুষের আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষাকে, তার পাপ প্রবৃত্তিগুলিকে কাটিয়ে ওঠার ইচ্ছাকে, ক্রমশ ক্ষয় করে আনছে। মানুষ মঙ্গলগ্রহে উড়ে যেতে চায় পিছনে থাকে অমঙ্গলের ছায়া। মঙ্গলগ্রহে যাওয়ার বাসনা তার যুবকোচিত পলায়ন-প্রবৃত্তিরই একটি নিদর্শন। এই জগতে তার সমস্যাগুলিকে সমাধানের চেষ্টা না করে সে অন্য একটি গ্রহকে তারই সমস্যার বীজে সংক্রামিত করতে চায়।

আজও বৈজ্ঞানিকেরা নূতন নূতন আবিষ্কারের উৎসাহে সাধারণ লোকের কাছে ভবিষ্যতের যে ছবি তুলে ধরেন তাতে শুধু আরও নূতন উদ্ভাবন, আরও শক্তির সঞ্চয়, আরও ভয়ঙ্কর অস্ত্র ও বোতলে ভরা শিশুর প্রতিশ্রুতি পাই। এদের মধ্যে অল্পজনই জীবনের মূল্য, নীতিশাস্ত্র, কলাবিদ্যা বা ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামান। অথচ জীবনের এইসব অপ্রত্যক্ষ প্রকাশই আমাদের সভ্যতার প্রকৃতি নির্ণয় করে, তার মধ্যে নিষ্ঠুরতা, না মানবতার বিকাশ ঘটবে তা নির্দিষ্ট করে। এইসব অপ্রত্যক্ষ বস্তুই আমাদের অন্তর বাহিরের জগতের মত রেখাহীন ইস্পাতের মত হয়ে গড়ে উঠবে, না মানবতার সত্য অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ঐশ্বর্যশালী হয়ে উঠবে তা নির্দিষ্ট করে। বৈজ্ঞানিকদের এইসব বিষয়ে উদাসীনতা, অনাগ্রহ থেকে বোঝা যায়, মানুষ জীবনের বাহ্যিক আতিশয্যে কতটা মেতে তার আসল উদ্দেশ্য ভুলতে বসেছে, মানুষের ঐতিহ্যের সব উপাদানের প্রতি কিভাবে তারা অবজ্ঞা দেখাচ্ছে।

সম্প্রতি একজন সামরিক নেতা ভবিষৎ বাণী করেছেন, "শূন্যে যুদ্ধ লড়া হবে"। তিনি আরও উপদেশ দিয়েছেন, "জীবনে যা-কিছু কঠোর ও নিষ্ঠুর জিনিস সে বিষয়ে বালকদের আগে শিক্ষা দাও।" কিন্তু শিক্ষকের জিজ্ঞাস্য, "কেমন হবে সে কঠোরতার শিক্ষা?" কারণ বালকের মন গড়ে উঠবে তার শিক্ষার মধ্য দিয়েই। আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি ও মহানুভবতা না থাকলে, যান্ত্রিক, প্রসার ও ক্ষমতার লোভ অতিক্রম করার সামর্থ্য না থাকলে, মানুষ প্রকৃতি ছাড়া এক জীবে পরিণত হবে, তার নিজেরই মস্তিষ্ক প্রসূত এক দৈত্য সৃষ্টি করে বসবে, এর চেয়ে বড় বিভীষিকা আর কিছু নেই।

একথা ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, ইতিহাস পাঠের মধ্যে যদি আমরা আমাদের নীতি-নিভাবনার সমর্থন খুঁজি, যদি পশুবংশে জন্ম বলে "আমাদের চিরকাল যুদ্ধ করতে হবে" এমন সামরিক উক্তি স্বীকার করি, তবে বলতে হবে আমাদের ইতিহাস পাঠ অসম্পূর্ণ। একথা সত্য মানুষ জন্মাবার আগে পর্যন্ত জীবনের বিবর্তনে শক্তির প্রকাশটাই প্রধান ছিল। আংটা, বঁড়শি, সাঁড়াশি নিয়ে একটানা যুদ্ধ ও জয়ের প্রচেষ্টা সেখানে দেখতে পাই। তখন জড় জগতের অন্ধশক্তি জীবনের রূপ নির্ধারণ করেছে। জীবের তখন ছিল শুধু একটা ইচ্ছা-শক্তি, হামা দিয়ে হাঁটার ইচ্ছা, প্রকৃতি থেকে আপনাকে রক্ষা করার জন্য একটা ফাটল বাসায় আশ্রয় নেবার ইচ্ছা, জড়বস্তুর পাহাড়ে পা রাখার জায়গা অধিকারের ইচ্ছা, ও যে প্রাকৃতিক শক্তি জীবনকে বিক্ষিপ্ত ও বিনষ্ট করে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার ইচ্ছা। এই প্রাক্-মনুষ্য যুগে এমন কোনও প্রাণী ছিল না যে অতীত ও ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করতে পাবে। তখন কোন প্রাণী অন্য আর এক প্রাণীর সমাধির উপর চোখের জল ফেলেনি। সে যুগে জীবের সমগ্র সত্তাকে জানার কোনও উপায়ই ছিল না।

এই অবস্থা চলেছিল তিন লক্ষকোটি বছর ধরে। তারপর একদিন মাথার মধ্যে ছোট একটি আঘাত নিঃশব্দ আলোড়ন তুললো। এক হিসাবে ওই ছোট আঘাত জগতের সবচেয়ে বড় বিস্ফোরণের সমান। কারণ তারই মধ্যে ভবিষ্যতের সব সম্ভাবনা সুপ্ত ছিল। গত দশ লক্ষ থেকে ছয় লক্ষ বছরের মধ্যে মাঝামাঝি কোনও সময়ে স্থলবাসী এপ্‌ম্যানের মোটা চামড়ায় ঢাকা মাথার খুলিতে একটা ধূসর জিনিস হঠাৎই বাড়তে সুরু করল। এই ধূসর পিণ্ডের মধ্যেই পরমাণু বিভাজনের ঝলসান উত্তাপ ও হাইড্রোজেন বোমার গভীর রক্তবর্ণ দাহনের সম্ভাবনা লুকিয়ে ছিল।

ঘটনাটি ঘটল নিঃশব্দে। ছোট হাড়েব আচ্ছাদনে ঢাকা স্নায়বীয কোষগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি হতে লাগল অত্যন্ত দ্রুতবেগে কিন্তু নিঃশব্দে। বনের ফাঁকা জায়গায় রাত্রেব অন্ধকারে বিবাট কোনও ব্যাঙেব ছাতা এমনই নিঃশব্দে গজিয়ে ওঠে। ঘটনাটিব মধ্যে একটা গভীব অনির্দিষ্টতা ছিল। যে অনির্দিষ্টতা দেখা যায যখন প্রকৃতি তাব নিজের খেযালে নিযমের বাধা কাটিযে একটা নূতন ও অচিন্তিত পরীক্ষায় নামে। মস্তিষ্কের মধ্যে ওই নিঃশব্দ ছোট বিস্ফোরণের প্রভাব আজ সৌরজগতেব উপরেও গিয়ে পড়েছে। মস্তিষ্ক বিবতনের ফল বটে কিন্তু তাতে তার যে বৈশিষ্ট্য তাব মূল্য কমে না।

চিরন্তন দর্শক তিন লক্ষকোটি বছব ধরে এঁটেল মাটি ও তাব রূপান্তব দেখতে দেখতে ক্লান্তিতে মুখ ফিবিযে নিয়েছিলেন। অবশেষে একটা ছোট নগণ্য প্রাণীকে কোমবেব উপর ভর দিযে খোলা পতিত জমির মধ্যে পাথরের একটা স্তূপের পাশে বসে থাকতে দেখা গেল। সে একটা কাঠের টুকরোব একটা দিক আপন মনে কামড়াচ্ছিল। এই জীবটিই বিবাট এক বিস্ফোরণের সূচনা করেছিল। তার মাথায দেবলোকে ও পৃথিবীব মধ্যে যে বামধনুব সেতু বিস্তৃত তাবই একটা ছটা দেখা দিযেছিল।

সেই মুহূর্তে মানুষেব পূর্ব-পুরুষ বস্তু জগতেব দ্বাবা চালিত না হযে, বস্তু গড়তে শেখে। কিন্তু সেই সঙ্গে তাব মধ্যে জীবনের সঙ্গে মানিয়ে চলাব, তার উপযোগী হওযার যে সহজ প্রবৃত্তি ছিল তা লোপ পেল। মানসবিজ্ঞানবিদ ইউং ঠিকই বলেছেন, 'আমাদেব জগতে চেতনা যে এত নিঃসঙ্গ তাব প্রথম কারণ মন তার সহজ প্রবৃত্তি হাবিযেছে। এ ঘটেছে যুগ যুগান্ত ধবে মানুষেব মনের ক্রমবিকাশেব ফলে।"

কিছুদিন আগে ক্রমবৃদ্ধি ও বযবৃদ্ধি সম্বন্ধে যে সম্মেলন হয তাতে আমাব সহকর্মী, Dr. W M. Krogman, একটি প্রবন্ধে বলেছিলেন, "মস্তিষ্কের ধূসব অংশে শিক্ষা গ্রহণের যোগ্যতাযুক্ত মানুষেব যে মন তা মানুষকে বস্তুর সংখ্যার চেযে তাব গুণেব দিকে বেশী আকর্ষণ কবছে।" অথাৎ মানুষ মূল্য-স্রষ্টিকারী জীবে পবিণত হযেছে। মানুষ তাব উদ্দেশ্য স্থিব কবে ও প্রকৃতি ও অদম্য জড়শক্তিকে তার ইচ্ছাব অধীনে আনবাব চেষ্টা কবে। এইভাবে মানুষ আংশিক শারীরিক বিবর্তনের স্তর পার হযে যন্ত্রের মধ্য দিয়ে তার সেই আংশিক শক্তির বিকাশ ঘটিযেছে। এই হিসাবে মানুষ সম্পূর্ণ অতুলনীয় জীব। যথেষ্ট মেধা থাকার জন্য তার শারীবিক পরিবর্তনের বিশেষ কোনও প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু তার চারিদিকে অন্যান্য প্রাণীকে প্রকৃতির নির্বাচন-

রীতির অধীন হতে হয়েছে। এর জন্য পাহাড়ে বুকে-হাঁটা জীব যে স্বাধীনতা কোনদিন পায়নি মানুষ তা লাভ করেছে। হেনরি বার্গস যেমন বলেছিলেন, "মানুষের মধ্যে অমীমাংসার আর একটা ভাণ্ডার রয়েছে। ভাল-মন্দ নির্বাচন করার ক্ষমতা তার অপরিসীম।"

এইটাকেই আমি মানুষের অপ্রাকৃত দিক বলছি। তার অর্থ এমন জীব আমাদের গ্রহে আর নেই। ডারউইনও বলেছেন যে, মানুষের ক্ষেত্রে তাঁর সীমিত উৎকর্ষবাদের নীতি অচল। এই নীতি বলে জীবের বিবর্তন শুধু সেইটুকু ঘটে যাতে সে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে বেঁচে থাকতে পারে বা পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারে। শরীরের কোন একটা অংশ যেমন চোখ বা দাঁত, তার উৎকর্ষ ঘটে কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে, বিশেষ লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য। কিন্তু মানুষের মানসিক শক্তির উৎকর্ষতার কোন সম্ভাব্য সীমা ডারউইন খুঁজে পাননি।

এক সময়ে মনোবিদ্যাবিদেরা মনে করতেন যে, সৃষ্টির সময় মনুষ্য প্রকৃতিতে বিভিন্ন পৃথক কর্ম-ক্ষমতার সমাবেশ হয়েছিল। মন একটা অপরিবর্তনীয় বস্তু যা ইতিহাস রচনা করতে, ইতিহাসকে ধারণ করতে পারে। এখন অবশ্য ধরা হচ্ছে যে, মন দেহের মতই পরিবর্তনশীল, বাহিরের চাপে ও প্রভাবে তার আকার বদলায়। পরিবর্তনের রীতিটা কিন্তু সাধারণ নয়। অপরিবর্তনীয় মন বলে বোধ হয় কখনও কিছু ছিল না তবে সামাজিক জগতে তার অবস্থিতি সেই স্থির মনেরই বাঞ্ছিত রূপ। মানুষের নির্বাচন করার ক্ষমতা তার সম্পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছা-শক্তির পরিচায়ক। কিন্তু এই স্বাধীন ইচ্ছা-শক্তির নৈতিক অর্থ মহান আধ্যাত্মিক নেতা ছাড়া আর কেউ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি।

তার কীর্তির চূড়ায় উঠে মানুষ আজ দুটি বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছে, যা তাকে বিবর্তনের আংশিক উন্নতির জগতে অভাবনীয় ভাবে আবার পিছিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এ দু'টি হ'ল তার যন্ত্রপাতি ও তার প্রয়োগ-পদ্ধতি বিষয়ের চিন্তা।

এক এক সময় মনে হয় মানুষ তার সৃষ্ট-জগৎ নিয়ে এতখানি লিপ্ত যে তার সামাজিক জীবনে যে ফাঁক তা সে এখনই ভুলতে বসেছে। তার অতীত, তার পশু-জীবনস্তরের সীমাবদ্ধতা তাকে গভীর ভাবে প্রভাবান্বিত করেছে। ফলে সে তার আধ্যাত্মিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ মর্যাদা দিতে পারছে না। সেই সঙ্গে, সে যান্ত্রিক প্রসারকে যে প্রসার তাকে জৈব নির্বাচনের খেয়ালের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দিয়েছে, তাকে প্রগতি বলে ভুল করছে। এক হিসাবে মানুষ

লুপ্ত বিরাট দেহ সরীসৃপের (ডায়ানোসাব) পথে চলেছে, যদিও তার চলার রীতিটা নূতন ও ভিন্ন।

কোরিয়া যুদ্ধের সময় একদিন রাত্রে ওমিংএর জঙ্গলে আমি একজন পুরানো শিকারীর সঙ্গে শিবিরের পাশে আগুন জ্বেলে বসেছিলাম। আমাদের চারপাশে অন্ধকার পাহাড়ের গায়ে ভূতাত্ত্বিক স্তরে কত ডায়ানোসারের দেহাবশিষ্ট প্রোথিত ছিল। আমার সঙ্গীটি আগুনে একটা কাষ্ঠ গুঁজে দিলেন। তার শিখায় বৃদ্ধ সেই মার্কিনবাসীর তামাটে মুখ দেখতে পেলাম আগুনের দিকে চেয়ে আছে। অতীতের যে কোনও যুদ্ধ-সীমান্তে এমন মুখচ্ছবি দেখতে পাওয়া যেত। সেই যুদ্ধ-সীমান্তই আজ কথা কয়ে উঠল।

"আমেরিকার একটা ক্ষমতাশালী শত্রু দরকার। তাতে দেশের লোকের গায়ে মেদ্ জন্মাবে না, তারা শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা করবে।" কোরিয়ার বৃদ্ধটির দু'টি ছেলে ছিল।

আমি সন্দিগ্ধভাবে ঘাড় নাড়লাম। এইটাই যুদ্ধ-সীমান্তের দর্শন, জঙ্গলের নীতি। কিন্তু মানসচক্ষে আমি আশে-পাশের পাথরে বিলীন বিরাটদেহ সরীসৃপের নিয়তিটা যেন দেখতে পেলাম। ওই সব অতিকায় জীব লড়াই করেছে, বজ্রনাদ তুলেছে, পায়ের দাপটে পৃথিবী কাঁপিয়েছে, স্ফীতকায় হয়ে অতি কঠিন হাড়ের বর্মে শরীর ঢেকেছে, দাঁত করেছে ভালুক ধরা ফাঁদের মত। তাদের লেজে ও কপালে তীরের ফলাগুলো শানিয়ে উঠেছে। তবু অবশেষে তাদের সমস্ত কলরব নিয়ে তারা অন্তর্হিত হয়েছে, আর তাদের ছেড়ে যাওয়া জায়গায় দ্বিধাভরে এসে দাঁড়িয়েছে ছোট ছোট ইঁদুরের মত স্তন্যপায়ী জন্তু ও কয়েকটি পাখি। এই শরীরভিত্তিক আংশিক উৎকর্ষতার যুদ্ধে, যারা যুদ্ধে নেমেছিল তারা জেতেনি, জয়যুক্ত হয়েছিল ছোট অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান কতকগুলির জীব যারা গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছিল।

আমার বন্ধুটি আবার বললেন, "আমাদের ক্ষমতাবান একজন শত্রুর দরকার।" সাইবেরিয়ার জঙ্গলে মানচুরিয়ার সমতল ক্ষেত্রে এইরকম কথাই যে বলা হয় তাতে আমার সন্দেহ নেই। বস্তু-জগতের আংশিক উৎকর্ষের জন্য কারিগরের দল দ্রুত তালে কাজ করছে, তাল বাড়ছে, আরও দ্রুত হচ্ছে। আধুনিক শিল্প সংক্রান্ত বিবরণী বলেছে, "বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনিয়ারদের নিজের নিজের কর্ম-বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে আবদ্ধ রেখে আরও বেশী কাজে লাগানো যেতে পারে। এই বিবরণী বস্তু-জগতের বিভেদ ও আংশিক উন্নতির জন্য কাটাকাটির পুনঃপ্রবর্তন ঘোষণা করছে এবং এ যুদ্ধ চললে আমাদের মনুষ্যত্বের সব উপাদান

আমরা হারাব। এইসব উক্তি থেকে বোঝা যায় একমাত্র সৃজনীশক্তিসম্পন্ন জ্ঞানী মানুষই যে তার পরিবেষ্টনীর উপস্থিত অবস্থা কাটিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেন তা আমাদের এখনও বোধগম্য হয়নি। এঁরাই আজকের নূতন প্রবর্তক, ধর্ম-প্রচারক, কলাবিদ—এমন লোকই সকল যুগে Lancelot whyte এর কথায় "মনুষ্যত্বের সৃষ্টিকর্তা।"

জন বারোজ বলেছিলেন, "মানুষ বন্যপশুর শিক্ষকের মত। এক মুহূর্তের জন্যও সে যদি তার শাসন শিথিল করে তার জীবন বিপন্ন হয়ে ওঠে। মাধ্যাকর্ষণ, বিদ্যুৎ, আগুন, বন্যা ও প্রবল ঝড় মানুষকে গুঁড়িয়ে গ্রাস করে ফেলবে যদি তার হাতটা কেঁপে যায় কিম্বা বুদ্ধি গুলিয়ে ওঠে।" দুর্দম প্রকৃতি মানুষকে আঘাত দিয়েছে সত্য, কিন্তু সুগঠিত ভাবে মানুষের ধ্বংসের জন্য সে নিজেকে প্রস্তুত করেনি। বরং প্রকৃতির খেয়াল মানুষকে কখনও কখনও উপকৃত করেছে, তার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ করে তোলার সুযোগ দিয়েছে। হিম-প্রবাহের অপ্রতিহত গতি মানুষকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত পিছিয়ে পড়তে বাধ্য করেছিল ও ইউরোপ থেকে তাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছিল। আগ্নেয়গিরির জলন্ত কাদার তলায় তার হাড় চাপা পড়েছে। অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ ও ঝড়-ঝঞ্ঝার অবিরত ধাক্কা তাকে সহ্য করতে হয়েছে। মানুষ বড় বড় সহরের পতন দেখেছে যে সহরে নিপুণ কারিগর ও কৌশলী যন্ত্রবিদের অভাব ছিল না। আবার শত্রু জল সরবরাহের পথ বন্ধ করার ফলে বড় বড় সহরকে সে বালুকারাশিতে পরিণত হতে দেখেছে।

এই শত্রু কে? শত্রু-মানুষ নিজে। বিরোধী প্রকৃতির যে মূর্তিকে সে ভয় পেয়েছে, তার নিজের মধ্যেই সেই প্রকৃতির প্রকাশ ঘটেছে। এই যুগে মানুষ যখন বিদ্যুৎকে হাতের মুঠোয় পেয়েছে, যখন তাঁর তৈরি যন্ত্রের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মাত্রার তাপ ধরা পড়ে কাঁপছে, তখনই মানুষেরই ক্রমবর্ধমান কাল ছায়া পৃথিবীর সব পরীক্ষাগারের প্রবেশ পথের উপর এসে পড়েছে। এই সেই ক্ষুদ্র মানুষ, সেই জীবটি যে খড়-কুটোর আগুনের পাশে একদিন বসেছিল, আজ যাকে যাদুঘরে গুলতি ও বর্শা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখছি সে আজ এত বড় হয়ে উঠেছে যে তার ছায়ায় সূর্য ঢাকা পড়ছে। প্রকৃতির অমঙ্গল যা সে এতদিন কাটিয়ে আসতে পেরেছিল তারই সমাবেশ ঘটেছে আজ তার নিজের প্রকৃতিতে। সমস্ত অশুভ কামনা নিয়ে সে নিজের দিকে দৃষ্টি ফেলছে। তার একটি মাত্র চিন্তা, কি করে সে তার অন্তিম অস্ত্র তৈরি করতে পারবে। শেষ অস্ত্র। সব শেষের অস্ত্র চাই। দেখে বোধ হয় তার চিন্তায়

কোথায় একটা ধ্বংসের মহাশূন্য লুকিয়ে আছে। এই মহাধ্বংসের আকর্ষণ তার কাছে এতই প্রবল, তার আদিম ক্ষমতালাভের প্রকৃতির কাছে এর এমনই একটা আবেদন আছে, যে মানুষ আক্রমণ কিম্বা আত্মরক্ষা যে জন্যই তৈরি হোক, তার অন্তর কলুষিত হয়। তারা মনে জানে যে নিরপেক্ষতার কোনও অর্থই হয় না। যদি আঘাত আসে তার অর্থ অন্তিম অস্ত্রের যা অর্থ তাই হবে দাঁড়াবে—সবুজ ঘাস আর গজাবে না, পাখি আর গান গাইবে না, জগৎ সংসারের মৃত্যু ঘটবে।

এই ধ্বংসের প্রবৃত্তি সত্ত্বেও, পৃথিবীতে মানুষের প্রেমের প্রয়োজন যতটা আর কোন প্রাণীর ততটা নয়। স্নেহ প্রেমের অভাবে মানুষের বেঁচে থাকার সামর্থ্য অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে কম। মানুষের স্বভাব আত্মবিরোধী। ব্যক্তিগত ভাবে বেশীর ভাগ মানুষ যুদ্ধকে ভয় পায়, ঘৃণা করে। যদিও সামরিক কর্তাব্যক্তিরা সংগ্রামের সহজ প্রবৃত্তির কথা বলে থাকেন, তবু ঢাক পিটিয়ে মানুষকে যুদ্ধে নিযুক্ত করতে হয়, প্রচার মারফৎ তাদের যুদ্ধে প্রণোদিত করতে হয়, তাদের বোঝাতে হয় তারা ন্যায়ের জন্য যুদ্ধ করছে। একনায়ক রাজ্যশাসককেও যুদ্ধের কৈফিয়ৎ হিসাবে মানবতার নজির দেখাতে হয়। এর কোনটাই প্রমাণ করে না যে মানুষের মধ্যে যুদ্ধ করার একটা সহজ প্রবৃত্তি আছে। বরং অতীতের অন্ধকার যুগে তার মধ্যে এমন কিছু ছিল যা সে অসৎ উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহার করতে পারত। প্রথম, অচেনার প্রতি ভয়। দুই, যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর নিস্ফলা জমিতে বিচরণরত মানুষের আক্রমণাত্মক ক্ষুধা। মানুষের আত্মবিরোধী কার্যকলাপের অর্থ সে প্রথমেই সম্পূর্ণ এক মানুষ হয়ে জন্মায় নি। সে ক্রমশ মানুষ হচ্ছে। মধ্য যুগে মানুষকে বলা হত Homo duplex—অর্থাৎ সে আধা ধূলিকণা আধা আধ্যাত্মিক। কথাটির মধ্যে তার অবস্থার যথার্থ ইঙ্গিত আছে।

আজ আমরা মানুষের বিবর্তন সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানি, কিন্তু আমার কখনও কখনও মনে হয় যে বৈজ্ঞানিক হিসাবে মানুষের রূপান্তরের ছবি আমরা জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে অক্ষম হয়েছি। আমরা মানুষকে তার পূর্বপুরুষদের মাথার খুলি দেখিয়েছি। আমরা বুঝিয়েছি যে মানুষের মাথা হঠাৎ সম্পূর্ণ হয়ে তৈরি হয় নি। তার পুরাতন একটা ইতিবৃত্ত আছে, তার মধ্যে নূতন পুরাতনের সংমিশ্রণ হয়েছে। গতিশীল বর্ধমান জীবের মধ্যে যেমন ত্রুটি থাকে, মানুষের মস্তিষ্কেও তেমন ত্রুটি আছে। আমাদের শরীরের নানা অংশে পূর্বজাত ইন্দ্রিয়গুলি গুপ্ত ভাবে আছে। এই সব ইন্দ্রিয় পুরাতন

অতীতের সংবাদ বহে আনছে—মানুষের পূর্বপুরুষদের জগতের এগুলি গাছ-পালা, নদী-নালার সমান। অযথা ক্রোধ, নৈরাশ্য, সাময়িক অসঙ্গত ব্যবহার, ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের মধ্যে প্রাচীন জগতের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। আবার, স্নেহ সহযোগিতা, সৌন্দর্য্যবোধ, ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্ন, তার মধ্যে যে আরও প্রাচীন এ কথাও প্রমাণ করা যায়।

অবশ্য আমরা এখন বতমান সম্বন্ধেই বেশী চিন্তিত, যে বর্তমান আগামী কালে পরিণত হচ্ছে। আমাদের বর্তমানের কোন দিক জয়ী হবে? মহাধ্বংসের রকেট? বর্তমানের দায়িত্ব আমাদের। যে জীব একদিন অরণ্যের গভীর থেকে পশুর রব তুলে বেরিয়ে এসেছিল, যারা বর্তমান আমাদের ভিত্তি গড়েছে, তাদের নিয়ে আমাদের সমস্যা নয়। আবার নাটকে নভেলে সুষমা স্বর্গরাজ্যে যে দীর্ঘ জ্ঞ, প্রফুল্ল মানুষদের বিচরণ করতে দেখি, তাদের বাস্তবে পরিণত করতে পারি না। আমরা যে আকারহীন ভবিষ্যতের রূপ গড়তে ব্যস্ত, তার মধ্যে ওরা হারিয়ে গেছে। আমরা কি সত্যই ওই সব স্বপ্নকে সত্য করে তুলতে চাই? তারা কি এতই সত্য যে সমস্ত ক্ষতি স্বীকার করে নিয়েও আমরা আজকের এই নিষ্ঠুর হিংস্রতার মাঝে সেই আদর্শলাভের চেষ্টা করব, প্রকৃতির ধ্বংসাত্মক শক্তির বিরুদ্ধে লড়ব? আমরা কি আমাদের আদিম প্রকৃতির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারব? যে মস্তিষ্ক দিয়ে আমরা আগের ও পিছনের সম্বন্ধে চিন্তা করি, তার সৃষ্টির মূল্য কি এই যে প্রকৃতির দাসত্বের বদলে আমরা মানুষের দাসত্ব করব? যে অতি বুদ্ধিমান ব্যক্তি অতি সহজে ও স্বচ্ছন্দে মানসিক পরিত্রাণ ও জাতিসমূহের অধশ্চেতন নিয়ন্ত্রণের কথা বলে থাকেন, তাদের পরিকল্পনা কি মেনে নিতে হবে? এই জন্যই কি মানুষ অতীতের অন্ধকার পথ পার হয়ে এসেছে ও ভবিষ্যতের কাল্পনিক ছবির জন্য প্রাণ দিয়েছে?

প্রত্যেক সমাজের একটা নিজস্ব রূপ আছে, একটা বিশিষ্ট জীবনধারা আছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে ওই অস্থির অথচ সংহত সামাজিক ছবি প্রতিফলিত হচ্ছে। যদি বর্তমান ঘটনা দিয়ে ওই ছবি প্রধানত গড়ে ওঠে, যদি ঐতিহ্যের প্রভাব ক্ষীণ হয়, অতীত মুছে যায়, তবে ওই সমাজের রূপ ধীরে ধীরে বদলে যেতে পারে। যে “ঠাণ্ডা লড়াই-এ” আমরা লড়ছি, তার জন্য চাই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি দৃঢ় আস্থা। গোপনীয়তা গোপন ভাবকে বাড়িয়ে তোলে, যন্ত্রবিদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। দুটি বড় সমাজ একই পথে নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, যে পথ ক্রমশ দুটি সমাজের কাছেই

এক বলে মনে হতে পারে। বেঁচে থাকাব জন্য যান্ত্রিক জগতে প্রতিযোগিতার ফলে মানুষ তাব মানবিক ঐতিহ্য—তাব শিল্প সাহিত্য, তার দর্শন ও সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাকে অবাস্তব বলে অগ্রাহ্য করতে পারে বলে ভয় আছে।

মানুষ বলে গণ্য হবাব আগেই মানুষ সামাজিক জীব বলে গণ্য হয়েছে। কিন্তু যখন সে বৃহৎ সমাজ গড়ে ও তাব সাংস্কৃতিক জগত পূর্ণাঙ্গ করে তোলে, তখন বলা যায় সে অন্তত কিছুটা সচেতন ভাবে কাজ করছে। মানুষ তার সামাজিক জীবনের রূপটিকে চেনে, অন্য প্রাণী যা পারে না, এই চেতনা মানুষের ভবিষ্যৎ জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবে, ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। এরই জন্য অসংখ্য মানুষ, সাধারণ অনুন্নত মানুষ, প্রতিদিন সংগ্রাম করছেন।

মানুষ যুদ্ধ সুরু করুক আব নাই করুক, সে এমন একটা যান্ত্রিক সমাজের পিরামিডে বাস করছে যেখানে জীবনেব মূল্য নিরূপণ হয বাহিবের বস্তুব জগতে। এই জডবাদের দিনে একটা গুরুত্বপর্ণ কথা এই যে আমবা ভুলি নি যে আমবা আমাদেব আত্মাব মুক্তি চেযেছি এইটাই আধ্যাত্মিক দিকে নিজেদের ছাড়িযে উঠতে চেযেছি—এইটাই অদ্ভুত ঐহিহ্যেব একটা দিক। এই সাংস্কৃতিব ধাবা আমাদেব স্কুলে ও মন্দিরে বজায বাখতে হবে। যে সমাজে গভীর ঐতিহাসিক বোধ নেই, তাব ভবিষ্যৎ নেই, বতমানও অর্থহীন, সে সমাজ কথাব সমষ্টি মাত্র। চাঁদেব উল্টো দিকে উড়ে যেতে পারলেই আমাদের ভবিষ্যৎ আদর্শ সিদ্ধি হবে না। এই আদর্শ সিদ্ধি যদি হয তবে তা একমাত্র ব্যক্তিব অন্তবে হবে। স্বাধীনচেতা, অতীত ও ভবিষ্যৎ দেখতে পারে, এমন মানুষের সামনেই এই সমস্যা উপস্থিত হযেছে।

যদি মানুষ জযী হয তাহলে তার অন্তর্দৃষ্টি পড়বে ও সে বুঝতে পারবে যে এ জয মানুষেব নয, এ মানুষেব হৃদযে প্রকৃতির নূতন জয়লাভ। এই প্রকৃতিই বোধ হয পরমেশ্বব। একজন ভগবদশাস্ত্রবিদ লিখেছিলেন, "মানুষের বিচার শক্তি প্রকৃতিব গুপ্ত রহস্যের উদ্ঘাটক। এর থেকে বোঝা যায় প্রকৃতির বাহিবে বা আড়ালে একটা বাস্তব আছে।" মানুষ নৈতিক স্বাধীন বিচারে এ কথার সত্য প্রমাণ করুক।

# অশোভন বিজ্ঞান

( দুই বিরোধীদলের মধ্যে অর্থহীন বাক্-বিতণ্ডার সাময়িক বিরতির পথ )

**জ্যাকে বারজুন**

গত কয়েক বছরে আমেরিকার ভিতবে ও বাহিরে যে সব ঘটনা ঘটেছে তাতে আমেরিকাবাসী তাদের সবচেয়ে পুরাতন কতকগুলি জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে পড়েছে। এর একটি হল স্কুল। স্কুল সম্বন্ধে প্রশ্ন এই যে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে প্রতিযোগিতা চলছে ও যান্ত্রিক বিদ্যার যেমন প্রসার ঘটেছে তার উপযুক্ত করে মানুষ তৈরি করার শিক্ষা কি এখানে দেওয়া হচ্ছে? সাধারণত সকলে বলছেন, না, দেওয়া হচ্ছে না। নানা অভিযোগ ও নিন্দার কথা শোনা যাচ্ছে ও ওই শিক্ষা-ব্যবস্থার আশু পরিবর্তনের জন্য প্রচুর উপদেশ পাওয়া গেছে।

অনেকের মনে ত্রাসেব সঞ্চাব হয়েছে। এঁদের মতে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে বৈজ্ঞানিক ও ইন্‌জিনিয়ারদের রাশিকৃত উৎপাদনের ব্যবস্থা করা উচিত শুধু উচিতই নয় তা সম্ভবও। অন্য দলের মতে এর ফলে সাংস্কৃতিক শিক্ষার অবহেলা ঘটলে বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী।

এ তর্ক নূতন নয় ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেও সীমাবদ্ধ নয়। পশ্চিমের সর্বত্র ও বিশেষ করে ইংলণ্ডে এ বিষয়ে বাক্-বিতণ্ডা প্রবল হয়ে উঠেছে। বিখ্যাত লেখক ও কূটনীতিবিদ্ স্যার হ্যারল্ড নিকলসন কয়েক মাস আগে B.B.C-এর এক ভাষণে এই বিষয়ের উত্থাপন করেন, "আমরা গত পঞ্চাশ বছর ধরে সাংস্কৃতিক শিক্ষায়, অর্থাৎ প্রাচীন সাহিত্য, ইতিহাস, ভাষা ও নানাবিধ কলা-বিদ্যার চর্চায় অত্যধিক সময় ও অর্থ ব্যয় করেছি কিনা, এ বিষয়ে ইংল্যাণ্ডে অনেকেই চিন্তা করেছেন।" উপসংহারে তিনি বলেন, "এর পরে হয়তো এই দ্বীপের প্রত্যেক ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে ইতিহাস ও প্রাথমিক সাহিত্য-পাঠের বদলে অঙ্ক কষতে দেওয়া হবে। এই ভবিষ্যতের কথা ভাবতেও আমার মন বিষণ্ন হয়ে উঠছে।" স্যার হ্যারল্ড তৎক্ষণাৎ চারিদিক থেকে তাঁর উক্তির জবাব পান, তাতে তাঁর বক্তব্যের ত্রুটি কোথায় ও কেমন তা দেখিয়ে দেওয়া হয়, তাঁর ভ্রম সংশোধন করতে অনেকে এগিয়ে আসেন, অনেকে আবার তাঁর নিজের বৃত্তির বিশেষ শক্তির বাহিরে না যেতে তাঁকে উপদেশ দেন।

গত কুড়ি বছরে এ দেশে ( আমেরিকায ) সংস্কৃতিমূলক শিক্ষার স্বপক্ষে যে কথা বলা হয়েছে তা স্যার হ্যাবল্ডের চেযে কম জোবাল নয, ববং সেই কথার শাক-বিস্তাব আবও বেশী। কোন ভিত্তিস্থাপন সভায প্রাথমিক ভাষণের প্রথম বক্তব্য হল ওই। ব্যবসাযীরাও এই সুযোগে প্রমাণ কবতে চেষ্টা কবেন যে, তাবা কালচাব বিমুখ ফিলিষ্টিন নন। কিন্তু তবু বিজ্ঞান শিক্ষা সব নয, সংস্কৃতিমুলক মানবিক শিক্ষা অত্যাবশ্যক, ইত্যাদি কথায় শেষ পর্যন্ত কোনও কাজ হয না। বক্তা সকলেব কবতালি পান, উদাব সাংস্কৃতিক শিক্ষাব বিষযগুলিব উদার প্রশংসা কবা হয কিন্তু যখনই মানুষের তৈরি একটা কৃত্রিম গ্রহ আকাশে ওঠে বা বকেট উৎক্ষেপ বিফল হয়, তখনই ভাল ভাল কথা আমবা ভুলে যাই। তখন বিজ্ঞান ও ইনজিনিযাবিং ছাড়া আমবা আব কিছু বুঝি না। তবে কি আমবা মনেব যে অবস্থাকে শ্রেয, প্রশস্ত অবস্থা বলে থাকি, সেটা শুধু আমাদেব কপটাচবণেব অবস্থা? উদ্বোধন ভাষণে যখন ব্যবসাযী লোক সুন্দব কথার প্রতিধ্বনি তোলেন তখন ঠকে কে—বক্তা না শ্রোতা? কিম্বা কতকগুলি ভাবধাবা ও সুন্দব শব্দের ঝঙ্কারে দু'জনাই প্রতারিত হয? কারও মনে যে বিশ্বাস জন্মায না তার কারণ শব্দগুলি কোনও উদ্দেশ্য নিযে উচ্চাবিত হয না।

ছককাটা পথে না চলে ও অতি প্রচলিত বুলিব পুনবাবৃত্তি না কবে সংস্কৃতিমূলক শিক্ষাব আপাতত একটা নূতন নামকরণ কবা যাক, "অশোভন বিজ্ঞান।" এব অর্থ ক্রমশ প্রকাশ্য। বিজ্ঞান কি বুঝি, বিজ্ঞানেব জয হোক। কিন্তু সংস্কৃতিমূলক শিক্ষা, সেটা কি বস্তু? এই মানবিক শিক্ষাব ঐতিহ্য তিন হাজাব বছবেব উপব, অতএব তার নূতন সংজ্ঞা দেওযার প্রযোজন নেই, সে বিষযে প্রশ্ন তোলাও চলে না। তাই যদি হয, সংস্কৃতিমূলক শিক্ষার উদ্দেশ্য কি, তার স্থান কোথায এসব কথা ওঠে কেন? মানবিকতার শিক্ষাকে বাঁচিয়ে বাখা বা নষ্ট কবে ফেলার শক্তি কি আমাদেব হাতে আছে?

'হিউম্যানিটিজ' সম্বন্ধে অশেষ তর্ক-বিতর্কের কারণ এই হতে পারে যে, যাঁরা তর্ক কবেন তাঁবা কিসে বিশ্বাস কববেন বোঝেন না কিম্বা যা বোঝেন তাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন না। আমরা ক্রমশ মনে-প্রাণে ক্লান্ত ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছি ও তারই ফলে বোধ হয আমাদের প্রাচীন বিশ্বাসের বস্তুগুলিতে আস্থা হারাচ্ছি। সেই সঙ্গে আমাদের মনে এই আশা জাগছে যে, এমন কোন নূতন যুক্তি বা স্থায়ী ফরমূলা আবিষ্কৃত হবে যার ফলে 'হিউম্যানিটিজের'

প্রতি আমাদের নিষ্ঠা ফিরে আসবেও যন্ত্র ও ব্যবসায়ীর জগতে 'হিউম্যানিটিজের' স্থান সুদৃঢ় হবে।

এই ফরমুলা আবিষ্কারের চেষ্টাতেই আমরা একটা বিরাট "এবং" সাহিত্য, সম্বন্ধ নির্ণয়ের সাহিত্য সৃষ্টি করেছি—'হিউম্যানিটিজ' এবং গণতান্ত্রিক জীবনধারা, 'হিউম্যানিটিজ' এবং সৃষ্টিমূলক সংস্কৃতি, 'হিউম্যানিটিজ' এবং আত্মজ্ঞান 'হিউম্যানিটিজ' এবং কল্যাণময় রাষ্ট্রে অবকাশ, 'হিউম্যানিটিজ' এবং বিশ্বশান্তি। এর পিছনে আশা বাঞ্ছনীয় বিষয় ও হিউম্যানিটিজের মধ্যে একটা কার্য-কারণ সম্বন্ধ বার করা। এই সম্বন্ধ স্থির করতে পারলে, গণতন্ত্র, আত্মজ্ঞান, বিশ্বশান্তি, ইত্যাদি সবকিছুর জন্য সংস্কৃতিমূলক শিক্ষা অপরিহার্য বলে প্রমাণ করতে পারলে, ওই শিক্ষার সমর্থন খুঁজে পাব, তার মূল্য ধার্য করতে পারব। এ এক শোচনীয় দুরাশা। 'হিউম্যানিটিজের' দ ম ও ওজন বাড়াবার এই সব সাধু চেষ্টা শুধু যে ক্লান্তিকর ও অস্পষ্ট তাই নয়, এ চেষ্টা স্ববিরোধী ও নির্ভরতাশূন্য।

কোন বিষয়বস্তুই আমাদের এ আশা পূরণ করতে পারবে না। তা যদি সম্ভব হত, অনেক কাল আগেই তার প্রভাব আমাদের মনের উপর দেখা যেত। 'হিউম্যানিটিজকে' মানুষের অমঙ্গল দূর করার উপায় হিসাবে চিন্তা করাটাই একটা মস্ত বড ভুল। সংস্কৃতিমূলক শিক্ষা জগত থেকে পাপ-প্রবৃত্তির অপসারণ ঘটায় না বা ব্যক্তিগত সমস্যার প্রতিকার করে না। ওই শিক্ষা মানসিক চিকিৎসা ও ঔষধের স্থান অধিকার করতে পারে না। 'হিউম্যানিটিজ' ভাঙ্গা মন জোড়া লাগাতে পারে না, রোগগ্রস্ত মনকে নীরোগ করতে পারে না। গণতন্ত্রের প্রসার ঘটান বা আন্তর্জাতিক বিপদ মোচন হিউ-ম্যানিটিজের কাজ নয়। বরং উল্টো ফলই দেখা গেছে। যাকে হিউম্যানিটিজ বলে থাকি তার সার্থকতা দেখি আমাদের জীবনের মনুষ্যত্ব-হীনতার মধ্যেই। মানবিক শিক্ষা জীবনের দ্বন্দ্ব ও বিপর্যয়ের কথাই বলে। ইলিয়াড ( Iliad ) বিশ্বশান্তির ছবি নয়; ( King Lear ) একজন সর্বাঙ্গ সুন্দর মানুষের আলেখ্য নয়, মাদাম বোভারি ( Madame Bovary ) অবকাশের সুবিবেচিত ব্যবহারের প্রমাণ দেয় না।

যদি এ কথা বলা হয় যে, শিল্প-সাহিত্য ও ইতিহাসে যে বিপর্যয়ের খবর পাই তা আমাদের সতর্ক করে ও বিপরীত তুলনা তুলে ধরে, আমাদের নৈতিক শিক্ষা দেয়; তবে আমার প্রশ্ন হবে এই যে, এমন প্রমাণ কোথায় যে একটা ভাল বই অসৎ কাজ থেকে আমাদের নিরস্ত করেছে, সুন্দর যন্ত্র-সঙ্গীত

মূর্খের মত কাজ করতে আমাদের বাধা দিয়েছে? প্রবৃত্তির তাড়না ও সামাজিক চাপ মানুষের ব্যবহারিক জীবনে সমস্যা সৃষ্টি করার বহু আগেই মানুষ সঙ্গীত ও পুস্তকে আসক্ত হয়। একথাও সত্য যে, বর্তমানকালে ও অতীতেও সংস্কৃতিমূলক শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিই ব্যক্তিগত ও সামাজিক আন্দোলনের সূচনা করেছে। যারা শিল্পকলা, সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস ও দর্শন চর্চা করেছে তারাই দেখা যায় উচ্চাকাঙ্ক্ষী কিম্বা চক্রান্তকারী, বিদ্রোহী বা স্বেচ্ছাচারী, লম্পট বা আন্দোলনকারী হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যক্তির ইতিহাসে এরাই আবার অসন্তোষের ট্র্যাজিক মূর্তি হয়ে দেখা দেয়।

এই অপকার্যের তালিকা সম্বন্ধে আপত্তি উঠতে পারে। অনেকে বলতে পারে যে 'হিউম্যানিটিজের' সেবক তারাই যারা কখন বিদ্রোহ করেন না, নিয়মের বাইরে যান না। 'হিউম্যানিটিজে' পণ্ডিত ও হিউম্যানিটিজের ছাত্র এই শ্রেণীর লোক। এঁদের সম্মান দেওয়া ও সমর্থন করা উচিত।

ঠিক কথা। সংস্কৃতিমূলক শিক্ষার এই দুই অর্থ আমাদের মনে বিভ্রম সৃষ্টি করে। এইজন্য আমাদের কতকগুলি সংজ্ঞার দরকার। হিউম্যানিটিজ বলতে কখনও কখনও আমরা আবছাভাবে শিল্প সাহিত্যের কথা বা সাধারণ সংস্কৃতির কথা ভাবি। শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্পকলার চচা অর্থে 'হিউম্যানিটিজ'— শব্দ ব্যবহার হয়। শিক্ষক পণ্ডিতের কাছে 'হিউম্যানিটিজ' প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়-বস্তুর থেকে পৃথক। কলেজের একটা পাঠ্য তালিকা খুললেই দেখা যাবে যে, রসায়ন, সমাজতত্ত্ব ও ইংরাজী সাহিত্য বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত, এগুলির বিভিন্ন শিক্ষক এবং এ সবের শিক্ষার জন্য ভিন্ন ভিন্ন বাড়িও নির্দিষ্ট করা আছে। এই বিষয়বস্তুগুলির শিক্ষায় ভাষাও এক বলে মনে হয় না। বিশুদ্ধ বিজ্ঞান প্রকৃতির নিয়ম-কানুনের কথা বলে, সামাজিক বিজ্ঞান মানুষের ব্যবহারের নিয়মের ব্যাখ্যা করে, 'হিউম্যানিটিজের' কারবার সম্পূর্ণ মানুষকে নিয়ে, তাই 'হিউম্যানিটিজ'কে বলেছি "অশোভন বিজ্ঞান।"

এই মোটামুটি শ্রেণীবিভাগ যথেষ্ট স্পষ্ট। সন্দেহ জাগে এখন কোন্ বিষয়কে কোন শ্রেণীভুক্ত করা যাবে। ইতিহাস ও নৃতত্ত্বকে কখনও সাহিত্য ও দর্শনের পর্যায়ে ফেলা হয়, কখনও বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞানের শ্রেণীভুক্ত করা হয়। সাঙ্কেতিক তর্কশাস্ত্রের যেমন অঙ্কশাস্ত্র ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সঙ্গে নিকট সম্বন্ধ দেখা যায়, তেমনি অঙ্কশাস্ত্রের সঙ্গে দর্শনের যোগ রয়েছে। মনোবিজ্ঞান, ভূগোল ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ইতিহাসকে কোন শ্রেণীভুক্ত করা যাবে? একটু লক্ষ্য করলেই একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে মানুষের মন

এই সমস্ত বিষয়-বস্তুগুলিকেই সম্বন্ধযুক্ত করছে—চিন্তার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট রেখায় বিষয়-বস্তুর বিভাগ সম্ভব নয়।

এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বর্তমানের একটি অতি প্রচলিত ধারণা এই যে, মানবিক শিক্ষা, তার নাম অনুযায়ী প্রাকৃতিক ও সমাজ বিজ্ঞানের চেয়ে বেশী মানবিক। এই অঙ্ক কষা ও যান্ত্রিক সভ্যতার দিনে মানবিক শিক্ষাকেই একমাত্র মানবিক বলে মনে হতে পারে। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে এইসব সিদ্ধান্ত কেবল কথা মাত্র। এর পিছনে যে হৃদয়ের আবেগ আছে তা আমাদের মনে সহানুভূতি জাগাতে পারে, কিন্তু আমাদের বুদ্ধিকে যাতে আচ্ছন্ন না করে তা দেখা উচিত।

প্রথমত যেমন এক্ষেত্রে তেমনি অন্যত্র শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের উপর নির্ভর করে তর্ক করে কোন ফল নেই। রেনেসাঁসের দিনের একটা চলতি কথা "Litteral humaniores" থেকে 'হিউম্যানিটিজ' শব্দের উৎপত্তি হয়। শব্দটির একটি আবেদন থাকতে পারে, তার মধ্যে 'বিশেষ মানবিকতার' একটা ইঙ্গিত থাকতে পারে, কিন্তু ইঙ্গিত প্রমাণ নয়। তথ্য ও ভাষাকে যদি স্বীকার করি তবে "মানবিক" শব্দটিকে সম্মানসূচক শব্দ হিসাবে ব্যবহার করা আমাদের উচিত হবে না। মানুষ যা করে তাই মানবিক, যদি বিশেষ কিছু করে তবে তার পিছনে বিশেষ চিন্তা ও বুদ্ধির পরিচয় থাকে। এ হিসাবে গবেষণা ও শিক্ষার সব বিষয়ই মানবিক—বিশেষভাবে মানবিক। তেমনই নিষ্ঠুরতা, নির্দয় আঘাত ও যুদ্ধের জন্য স্বেচ্ছাকৃত ও সুচিন্তিত প্রস্তুতি ইত্যাদি নীতি-বিগর্হিত কাজও বিশেষভাবে মানবিক। অতএব "মানবিক শিক্ষার" একটা সম্মানসূচক সংজ্ঞা দেওয়া ভুল।

কিন্তু ওই ভুলের কারণ সন্ধান "মানবিক শিক্ষার" আসল রূপটি বোঝার সহায়তা করে। 'হিউম্যানিটিজ'কে শিক্ষনীয় বিষয় হিসাবে বিচার করলে সমগ্র সংস্কৃতির কথা, বিশেষ করে শিল্পকলার কথা এসে পড়ে। শিল্পকলাকে শুধু পণ্ডিতের আলোচনার বিষয় করে রাখলে চলে না, তার সাক্ষ্য সর্বত্র —হাটে-বাজারে, বোহেমিয়ায়, খবরের কাগজের পাতায় এবং সমাজের বিদগ্ধজনের মধ্যে। শিল্পকলা কোনও বিশেষ শ্রেণীর সম্পত্তি নয়। সম্প্রতি অনেক লোক শিল্পকলাকে আমাদের অস্তিত্বের প্রধান সমর্থন বলে মনে করেন। সুন্দর ও স্থায়ী সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের দোষ-ত্রুটির উপরে উঠতে পারি। যখন ধর্ম বড় ছিল, তখন ভগবানের গৌরব বাড়াবার জন্য আমরা কাজ করতাম। এখনকার ধর্মনিরপেক্ষ সমাজে মানুষ তার

সৃজনীশক্তির ব্যবহারে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করে। শিল্পীর কাজের মাপে মানুষের সমস্ত চেষ্টার মূল্য নিরূপণ হয়। কিন্তু এর ফলে আমাদের শিল্পকলা, মানবিক শিক্ষা, সৃষ্টি ও সংস্কৃতি, ইত্যাদি পৃথক অথচ সম্বন্ধযুক্ত কাজের ক্ষেত্রে বিভ্রম দেখা দেয়। শিল্পকলার ভক্ত ছাত্র ও শিক্ষক কেন যে নিজেদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দাবী করেন তার কারণ বুঝতে পারি। মানুষের আত্মার শ্রেষ্ঠ প্রকাশের সঙ্গে সংযোগ আনে তাঁদের কাজ।

চিরকাল পুরোহিতদের যেটা ক্ষোভের বিষয়, মানুষ দেবতার পূজা করে কিন্তু তাদের নৈবিদ্যের থালা অর্পণ করে অন্য বেদীমূলে, শিল্পের পুরোহিতদের আত্মগরিমার আশু ফল ওই একই। অন্যান্য মানবিকতাবাদীদের সংস্কৃতিমূলক শিক্ষার যে ফলদায়ক দিকের কথা আগে বলেছি তার উপর জোর দিতে দেখা যায়। তাঁরা বলেন সেকসপিয়ার পড়া মেসোপটেমিয়ার স্তূপ খনন করার একটা ফল মানুষের সুখ ও সামাজিক সাম্যবোধ।

দুঃখের বিষয়ে এ আশা সাধু হলেও মিথ্যা, এই ধর্মযাজকের ভূমিকা বস্তুতান্ত্রিক ও আধ্যাত্মিক কোনদিক দিয়েই হিউম্যানিটিজের প্রতিষ্ঠা বাড়ায় না। কারণ ধর্মযাজককে মুক্তির গুপ্তরহস্যের সন্ধান দিতে হবে যা তাঁর বিশেষ অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি প্রমাণ করবে। এর বেশী তিনি আর কি আশা করেন? এখন লোকে যদি বলে যে, তিনি যে মূল্য চেয়েছেন তা লাভ করেছেন। ক্ষমতা ও বিত্তের আকাঙ্ক্ষা তাঁর পক্ষে দুর্বলতা, তবে তারা ভুল করবে না।

সবচেয়ে বড় কথা ওই বিশেষ অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার দাবিটাই একটা প্রবঞ্চনা। আমাদের অভিজ্ঞতা বলে অন্যান্য শিক্ষা বিষয়ের মত মানবিক শিক্ষাও Sphinx এর রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে কিম্বা অলীক স্বর্গরাজ্য কায়েম করতে অক্ষম। তা যদি হত ও মানবিক শিক্ষার সার্থকতা যদি তাই হত, তবে সফলতার সঙ্গে সঙ্গে ওই শিক্ষার গুরুত্ব শেষ হয়ে যেত। যা শুধু কৌশল, কার্যপ্রণালী মাত্র, তার সার্থকতা ওইটুকু।

কিন্তু মানবিক শিক্ষা নিছক একটা কৌশল নয়, মানুষের সাধারণ উন্নতি ঘটানর একটা পদ্ধতিমাত্র নয়। হিউম্যানিটিজকে মহান সাংস্কৃতি অর্থে বা শিক্ষার বিষয় হিসাবে গণ্য করলে, তার উপযোগিতা আরও নিবিড় ও স্থায়ী ভাবে দেখা দেবে। জন্মলাভের পর কতকগুলি মানুষ বই, গান-বাজনা, চিত্র-কলা, নাটক ইত্যাদির প্রতি একটা সহজ-স্বাভাবিক আকর্ষণ বোধ করে। ওই প্রিয় বস্তুর আকাঙ্ক্ষার মধ্যে তারা বড় হয় ও সমরুচির মানুষের

সঙ্গে মিশতে চায়। আরও একটা বড় গোষ্ঠী সময়ে সময়ে শিল্প-কলার চর্চা করে ও তাতে কিছুটা আনন্দও পায়। এই দুই দল একত্রে বাকি লোকের উপর তাদের ইচ্ছাকে চাপিয়ে দিতে পারে, তাদের যা আনন্দ দেয় তা অন্যের সামনে উপস্থিত করতে পারে।

এই জন্য অসংখ্য লোক যারা হয়তো নিজেদের খুশি মত চললে গুহায় বা তাঁবুতে বাস করত, তাদের স্থাপত্যবিদ্যার ও তার অলঙ্কারেব মধ্যে বসবাস করতে হয়—পোষ্ট আপিসের গায়ে আঁকা ছবি ও সংস্কার করা চার্চের ভাস্কর্যের সঙ্গে পরিচিত হতে হয়। সংবাদ পত্র ছবি ছাপে, ঐতিহাসিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি করে, নূতন ও পুরাতন চিত্রকলার এবং পুস্তক ও সঙ্গীতের সমালোচনা করে, শিল্পীদের জীবন ও মতবাদেব কথা প্রকাশ করে। এ সবই সংখ্যালঘু পাঠকের জন্য কিন্তু তাদের রুচি অন্যান্য মানুষকে প্রভাবান্বিত করে।

তেমনি সাধারণ পাঠাগার, যাদুঘর. পার্কের গান-বাজনা ও খাবার টেবিলে বসে যে বেতার প্রোগ্রাম শোনা যায় তা বিশিষ্ট রুচির মানুষের কাজ। অতএব আমরা যখন চলতি বুলি আওড়াই যে আধুনিক জগত বিজ্ঞান-পরিচালিত, তখন সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও আমাদের বলা উচিত যে সেই জগতই, তার আকার ও রঙ পায় কলা-শিল্পের কাছ থেকে, সঙ্গীত ও কাব্য তাকে দেয় সব চেয়ে মিষ্টি ধ্বনি ও সুন্দর অর্থ, দর্শন, গল্প ও ইতিহাস তাকে দেয় বস্তু ও ভাবের শ্রেণী বিভাগ, চরিত্র ও শিক্ষার বাঁধা বুলি।

যদি আজ 'হিউম্যানিটিজের' ভক্তের দল তাঁদের সাধনার ও চর্চার জিনিষগুলি নিয়ে মঠে গিয়ে আশ্রয় নেন, তবে আমাদের এই প্রতিদিনের পরিচিত শ্রমরত জগত আমাদেরই চোখের সামনে তার আলো হারাবে, শব্দ ও গন্ধ হারাবে, ইন্দ্রিয়গত সৌন্দর্য অনুভূতির স্বাদ হারাবে। যান্ত্রিক উপায়ের সাহায্যে আমাদের যেটা আশু প্রয়োজন তার চাহিদা মেটান ছাড়া এ জগতের আর কোনও অর্থ থাকবে না। তখনও হয়তো মুষ্টিমেয় কয়েকজন মানুষ বিশুদ্ধ তত্বচিন্তায় ও অঙ্কশাস্ত্রের রহস্যের মধ্যে আনন্দ খুঁজে পাবেন। কিন্তু এঁরাও আমাদের সভ্যতার যেটা দৈনিক সরঞ্জাম তার অভাব বোধ করবেন।

এই যে স্ববিরোধী চিত্র তার মধ্যে থেকে আমরা শিক্ষা ও সান্ত্বনা দুই পেতে পারি। এর থেকে প্রমাণ হয় যে শিল্প-কলা যে বস্তুর সৃষ্টি করে তা আমাদের ইন্দ্রিয়ের ভোগের জন্য, শুধু বুদ্ধির খোরাক যোগাবার জন্য নয়। এই জন্যই মানবিক শিক্ষা প্রমাণ খোঁজে না, পরিসংখ্যানের নজির দেয় না।

প্রমাণের বদলে ওই শিক্ষা ভোগের অধিকার দেয়, ও গড়পড়তার হিসাবের বদলে দেয় স্বাতন্ত্র্যবোধ। রুচির বদল হলেও, শিল্পের দান আমাদের ক্রমাগত সমৃদ্ধ করে চলেছে। তিন হাজার বছরের সাহিত্য, দর্শন ও স্থাপত্যের কথা, চিত্রশিল্প ও সঙ্গীতের বিরাট ও চিত্তাকর্ষক সংগ্রহের কথা আমরা বলে থাকি, যেগুলি চিরকালই বৈচিত্র্যেভরা নূতন ও রহস্যময়। এই বাস্তব অভিজ্ঞতা শিক্ষনীয় বিষয় হিসাবে 'হিউম্যানিটিজের' সত্য ভূমিকা, তার অপরিহার্য কার্যের ইঙ্গিত দেয়। সভ্যতার যে বিরাট ঐতিহ্য মানবিক শিক্ষার মধ্য দিয়েই তা গড়ে ওঠে। সংস্কৃতিমূলক শাস্ত্রের ক্ষেত্রে পণ্ডিত মানুষদের ক্রমাগত চেষ্টা না থাকলে আমরা জাতি, ধর্ম, শিল্প, দর্শন, বিজ্ঞান ও রাজনীতির যে স্বতন্ত্র ও প্রাণবন্ত ঐতিহ্যযুক্ত সংস্কৃতির জগত সেখানে বাস করতে পারতাম না। অর্থহীন কতকগুলি ধ্বংসাবশেষের স্তূপের মধ্যে আমাদেব হাতড়ে বেড়াতে হত।

দু'একটি দৃষ্টান্ত ধরা যাক—সহজ ও স্পষ্ট দৃষ্টান্ত যা অতি সাধারণ হলেও আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। একটি ছোট সহরের একজন ব্যবসায়ী যার স্থানীয়-প্রেম ও স্বদেশ-প্রেম গভীর হলেও বুদ্ধিগত বিষয়ের কথা যার বিশেষ জানা নেই। নিজের অজ্ঞাতেই কিন্তু এমন লোক পাণ্ডিত্যের খরিদ্দার। প্রত্যেক স্মারক ডাকটিকিট তার মর্যাদা বাড়ায় ও সেই সঙ্গে সে শিল্প-কলা চর্চার ও গবেষণার ফলটি আত্মসাৎ করে। জেফারশন্ ও লিন্‌কন্ সম্বন্ধে সে বক্তৃতা শোনে যার অর্থ সে 'হিউম্যানিটিজে'র অন্তর্গত চিন্তা ও প্রত্যয়গুলিকে পরোক্ষভাবে স্বীকার করে। স্থানীয় ঐতিহাসিক সোসাইটির সভ্য না হলেও সে ব্যাঙ্কের পরিচালক হিসাবে ব্যাঙ্কের বাড়িটাকে Independence hall এর নকলে তৈরি করার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করতে পারে। এই অনুমোদন বোধ হয় তার স্বাভাবিক কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দেয়।

কিন্তু এই সঙ্গে মানবিক শিক্ষার নানা শাখার সঙ্গে তাকে পরিচিত হতে হয়। তার অনভ্যস্ত মনে শিল্পকলা, রুচি, শব্দার্থবিদ্যা কালগত স্থাপত্য শৈলী, ঐতিহাসিক সভ্যতা ইত্যাদির প্রশ্ন জাগে। অতীত ও বর্তমানে একই সঙ্গে তাকে বাস করতে হয়। বাটার হারের চিন্তার সঙ্গে তাকে ভাঙ্গা একটা ঘণ্টার ছবিকে নিয়ে ধ্যানে বসতে হয়। এই অসংস্কৃত বিষয়ী লোকটিকে পাঠাগারে ছুটতে দেখা যায়, বই পড়তে হয়, পুরাণ খোদাই কাজের তুলনা-মূলক বিচার করতে হয়। এর উপর যখন ব্যাঙ্কের ভবিষ্যৎ পরিদর্শনকারীদের জন্য একটা প্রদর্শন প্রস্তাবের খসড়া তৈরি করার কাজে তাকে দেশজ শব্দ

চয়নে ব্যস্ত হতে হয়, তখন সে প্রায় প্রত্নতত্ত্ববিদ ও মুদ্রাতত্ত্ববিদের পর্যায়ে এসে পড়ে। এই ভাবে পাণ্ডিত্যের খরিদদার লেখক হয়ে ওঠেন, নিজের উত্যক্ত পরিবারের কাছে শিল্প-সাহিত্যের রক্ষক হয়ে দেখা দেন, পণ্ডিত না হয়েও পাণ্ডিত্যের অধিকারী হয়ে পড়েন।

অন্যদিকে ব্যাঙ্কের বাড়িটা যতই হাস্যকর ভাবে বেমানান হ'ক কপটতার, মিথ্যা মর্যাদার পরিচায়ক হ'ক, তা ঐতিহ্যের প্রভাবেরই একটি চিহ্ন।

এরপর সহুরে সভ্য লোকের কথা ধরা যাক। সে সেকস্‌পিয়ারের নাটক দেখতে যায়। অভিনয় ভাল লাগা, মন্দ লাগা তার রুচির উপর নির্ভর করে, কিন্তু প্রাতরাশের কফির মতই এই অভিনয় দেখা তার রোজকার জীবনের একটা স্বাভাবিক আঙ্গিক। সেক্‌স্‌পিয়ার সুলভ, সেক্‌স্‌পিয়ারকে আমরা হাতের মধ্যে পেয়েছি। সেক্‌সপিয়ারের নাটকের সমর্থকটি একবারও ভেবে দেখে না যে নাট্যকারের নাটক লেখা ও ব্রডওয়েতে তারই একটি সংস্করণের অভিনয়ের মধ্যে কত লোক ক্ষয়শীল শিল্পকলাকে অনাদর ও ভুল বোঝার হাত থেকে রক্ষা করায় নিযুক্ত। দর্শকটির কাছে যদি নাট্যমঞ্চে আলোকপাতের কথা তোলা হয়, তবে তার মনে বিদ্যুৎশক্তির ক্রমবিকাশের পিছনে যে বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা রয়েছে তার কথা উঠতে পারে। কিন্তু সে যখন নাটক অভিনয়ের সমালোচনা করে তখন ভুলে যায় যে ওই অভিনয়ের পিছনে তিনশ' বছরের সমালোচনা ও বিচার-বিবেচনা আছে, তার অভিমত পাঠ্যপুস্তক ও সংবাদপত্রের পাতায় যে মতামত প্রকাশ হয়েছে, তারই প্রতিধ্বনি মাত্র। সেক্‌সপিয়ারকে দর্শক যে দেখছে সেটা বহু অভিজ্ঞ লোকের চেষ্টার ফলে, যে চেষ্টা পরোক্ষভাবে দর্শকের মনটিকেই গড়ে তুলেছে।

মানবিক শিক্ষার এই দু'রকম ব্যবহার না থাকলে আমাদের শিল্পকলা ও চিন্তার উত্তরাধিকার সম্পূর্ণ নিষ্ফল হত। এই উত্তরাধিকার ও কার্যক্রমের কথা বুঝতে হলে পুস্তক প্রকাশকের বক্তব্যে কান দিতে হবে। তাঁরা বলেন, যে বই স্কুলের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হতে পারে, সেগুলি কখনও অমুদ্রিত অবস্থায় রাখা হয় না। এর অর্থ মানবিক শিক্ষা শুধু যে আমাদের সভ্যতার জগতে শৃঙ্খলা আনে তাই নয়, তা সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখে। স্কুলে-কলেজে সেক্‌সপিয়ারের নাটক ও ডাক্তার জনসনের বই পড়া বন্ধ করা হোক, ছাত্রদের প্রচলিত নাম, তারিখ ও অতীতের নানা কথা মুখস্থ করতে বাধ্য না করা হোক, দেখা যাবে দশ বছরের মধ্যে বিদ্যা-বুদ্ধির ক্ষেত্রে সামন্ততন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। সহজে বিনষ্ট হয় এমন বইএর সাহায্যে বা মুখে মুখে স্থানীয় দলগুলি

স্থানীয় দর্শন প্রচারের চক্রান্ত করবে। যা আজকের সাধারণ জ্ঞান তার বদলে পাব লোকগাথা। শিক্ষনীয় বিষয়গুলির ঐক্য ও আবশ্যকতার বোধ লুপ্ত হলে, আমাদের শিক্ষার অভিযান ব্যর্থ হবে, আমাদের জ্ঞানের আশা লুপ্ত হলে, আমরা দৈবের দাস হয়ে পড়ব। বৈজ্ঞানিক ও পরিসংখ্যানবিদ যদি তাঁদের শক্তির একভাগ সাধারণের বুদ্ধিগম্য একটা জগতের পুনঃসৃষ্টির কাজে না লাগান তবে তাঁরা অন্যান্য সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেন। অন্যদিকে শিল্প-সাহিতের অনুরাগীর দল তাঁদের নিজের সম্পদের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকবেন। অসভ্য জাতির আক্রমণের হাত থেকে যাঁরা বেচে যান এঁদের অবস্থা হবে অনেকটা সেইরকম।

অতএব যখন কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি আধুনিক জগতে মানবিক শিক্ষার স্থান সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন, তখন তাঁর সন্দেহের একটা সহজ জবাব দেওয়া যায়ঃ সমাজকর্মীর অর্থে হিউম্যানিটিজের কোন দাম নেই। এদের দাম প্রতিনিয়ত তাঁদের কাছে ধরা পড়ে যাঁরা সভ্যতার প্রকাশ দেখতে চান, যে প্রকাশ তাঁদের আনন্দ দেয়।

"ব্যবহারিক" বিজ্ঞান ও প্রয়োজনাতিরিক্ত মানবিক শিক্ষার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তা এ বিষয়ে যাদের কিছু জ্ঞান আছে তাদের কাছে অবাস্তব। যারা জীবনের প্রয়োজনের ঠিক অর্থটি বোঝে না তাদের কাছেই ওই দ্বন্দ্ব বড় হয়ে দেখা দেয়।

"ব্যবহারিক" মূল্যের মুখপাত্রের কাছে বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞানের দাম আছে, কারণ মানুষকে তা সংযত হতে শিক্ষা দেয়, তার জীবনের খোরাক যোগায়, তাকে রোগমুক্ত করে। কিন্তু ওই মুখপাত্র মূল্যের পরিমাপ বা ফলাফলের বিচার না করেই এসব কথা বলে থাকেন। এঁদের মনে কুসংস্কার আছে, এঁদের মতবাদের পিছনে রয়েছে জনমতের ভয়। তাছাড়া, এঁরা প্রয়োজন বলতে বোঝেন কতকগুলি বড় বড় সামাজিক সমস্যার প্রয়োজন, যেমন জাতীয় প্রতিরক্ষা কিম্বা অপ্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীর সংখ্যা কমানো। কিন্তু আমাদের এই মিথ্যা মর্যাদাবোধে ভরা কপট সমাজে, যে সমাজ প্রয়োজনের সীমানা ছাড়িয়ে পালাতে চাইছে, সেখানে প্রয়োজনের মাপকাটিতে মূল্য যাচাই করা কিছুটা অদ্ভুত। "ব্যবহারিক" মূল্যের মুখপাত্রের উপর ওই পরীক্ষা আরোপ করলে তিনিও অবিলম্বে রেহাই পেতে চাইবেন। কারণ ওই পরীক্ষায় তাঁর মৎস্য শিকারের প্রয়োজন থাকে না, তাঁর স্ত্রীর লোমের কোট পরার প্রয়োজন থাকে না, তাঁর আপিস ঘর সাজাবার প্রয়োজন থাকে না। ব্যবসায়ী হলে তার বুঝতে বাকি থাকে না যে ব্যবসায় নির্ভর

করে মানুষের এমন কতকগুলি চাহিদার উপর, যা না পেলেও তাদের সহজেই চলে যায়। মদ খাওয়ার ইচ্ছাই হক বা বিথোফেন শোনার ইচ্ছাই হোক, মানুষের তৈরি জিনিসের প্রয়োজনীয়তা গড়ে ওঠে মানুষেরই ইচ্ছা ও রুচির মধ্য দিয়ে।

মানবিক শিক্ষার প্রয়োজন মানুষের প্রাচীন, সুদৃঢ় ও ক্রমশ প্রসারিত ইচ্ছা দিয়ে নির্দিষ্ট হয়। বাহ্যত এই প্রয়োজন ব্যক্তিগত, সামাজিক নয়, প্রয়োজন পরার্থের জন্য নয় স্বার্থের জন্য। এমন মানুষও আছে যারা নিজের বাসনার পরিতৃপ্তির জন্য বই পড়ে বা কনসার্ট শোনে, সৎ নাগরিকের মত ব্রিজ খেলে ও ককটেল পার্টিতে যোগ দিয়ে সমাজের উপকার করে না।

যে অবস্থার মধ্যে কয়টি তাকে স্বীকার করতে হবে, না করলে উপযোগের সমর্থক ব্যবহারিক বুদ্ধিহীনতারই পরিচয় দেবেন। "ভাইরাস" বিধ নষ্ট করতে ও প্রতিবেশীর অবস্থার উন্নতি করতে শক্তি নিয়োগের প্রয়োজন আছে স্বীকার করি। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে আমাদের সমস্ত সামর্থ ও সম্পদ দুঃখ-দুর্দশা দূর করার কাজে লাগাতে হবে।

পরিকল্পনার ভাষায় কথা বলা যদি কিছুক্ষণের জন্যও বন্ধ করি তবে দেখব যে মানুষ তার নগণ্য বাসনা পরিতৃপ্তির বিকৃত আশা পোষণ করছে। তারা নাচতে, গাইতে, গল্প শুনতে চাইছে। তারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে তর্ক করতে চাইছে, ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতার বাস্তবতার বিচার করতে চাইছে। ঘরের এক কোণে বসে বই পড়তে বা ইজেল ও রঙের বাক্স নিয়ে বাইরে বসে ছবি আঁকতে তারা ভালবাসে। তারা প্রাচীন মুদ্রা সংগ্রহ করে, তাদের বংশের ইতিহাস উদ্ধার করে, লোহার পাইপ তৈরির ইতিবৃত্ত নিয়ে গবেষণা করে। তারা উদ্দেশ্যহীন বিদেশ ভ্রমণের জন্য দেশ-বিদেশের কথা জানতে চায়, বিদেশীর ভাষা শেখে। আধুনিক বিজ্ঞান-ধর্মী, ভদ্র মার্কিনবাসী বস্তি-সংস্কার বা বিবাদ-বিচ্ছেদ রদ্ করার সাধু চেষ্টা না করে এমনই নানা অযোগ্য চর্চায় সময় নষ্ট করে।

এখন আসল অবস্থাটা পরিষ্কার হয়ে উঠছে। মানবিক শিক্ষা, যা আমাদের এইসব বুদ্ধিহীন কাজ করার প্রেরণা যোগায়, যা রোগের জীবাণু বৃদ্ধি বন্ধ করার কাজে সম্পূর্ণ নিষ্ফল, সেই শিক্ষার বস্তু চারিদিক দিয়ে আমাদের চোখ, কান ও মনকে আকর্ষণ করছে। দুর্বুদ্ধিপূর্ণ কাজের তালিকা বাড়িয়ে চলেছে। মানবিক শিক্ষার প্রয়োগ যাঁরা করেন তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য মনে হয় সেই শিক্ষার বিষয়বস্তুর সংখ্যা বৃদ্ধি করা। অবশ্য

এই কাজে যা খবচ তা সমাজ-বিজ্ঞানেব অন্তর্ভুক্ত কাজের খরচেব চেযে বেশী নয়, বরং কম ও পদার্থ বিজ্ঞানেব ক্ষেত্রে যে বিবাট অভিযান চলছে তার খরচের তুলনায় অতি সামান্য। সে হিসাবে যাঁবা শিক্ষাব জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয করার অধিকাব পেয়েছেন তাঁদেব কাছে মানবিক-শিক্ষাব কোন গুরুত্ব থাকাই উচিত নয়। অথচ এই অভিভাবক শ্রেণীর মানুষই যে উদার কলা-বিদ্যার কলেজে নিজেরা পডেছেন সেখানে নিজেদের টাকা দান করেন ও সেইখানেই তাঁদেব ছেলে-মেয়েদেব সংস্কৃতিমূলক শাস্ত্র-শিক্ষার জন্য পডতে পাঠান। মনে হয নিছক কাজের মানুষ ঔষধ-বিজ্ঞান ও আমাদেব আচরণের উন্নতি কবাব স্বপ্নে নিজেকে হারিযে ফেলে তাব মতেব সঙ্গে কাজের মিল করতে পাবেন না।

এই সব কাজেব লোকেব কথা ও কাজেব অমিল ও চিন্তাব বিশৃঙ্খলতা নিয়ে আমাদেব আলোচনা না কবলেও চলত। কিন্তু চিন্তাব বিশৃঙ্খলতা শুধু এই সব মানুষেব মধ্যেই নেই, মানবিক শাস্ত্রবিদ নিজে চিন্তা-বিভ্রমতার সৃষ্টিতে সাহায্য কবেন। আমি কাবিগবেব সঙ্গে তাব পেশাকে এক কবে দেখার যে অভ্যাস তাব কথা বলছি। হিউম্যানিটিজ সভ্য জগতে শিক্ষিত মনের গঠনে সাহায্য করে কিন্তু তাব অর্থ এই নয় যে মানবিক শাস্ত্রবিদ নিজে মার্জিত বুদ্ধি ও উন্নত রুচিত আদর্শ। বাস্তব অভিজ্ঞতা এই ধারণা অপ্রমাণ কবে, এবং এইজন্যই সাধারণ মানুষ পাণ্ডিত্যের উপব বিশ্বাস হাবায়। হলবীনের আঁকা Erasmusএব প্রতিকৃতিব মত মানবিক শাস্ত্রবিদ আদর্শ মানুষেব প্রতিমূর্তি নন। শিল্পীকে আমবা একটি অদ্ভুত জীব হিসাবে দেখতে প্রস্তুত থাকি—সে যদি সাধারণ মানুষেব মত হয় আমবা বিমষ বোধ কবি। এই চিন্তা-ধাবার বশবর্তী হয়েই আমবা মনে কবি যে পণ্ডিত মানুষও যখন কিছুটা অদ্ভুত তখনও তিনিও নিশ্চযই শিল্পী। আব এক ধাপ এগিয়েই বলতে পারি যে মানবিক শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য ও সৃষ্টিধর্মী।

শিক্ষনীয় মানবিক শাস্ত্রে শিল্পকলাব চর্চা আছে, তবে এ কথা বলতে বাধা কোথায় যে সেই শাস্ত্রের শিক্ষক শিল্পী, অন্তত মার্জিত রুচি মানুষ। কিন্তু বাস্তবে তা তাঁরা নন বা শিল্পী তাঁদের হতেই হবে এমন কোন কথা নেই। একথা সরাসরি বলা দরকার এই কারণে যাতে আমরা মানবিক শাস্ত্রের দাবির সঙ্গে মানবিক শাস্ত্রবিদের জ্ঞান, মযাদা ও মিথ্যা সম্মানের দাবিকে এক করে না দেখি। কিছুদিন আগে একজন মনোবিকারের চিকিৎসক মানবিক শাস্ত্রের সম্পূর্ণ ব্যর্থতার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁর

বক্তব্য ছিল আমরা যদি ওই সময় ও অর্থ মনঃসমীক্ষণে ব্যবহার করি তবে মানুষের ব্যক্তিগত সুখ অনেক বেড়ে যায়। এ তর্কের কোনও জবাব নেই। এ তর্ক অবান্তর। কিন্তু মানবিক শাস্ত্রবিদ ও তাঁর কাজের সম্বন্ধে যে প্রচলিত অর্থহীন ধারণা আমরা পোষণ করি তাকে চিরস্থায়ী হতে দেওয়াও যে বিপদ এই বচসা সেইদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আমাকে আবার বলতে হচ্ছে মানবিক শাস্ত্রশিক্ষা আমাদের সৃষ্টিধর্মী করে তোলে না। মানবিক শাস্ত্রের সংজ্ঞা যখন কলাবিদ্যা ও চিন্তাধারার শিক্ষা তখন একথার পুনরুক্তির প্রয়োজনও দেখি না। এ কথা সত্য যে শিক্ষিত মানুষের মধ্যে সেই বুদ্ধি, কল্পনা, সূক্ষ্ম বিচারশক্তি, ইত্যাদি গুণ দেখা যায় যা পাই শিল্পীর মধ্যে। তবুও সে স্রষ্টা নয়—নূতন কিছু সে সৃষ্টি করতে পারে না। একটু লক্ষ্য করে দেখলেই বোঝা যায় যে শিল্পীর মনোভাবের সঙ্গে পণ্ডিতের মনোভাব খাপ খায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডির মধ্যে বড় সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে এমন কথা কখনও শোনা যায় নি। আমি সাহিত্যের প্রকাশের কথা বলছি না, সেরা সাহিত্যের সৃষ্টির কথা বলছি।

পাণ্ডিত্য ও শিল্পকর্মের মধ্যে এই পার্থক্য আছে বলেই শিল্পীর উচিত নয় তার শিল্প-প্রচেষ্টাকে পণ্ডিতের সমর্থনের বস্তু করে তোলা। এই সমর্থন খোঁজা আজকালকার নিয়ম এ কথা জানি, এবং সেইজন্যই এ যে অনুচিত ও নিরর্থক সেই কথাই ঘুরেফিরে বলছি। মানবিক শাস্ত্রে শিক্ষিত ব্যক্তির কাজকে সাধারণ মানুষ সমর্থন করবে সে শিল্প-সৃষ্টি করে বলে নয়, শিল্পের সেবা করে বলে। প্রতি যুগের মানুষের সঙ্গে সে শিল্প-কলার পরিচয় করিয়ে দেয়, আমাদের চোখ, কান ও মনকে খুলে রাখতে সাহায্য করে। শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বজায় রেখে সে শিল্পের সেবা করে। অসঙ্গতি ও অর্থহীনতার হাত থেকে সাহিত্যকে রক্ষা করে সে সাহিত্য-পাঠের বাধা দূর করে। সৃষ্ট-সাহিত্যের নীতি স্থির করে, একের সঙ্গে অন্যের যে সম্বন্ধ তার ব্যাখ্যা করে, সে পাঠকের কৌতূহল মেটাতে পারে, সাহিত্য-পাঠে যে আনন্দ তা বাড়িয়ে তুলতে পারে। এইভাবেই মানবিক শাস্ত্রবিদ শিল্প-কলার সেবা করে। কলাবিদ্যা ও চিন্তার মানুষের যে আজন্ম প্রয়োজন এইভাবেই ব্যবহারিক উপায়ে তা সে মেটাতে পারে।

কখনও কখনও শিক্ষনীয় মানবিক শিক্ষা নষ্ট কলা উদ্ধার বা আবিষ্কার করে কলা-শিল্পের সঞ্চয় বাড়ায়। অল্প কিছুদিন আগে একজন মার্কিন সঙ্গীততত্ত্ববিদ Hayden কৃত একটি প্রার্থনা সঙ্গীত উদ্ধার করেছেন। অনুসন্ধানের পিছনে

যে দক্ষতা ও অবিশ্রান্ত চেষ্টা রয়েছে তা প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু এ কথা বোঝা শক্ত নয় যে ওই প্রচেষ্টা ও প্রার্থনা সঙ্গীত রচনা করার মধ্যে অনেক তফাৎ। অন্যদিকে শিল্পীর পণ্ডিতের ভূমিকা গ্রহণ করার অধিকার নেই। Hayden এর মত একজন সঙ্গীত রচয়িতার লুপ্ত সঙ্গীতের খোঁজে মঠ থেকে মঠে ঘুরে বেড়িয়ে সময় নষ্ট করার প্রয়োজন দেখি না। বরং হারিয়ে যাওয়া গান তাকে নূতন সঙ্গীত সৃষ্টিতে প্রেরণা দেবে।

ব্যক্তিগত জীবনে উদ্দেশ্য এবং কর্মদক্ষতার যোগাযোগ যেমনই হোক, ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও বৃত্তিগত দায়িত্ব এক নয়। এই জন্য পণ্ডিত লোক মার্জিত না হলেও ক্ষতি নেই। সাধারণত অবশ্য ওই দুই গুণের সমাবেশ ঘটে, কিন্তু মার্জিত হওয়া পণ্ডিতের অধিকার, কর্তব্য নয়। এর অর্থ, শিক্ষাদানের ক্ষমতার মত পাণ্ডিত্যও একটি বিশেষ গুণ, পরোক্ষভাবে তা অন্য কোনও গুণের বা ক্ষমতার ইঙ্গিত না দিতেও পারে। সতের শতকের পণ্ডিত মানুষ রিচার্ড বেনট্‌লি নিজের ক্ষেত্রে একজন মনীষী ছিলেন। তিনি যে প্রাচীন ভাষাগুলি জানতেন তা না, সেগুলি ইন্দ্রিয় দিয়ে উপভোগ করতেন। অথচ মিলটনের উপর তাঁর যে ভাষ্য তার থেকে বোঝা যায় তিনি নিজের মাতৃভাষাই জানতেন না, এব কখন কখনও সহজ বুদ্ধিও তাকে ত্যাগ করে গিয়েছিল।

একথাও সত্য যে পাণ্ডিত্যের বড় ভাগ নীরস কাজ দিয়ে তৈরি। সে হিসাবে পণ্ডিতও রসহীন ব্যক্তি। তাই বলে এ কথা কে বলবে যে তাদের আবশ্যকতা নেই তারা সমর্থনের যোগ্য, প্রশংসার পাত্র নন? যে সব লোক পত্র সম্পাদনা করে, প্রাচীন সাহিত্যের টীকা লেখে, বই পত্রের তালিকা তৈরি করে, অভিধান লেখে, তারা পরীক্ষাগারের কর্মী, যারা সূক্ষ্ম পরীক্ষা ফিরে ফিরে করে, বা যারা প্রশ্নমালাকে গ্রাফে পরিণত করে, তাদের চেয়ে এঁরা কম অপরিহার্য নয়। এঁরা প্রত্যক্ষ মনের খোরাক যোগায় না। কিন্তু তবু তাঁদের প্রয়োজন আছে তাদের কাছে আমরা ঋণী। একজন লোক নধর গরু চালায় বলে নিজেও নধর দেহ হবে এ কথা যেমন যুক্তিযুক্ত নয়, তেমনই যে কবিতার বর্ণানুক্রমিক তালিকা তৈরি করে সে কবি হয়ে উঠবে এ আশা করা অনুচিত।

'হিউম্যানিটিজ' সিনডারেলা (Cinderalla) নয়। ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করে সে জগতে প্রবেশ করে না, আবার বাস্তব যখন সেই জাল ছিন্ন করে তখন তাকে পালিয়ে বেড়াতে হয় না। বরং ঠিক উল্টো, 'হিউম্যানিটিজ' আমাদের জীবনে সব সময় উপস্থিত রয়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে তাকে যদি

দীন বলে মনে হয় তার কারণ তার দানটাকে আমরা আগে থেকেই প্রাপ্য বলে ধরে নি। মানবিক শাস্ত্রজ্ঞানের বিশেষ স্তবে উঠতে পারলেই ওই শাস্ত্রচর্চার সম্পদটা বোঝা যায়। সেখানে দেখি ছাত্র সমৃদ্ধি, উৎসাহের প্রাচুর্য ও অপার্থিব পুরস্কারের সম্ভার। 'হিউম্যানিটিজ' নিজের সত্য মূল্যের চাবিটা ঠিকমত তুলে ধরতে পারে না বলেই তাব গরিবানাটা আমাদের চোখে পড়ে। একদিকে সে এমন সব ক্ষমতার অধিকারী আছে বলে ঘোষণা কবে যে ক্ষমতা কারও নেই, অন্তত তার নেই। আবার অন্যদিকে সমস্ত দাবি-দাওয়ার বিষয় থেকে সে অতি বিনয়েব সঙ্গে নিজেকে সরিয়ে রাখে।

মানবিক শাস্ত্রবিদ বার বার অরুচিকর এই সাধু-বাক্য শুনেছেন, "মানুষ শুধু রুটি খেয়ে বাঁচে না।" তাঁরা কখনও বাধা দিয়ে বলেন নি, "ওহে রুটিওয়ালা, ওহে কসাই, তোমবা ক্ষান্ত হও! আমাদের প্রতি তোমাদের কর্তব্য কর যাতে আমরা আমাদের স্পর্শ দিয়ে তোমাদের পুণ্যশালার জীবনকে সোনা করে তুলি, সহনীয় করি।"

এই উত্তবে মহত্ত্বের অবশ্যই পরিচয় নেই, কিন্তু আত্ম-প্রবঞ্চনাও নেই। আজকালকার এই প্রতিযোগিতার যুগে এ উত্তর বরং উপযোগী। ধ্যান-কল্পনার অন্য মুহূর্তে মানবিক শাস্ত্রের ভাষা অন্য হতে পারে। এখানে সেই ভাষারই প্রতিধ্বনি তুলে আমি এই প্রবন্ধ শেষ করব।

মানবিক শাস্ত্র জ্ঞানেরই একটি রূপ। বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ের মত মানবিক শাস্ত্র প্রকৃতি ও সমাজ-অন্তর্গত মানুষের যে জীবন তারই আলোচনা করে। কিন্তু এই জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব মানুষের আধ্যাত্মিক সৃষ্টি তার ভাষা, শিল্প, ইতিহাস, দর্শন ও ধর্মের অনুশীলনের মধ্য দিয়ে। মনের মধ্যে মানুষের যে সম্পূর্ণ রূপটি গড়ে ওঠে তাতে জীবনের পুরোভাগে পাই নূতনত্ব, স্বাতন্ত্র ও বিস্ময়কর নিয়মাতিরিক্ততা। প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান প্রকৃতির বিধিগুলির মধ্যে সাদৃশ্য খোঁজে ও সমাজ-বিজ্ঞান সমাজের মধ্যে যা নিয়মিত ও অপরিহার্য তাকে বোঝাবার চেষ্টা করে। মানবিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে মানব-প্রকৃতির অনুশীলন ব্যক্তিকে নিয়ে, তার স্বাতন্ত্রকে নিয়ে তার মধ্যে শাসন-অতিরিক্ত যে রূপটি আছে তাকে নিয়ে। মানুষের মধ্যে যে অনিয়ম আছে, যে অতুলনীয়তা আছে, যার অস্তিত্ব আছে অথচ আচার নেই, মানবিক শাস্ত্র তারই একটা সজীব ও অতি চমৎকার ছবি আমাদের সামনে উপস্থিত করে। সোফোক্লিস ( Sophocles ) য়্যান্টিগোনের মত দ্বিতীয়

নারী সৃষ্টি হয় নি, য়্যান্‌টিগোন নাটকের মত দ্বিতীয় নাটক লেখা হয় নি। থুসিডাইডস্ ( Thucydides )এ যে এথেন্সের প্লেগের বর্ণনা আছে তা একটা অজ্ঞাত অতীত ঘটনাকে চিরকালের জন্য আমাদের সামনে জীবন্ত করে উপস্থিত করছে। রেমব্রাণ্টে ( Rembrandt )এর আঁকা বৃদ্ধার ছবি সেই ছবির মধ্যেই শুধু দেখা যাবে। বিথোফেনের চতুর্থ সিম্‌ফনির মন্থর গতি কোন বাঁধাধরা নিয়মে চলে না, নিটসের Zarathustra একাধারে অসম্ভব ও বিস্ময়কর প্রকাশ, টমাস্ হার্ডির গীতি-কাব্যে ভাষার ব্যবহারে ও অনুভূতি-আশ্রিত মনোভাবেব ক্ষেত্রে যথেচ্ছাচারের পবিচয় পাওয়া যায়, সমস্ত নিয়মের অপ্রমান আছে। শত শত লোকের ভাষার মধ্যে একদিকে অসঙ্গতি, অন্যদিকে সূক্ষ্ম শৈলী। এইগুলিকে নিয়েই মানবিক শাস্ত্রের কাজ, এইগুলিকেই সে যুক্তি ও সত্যের আধারে স্থাপন করে, যাতে নির্ধারিত নীতি ও উচ্ছৃঙ্খল আত্মিকশক্তির মিলন ঘটে। এই জন্যই 'অশোভন বিজ্ঞান' এব উপযুক্ত নাম।

# জীবন রহস্য

উইলিয়াম এস. বেক্.

এক সময় ছিল যখন সাধারণ লোক গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তর্কে সক্রিয়ভাবে যোগ দিত। সংসারী-বিষয়ী মানুষ নূতন নূতন আবিষ্কারের উত্তেজনায় মেতে উঠত, সেই উত্তেজনা সৃষ্টি করতেও সাহায্য করত। ইতিহাসের অবিস্মরণীয় ও সার্বজনীন বুদ্ধি যুদ্ধের প্রাঙ্গণ থেকে প্রাণবন্ত, দলবিভক্ত জনসাধারণ তর্কের প্রধান নায়কদেরই প্রায় অপসারিত করত। সোরগোলটা ছিল এমনই!

সাধারণত এই সব তর্কের সূত্রপাত হত এক-একটি আবিষ্কারের পরে, যে আবিষ্কারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফলে জগতের মাঝে মানুষের রাজসিংহাসনটি টলে উঠত। শোনা যায় কোপারনিকাস যখন ঘোষণা করেন যে সূর্য পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে না, পৃথিবীই সূর্যের চারিদিকে ঘোরে, তখন হাস্যোচ্ছল বড বড ভোজ সভাব আয়োজন করে হর্ষোৎফুল্ল নাগরিকের দল এমন ভান করতেন যে তাঁরা সোজা হয়ে দাঁড়াতেই পারছেন না। যে পৃথিবী ঘুরছে সেখানে ভারসাম্য রাখা যায় কি করে? তেমনই পাস্তুর ও তাঁর বিপক্ষদলের মধ্যে যখন জীবাণুশূন্য সব্‌জি ইত্যাদি মেশান তরল ঘাঁটে (ব্রথ) আপনা থেকেই ব্যাক্‌টেরিয়ার জন্ম হতে পারে কি না এ নিয়ে ঘোর তর্ক চলেছে তখন উত্তেজিত জনসাধারণ তাতে যোগ দিয়ে সেই তর্ককে তখনকার দিনের একটা প্রধান প্রশ্নে দাঁড় করিয়েছিলেন। আবার, ডারউইনের বিবর্তনবাদ মানুষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, তার পূর্বপুরুষ লাঙ্গুলহীন বানরবিশেষ, এ তত্ত্ব যখন হাক্সলি সগর্বে ঘোষণা করেন তখন যে কলরব উঠেছিল তা আমাদের ভোলবার কথা নয়।

আজকাল বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও তার বক্তব্য সম্বন্ধে অনেক শিক্ষিত লোকেরও আগ্রহ অত্যন্ত কমে গেছে, যদিও আধুনিক বিজ্ঞান ও বিশেষ করে জীববিদ্যার দান মানুষের জীবনের ও চিন্তার ক্ষেত্রে আজ যতটা তাৎপর্যপূর্ণ তেমন কখনও ছিল না; মানুষের মনে উত্তেজনা সৃষ্টি করার ক্ষমতাও বিজ্ঞানের আজ কম নয়। এই রহস্যের সমাধান করা সহজ নয়। এমন হতে পারে আমরা যে যুগে বাস করছি সেখানে ব্যক্তি-নিরাপত্তার

এতই অভাব যে মানুষ নূতন কোন প্রশ্নের মধ্যে ঢুকতেই ভয় পায়, কারণ সেই প্রশ্নের উত্তর তার অবস্থাকে আরও অনিশ্চিত করে তুলতে পারে।

এটাই অবশ্য সব কথা নয়। অনেকের কাছে বিজ্ঞানের পরিভাষা, তার নৈর্ব্যক্তিকতা, জটিলতা, বিমূর্ততার চিন্তা ও তার সঙ্কেতিক ভাষা বাধার সৃষ্টি করেছে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে বিজ্ঞানের যোগাযোগ নষ্ট হয়ে গেছে। স্কুলপাঠ্য বইটাই ভাল করে বুঝতে পেরেছি কি না যখন জানি না তখন বিশেষজ্ঞের ভাষা বুঝব এমন আশা করি কি করে? এ ধারণা কিন্তু ভুল। চিন্তা ও চেষ্টা করার হয়তো প্রয়োজন আছে। চারিদিক চেয়ে দেখতে হলে মাথা নিচু করে রাখলে চলে না, মাথা তুলতে হয়। কিন্তু সে প্রচেষ্টার মূল্য আছে।

কৌতূহল মেটানর আনন্দটাই কম নয়। জীবনে বড ঘটনা যা ঘটছে তার স্বাদ-গন্ধটা আমাদের তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করা দরকার। কারণ যে অবদান সত্যই মহৎ তা মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডারে অবিলম্বে স্থান পাবে। কালকের আবিষ্কারের পরম লাভ আজকে সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। আবিষ্কারের মুহূর্তটা চলে যেতে দিলে তার উত্তেজনা হারাব। বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে অনেকের মতে জ্ঞান আবিষ্কারের আনন্দ জ্ঞান-দখলের আনন্দের চেয়ে অনেক বড। এঁদের সঙ্গে আমি একমত।

বিজ্ঞান আধুনিক সভ্যতার একটি প্রধান অঙ্গ। আমাদের ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক বিজ্ঞান আমাদের নূতন, অদ্ভুত সব জগতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে, যে জগতে পূর্ণতার মধ্যে ও শান্তির সঙ্গে বসবাস করতে হলে বিজ্ঞান কি ও কি নয়, পরিবেশকে আয়ত্তে আনতে সে কতটুকু সাহায্য করতে পারে বা না পারে, মানুষের সম্বন্ধে, প্রকৃতিতে তার স্থান সম্বন্ধে, তার নিয়তি সম্বন্ধে সে কি বলতে চায়, তা আমাদের জানা উচিত।

আধুনিক জীববিদ্যার একটা লক্ষণীয় ব্যর্থতা এই যে বিশেষজ্ঞতা লাভের আগ্রহ আতিশয্যের ফলে এমন কাউকে এক্ষেত্রে দেখা যায় না যিনি সাধারণভাবে জীবন সম্বন্ধে কথা বলতে পারেন। জীবনবিদ্যার ক্ষেত্রে উদ্ভিদবিদ্যাবিদ আছেন, রোগ-জীবাণুবিদ আছেন, জৈবরাসায়নিক আছেন, যাঁরা নিজের নিজের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ। কিন্তু এমন কেউ নেই যে, জীবন কি, এই সাধারণ ও সব চেয়ে বড় প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন।

জীবন-রহস্য ব্যাখ্যার জন্য যে সব প্রকল্প খাড়া হয়েছে, তার কোনটাই নিশ্চিন্তভাবে পরীক্ষণীয় নয়। এইজন্য সেই প্রকল্পকে যাচিয়ে দেখতে

হলে যেটা প্রথম করা দরকার সেটা করা সম্ভব হয়নি—তাকে পরীক্ষাধীন করতে পারিনি, তার সম্ভাব্য বিচার করে দেখে তার পরিবর্তন করতে বা তাকে অস্বীকার করতে পারিনি। কারণ এইসব ধারণার একমাত্র মূল্য এই যে তার থেকে আমরা অন্য প্রকল্পে যেতে পারি, অন্য পরীক্ষণে অবতীর্ণ হই। এইভাবে জ্ঞান সঞ্চয় হয় ও বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটে।

জীবন-রহস্য সন্ধানের ক্ষেত্রে পরীক্ষণ যোগ্য তথ্যের শুধু অপরোক্ষ মল্য থাকতে পারে। পরীক্ষাগারে প্রবেশ করে সরাসরি জীবন নিয়ে পরীক্ষা স্বরু করা যায় না। গবেষণার বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ, নির্দিষ্ট প্রশ্নের মধ্য দিয়ে আমবা জীবনের কতগুলি নমুনাব অনুশীলন করে থাকি। বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর একত্রিত করে আমরা হয়তো একটা সাধারণ সংজ্ঞার ভিত্তি গড়তে পারি যার প্রতিফলিত আলোক সব চেয়ে বড যে প্রশ্ন তার সমাধানের পথ দেখাতে পারবে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এখন যা ঘটছে তাতে মনে হয় ওই প্রশ্নের এখনই একটা জবাব দেওয়া সম্ভব। এই উত্তর হয়তো আমাদের সন্তুষ্ট করতে পারবে না, কারণ উত্তর থেকেই মনে হতে পারে আমরা আর একটা অর্থহীন প্রশ্ন তুলেছি।

পুরাকাল থেকেই একটা তর্কের বিষয় সম্বন্ধে আমাদের মারাত্মক আকর্ষণ দেখা গেছে। যান্ত্রিক বা জড়বাদী মত অনুযায়ী পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞানের নিয়মগুলির কৃত্রিম সংযোগের সূত্র ধরে কি জীবন-রহস্যের ব্যাখ্যা করা যাবে, না কোনও অপার্থিব প্রভাব বস্তুর মধ্যে প্রাণ-স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি করেছে এ কথা মানতে হবে? গ্রীক সভ্যতার যুগ থেকে আজকের জৈব-রাসায়নিক যুগ পর্যন্ত এ প্রশ্ন ঐতিহ্যগত চিন্তার বিভিন্ন এলাকার সীমারেখা বরাবর অতিক্রম করেছে। কখনও জীববিদ্যা, পদার্থ বিজ্ঞান ও রাসায়নের আশ্রয় নিয়েছে, কখনও ধর্মতত্ত্বের মাধ্যমে দর্শনশাস্ত্রের দীর্ঘ ও জটিল পথ অতিক্রম করেছে। বিদ্যাচর্চার এই একটি ক্ষেত্রে খোলাখুলি জল্পনা-কল্পনা, বৈজ্ঞানিক রীতির সাধু প্রয়োগ, ইচ্ছা আশ্রিত চিন্তা ও অনুপাতহীন সীমাহীন তত্ত্বের সঙ্গে আংশিক সাক্ষ্যের জোড়াতালির যে নজির দেখা যায় তা অন্য কোথাও দেখা যায় না। কি সেই প্রশ্ন যার এত বিভিন্ন রকম উত্তর পাওয়া গেছে?

এ কথা স্পষ্ট যে প্রাণীমাত্রই বস্তুজগতের অন্তর্ভুক্ত। তার ওজন আছে, ঘনত্ব আছে, জড়পদার্থের গণ্ডির মধ্যে সে আবদ্ধ। দেহাতিরিক্ত প্রাণের

বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নি। যে সব বস্তু দিয়ে জীবদেহ তৈরি হয়েছে সে সম্বন্ধে প্রত্যেক রাসায়নিকেরই জ্ঞান আছে। জীবদেহে কতকগুলি পদার্থের কি ভাবে সমন্বয় ঘটেছে তা আমরা জানি। একথাও জানি প্রাণীমাত্রেরই মৃত্যু হয় ও মৃত্যুর পর তাদেব জড়দেহ অন্তত কিছুক্ষণের জন্যও তার আকার, ওজন ও দৈর্ঘ্য হারায় না। এই দুটি সাধারণ সত্য বোধহয় সকলে মেনে নিতে বাধ্য। এখন প্রশ্ন, জীবিত ও জড পদার্থের মধ্যে যে পার্থক্য তার কারণ কি ?

যে জিনিসটা জড়পদার্থকে জীবিত পদার্থে রূপান্তরিত কবে তাব সম্বন্ধে নানা মানুষেব নানা ধারণা আছে। প্রাচীনকালের লোকের ধারণা ছিল এর পিছনে একটা আত্মিক শক্তি আছে, জীবন-নীতি ও আত্মাব বিশেষ প্রকাশ আছে। এরিস্‌টটলের মতে এতে তিনটি আত্মা আছে। প্রাচীন দার্শনিক ডেমোক্রিটাসেব ধারণায় অন্যান্য পদার্থেব মত প্রাণও পরমাণু দিয়ে গড়া। দেকার্ত সতের শতকে জড়পদার্থ ও মনেব মধ্যে প্রভেদেব রেখা টেনে একটা দ্বৈতবাদেব প্রচাব করেন। তাঁর মতে যেটা আমাদেব জড়দেহের অংশ সেটা যান্ত্রিক নিয়মে চলে। মন বা "বিবেচক আত্মা" দেহেব অন্তর্গত নয়। চিন্তা, অনুভূতি ও বুদ্ধির কাজেব মধ্য দিয়ে তার প্রকৃতিটা চেনা যায়। যদিও দেহেব কোনও বিদ্যুৎপ্রবাহী গ্রন্থির উপব মনেব কাজ স্পষ্ট দেখা যায়, জীবদেহেব অন্যান্য কাজগুলি স্বতন্ত্র যান্ত্রিক বীতিতে হয়ে থাকে। দেকার্ত যান্ত্রিক জীববিদ্যার উপর এত জোর দিয়েছিলেন যে, অনেকে বলতে সুরু করেন যে, আত্মা একটা অবাস্তর কল্পনা।

জীববিদ্যা অবশ্য তার আত্মা হারায় নি। যথেচ্ছ উক্তির বদলে বৈজ্ঞানিক-ঘেঁষা ভাষার ব্যবহাব সুরু হয় যার মধ্য দিয়ে মূল প্রাণশক্তির ( Vital forces ) ধারণাটা উত্থাপিত হয়। এই প্রাণশক্তি এমন জিনিস যা জড়কে প্রাণবন্ত কবে। যদিও এব মধ্য দিয়ে কোনও কিছুরই ব্যাখ্যা হয়নি, আমরা প্রশ্নের জবাবের পরিবর্তে কতকগুলি শব্দ সঙ্কেত পাই, তবু ওই প্রাণ-প্রেরণার ধারণার মধ্যে অনেকগুলি অ-জড়বাদী চিন্তার মিশ্রণ ঘটে। উনিশ শতকেব শেষে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জড়বাদী ও প্রাণবাদীর তর্ক অপ্রীতিকর হয়ে ওঠে। জীববাদীরা বলতে থাকেন, ডারউইনের বিবর্তনবাদে মানুষের মন ও চেতনার উদ্ভবের কোন ব্যাখ্যা নেই। এ ছাড়া তাঁরা ল্যাবরেটারি থেকে নানা নাটকীয় সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত

করতে স্বরু করেন। জার্মান জীববিত্থাবিদ Homs Driesch দেখান কি করে একটা গোসাপের পা কেটে ফেলার পর নূতন পা দেখা দেয়। এই পরীক্ষার তাঁর কাছে একটা স্পষ্ট অর্থ ছিল। জীবদেহে এর মধ্য দিয়ে তিনি একটা অদৃশ্য নিয়ন্ত্রণ শক্তির নিশ্চিত প্রমাণ দেখেছিলেন। Driesch বলেছিলেন যে তত্ত্ব জীবনকে একটা জড় পদার্থের বা রসায়নের যন্ত্র হিসাবে কল্পনা করে, সে তত্ত্ব ডিম থেকে সম্পূর্ণ প্রাণীর উদ্ভব বা মনের উদ্ভবের রহস্য কিছুতেই ব্যাখ্যা করতে পারে না।

ব্যবচ্ছেদের পর গোসাপের অঙ্গের যে পুনরাবির্ভাব ঘটে একথা জীববিত্থাবিদ অস্বীকার করেন না। এ পরীক্ষা বার বার করে দেখান যেতে পারে। কিন্তু এর থেকে যে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে তাই নিয়েই তর্ক ওঠে। ওই পরীক্ষণের ব্যাখ্যার জন্য কি অদৃশ্য প্রাণ-শক্তির কল্পনা করার প্রয়োজন আছে? এমন শক্তির প্রমাণ কোথায়? এখানে সমস্যা, জীববিত্থাগত এমন কোন সম্ভাব্য পরীক্ষণ নেই যা প্রাণ-শক্তির অস্তিত্বকে অপ্রমাণ করে। এমন কোন অবস্থা নেই যেখানে প্রাণ-শক্তি কাজ করছে দেখান যায় না। যা দেখি তাই প্রাণ-শক্তির অস্তিত্বের সঙ্গে সুন্দর ভাবে মিলে যায়। এমন কি মৃত্যুরও অর্থ দাঁড়ায় প্রাণ-শক্তির বিলোপ। অতএব প্রাণীর মৃত্যুও ওই সিদ্ধান্তকে নিঃশেষ করে না।

অন্যদিকে জড়বাদী জীববিত্থাবিদের মনে সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনাই বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। পদার্থ ও রসায়ন শাস্ত্র অনুযায়ী জীব-জগতের সমস্ত ক্রিয়া-কলাপেরই তাকে ব্যাখ্যা করতে হয়, কারণ পূর্ব থেকে তাদের অর্থ স্থির করা থাকে না।

জড়বাদী তার পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ক্রমশ যে সাফল্য অর্জন করেছে তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। ফলে Drieschএর অপরিমিত ও কিছুটা অযৌক্তিক প্রাণবাদের ধারণা আমাদের সমর্থন হারিয়েছে। এই জন্যই আজকাল বলা হয় যে জীববিত্থার ক্ষেত্রে প্রাণবাদের তর্কের আর কোন মূল্য নেই, সে বিষয়ের মীমাংসা আগেই শেষ হয়েছে। কিন্তু অন্যদিকে একটা যান্ত্রিক ব্যাখ্যাকেও যে সকলে মেনে নিয়েছেন এ কথা বলা চলে না। কয়েকজন জীববিত্থাবিদ একটা মাঝামাঝি পথ ধরেছেন। তাঁদের মতে প্রাণবস্তুর সার হল তার অখণ্ডতা ও আশ্চর্য সংহতি। এই সংহতি বাদে প্রাণীর দেহের জড় অংশের জটিল গঠনের উপর প্রাণের অস্তিত্ব বা স্ফুরণ নির্ভর করে। এ পর্যন্ত অত্যন্ত গোঁড়া জড়বাদীর কাছেও এই সিদ্ধান্ত

অগ্রহণীয় নয়, কারণ তাঁরা একথা স্বীকার করেন যে খণ্ডিত প্রাণবস্তু বলে কিছু নেই, যা আছে তা হল অখণ্ডিত, জটিল, পূর্ণাবয়ব জীবদেহ।

কিন্তু সংস্কৃতিবাদী এইখানেই থামেন নি। তাঁরা তাঁদের সিদ্ধান্তের সঙ্গে এমন কতকগুলি বিশ্বাস যোগ করেছেন যা বিজ্ঞানের আওতায় আসে না। তারা জীবনের উদ্দেশ্য ও চিন্তার প্রকৃতি তত্ত্বের উত্থাপন করেছেন। অতএব জড়বাদ ও প্রাণবাদের তর্ক শেষ হয়ে গেছে বলা ঠিক হবে না।

এই তর্কের মাঝে জীববিদ্যাবিদ তাঁর সাফল্যের মধ্য দিয়ে এমন অবস্থায় এসে পৌচেছেন যে বিজ্ঞানের ইতিহাসে তা এক স্মরণীয় সূচনা হয়ে থাকতে পারে। কয়েক বছরের মধ্যে পূর্ণাবয়ব জীবদেহের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এত তাড়াতাড়ি এতদূর এগিয়ে গেছে যে এর পরে কি হবে বা হবে না সে বিষয়ে ভবিষ্যৎবাণী করা দুঃসাহসের কাজ। আজকে কোনও বৈজ্ঞানিকই জীবনের একটা গুপ্তরহস্য বা নীতির কথা স্বীকার করবেন না।

এই মনোভাবের ভিত্তি কোথায়? জীববিদ্যার কয়েকটি আধুনিক আবিষ্কারের কথা আলোচনা করা যাক।

সরব বাক্-বিতণ্ডার মধ্যেও উনিশ শতকে জীববিদ্যার ক্ষেত্রে কতকগুলি মূল তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। একটি সিদ্ধান্ত হল জীবকোষ জীবনের ভিত্তিস্বরূপ। বহুকোষবিশিষ্ট উদ্ভিদ বা জীবদেহ গড়ে উঠেছে একই শ্রেণীর কোষসমষ্টি দিয়ে এবং দুভাগে বিভক্ত হয়ে নূতন জীবকোষ সৃষ্টি হয়। আর একটি সিদ্ধান্ত হল স্বতঃস্ফূর্ত উৎপত্তির পরে জীব থেকেই শুধু জীবের সৃষ্টি হয়।

একই শ্রেণীর ও বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে জীবন-যুদ্ধের ফলে জীবের বিবর্তন ঘটেছে, এই আর একটি তত্ত্বকথার সৃষ্টি করেন ডারউইন। এ ছাড়া মোরাভিয়ার যাজক গ্রেগর মেনডেলের ( Gregor Mendel ) বিরাট কীর্তি রয়েছে। তিনি মটরের প্রজনন সম্বন্ধে পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে বংশানুক্রম প্রত্যেক উদ্ভিদের বীজকোষের মধ্যগত জড়কণার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। জনক ও জননীর বীজকোষ মিলিত হলে তাদের জনন-কণাগুলির মিশ্রণ ঘটে ও এই যোগের ফলটি সন্তানের মধ্যে সংক্রামিত হয়ে তার বংশগত গুণ নিধারিত করে।

মেন্‌ডেলের সিদ্ধান্তেব সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হল এই যে সন্তানের মধ্যে মাতা বা পিতার কোন একটি গুণ, যেমন পিতার রঙ, দেখা দিলে

মাতার গুণ দ্বিতীয় পুরুষে প্রকাশ হতে পারে। এর থেকে প্রমাণ হয় যে সন্তানের মধ্যে মাতার রঙটি প্রথমে দেখা না দিলেও, সেই গুণের বীজকণা সন্তানে সঞ্চারিত হয়ে, পিতার বীজকণার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়েছিল। সন্তানের মধ্যে ওই বীজকণা শুধু যে উপস্থিত থাকে তাই নয়, তার গুণটা নষ্ট হয় না এবং দ্বিতীয় পুরুষে তা সঞ্চারিত হতে পারে। এ থেকে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে বংশ পরম্পরায় বিভিন্ন ও পৃথক জড়কণার সমষ্টির উপর উত্তরাধিকার নির্ভর করে। ১৯০৯ সালে হল্যাণ্ডের Wilhelm Johannson এই বীজকণাগুলির নাম দেন 'Gene' ( জীবকণা )।

অনেকের মত ডারউইন মেনডেলের আবিষ্কারের অর্থ বুঝতে পারেন নি। ডারউইন ও মেনডেলের আবিষ্কার যে এক অন্যের বিরোধী নয়, এ কথা বর্তমান শতকেও বহুদিন পর্যন্ত অনেকের হৃদয়ঙ্গম হয়নি। মেনডেল দেখিয়েছেন যে জননের কণাগুলি স্থায়ী ও সেই জন্যই সন্তান-সন্ততি তাদের জনক-জননীর সমবর্গগত হয়ে থাকে। ডারউইন বলেছেন বর্গগুলি স্থির নয় ও বিবর্তনের ফলে নূতন বর্গের সৃষ্টি হয়। এই দুই সিদ্ধান্তের মিল কোথায়? এর উত্তর প্রজননজনিত রূপান্তর বা পরিব্যক্তি ( mutation ) অর্থাৎ সময়ে সময়ে জনন-কণাগুলিরই হঠাৎ পরিবর্তন।

জীবকণাগুলির হঠাৎ রূপান্তর ঘটলে তা সম্পূর্ণ ও স্থায়ীভাবে ঘটে। যেমন জীবকণার পরিচয় পাই সন্তান-সন্ততির মধ্যে তার কাজ দেখে, তেমন রূপান্তরিত জীবকণার কথা জানতে পারি যখন সন্তানের মধ্যে ভিন্ন গুণাবলির প্রকাশ ফুটে ওঠে এবং সেই গুণ পরের বংশে সঞ্চারিত হয়। জীবকণার রূপান্তর বা পরিব্যক্তি অতি বিরল। ১৯২৭ সালে অধ্যাপক হারম্যান জে মুলার এক জাতীয় মাছির উপর পরীক্ষা করে দেখিয়েছিলেন যে কৃত্রিম উপায়ে জীবকণার রূপান্তর বার বার ঘটান সম্ভব। জীবকোষগুলিকে রঞ্জনরশ্মি বিকিরণের সামনে রাখলে ওই রূপান্তর হয়, যত বেশী রশ্মিপাত হয় কৃত্রিম রূপান্তরের সংখ্যাও তত বাড়ে। এর থেকে প্রমাণ হয় যে জীবকণার স্বতঃস্ফূর্ত রূপান্তরের প্রাথমিক কারণ রঞ্জনরশ্মির আকস্মিক বিকিরণ, যে বিকিরণ বহিঃপ্রকৃতিতে বিরল নয়। অন্যদিকে বিবর্তনের মূল কারণ ওই রূপান্তর।

ডারউইন বর্গের মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটতে দেখেছিলেন তা পরিব্যক্তির ফল ও আমাদের যতদূর জ্ঞান তাতে ওই রূপান্তরকেই বিবর্তনের একমাত্র কারণ বলে ধরতে পারি। এই ভাবে ডারউইনের জীবজগতের পরিবর্তনের ধারণার

সঙ্গে মেনডেলের জীবকণার স্থায়িত্বের ধারণার মিল করা সম্ভব। জীবকণা পরিবর্তনহীন ততক্ষণ যতক্ষণ না তার রূপান্তর ঘটে।

এখন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে কি ভাবে জীবকণা সন্তান-সন্ততিতে সঞ্চারিত হয় ও কি ভাবে তার রূপান্তর ঘটে। কিন্তু জীবকণা কি ভাবে জীবদেহে এক বা অন্য গুণের প্রকাশে সাহায্য করে সে কথা আমরা এখনও জানতে পারিনি। জীবকণাকে প্রতিলিপি হিসাবে ধরলে প্রশ্ন ওঠে, তার সঙ্গে যে গুণ সৃষ্টি করে তার সম্পর্ক কোথায়?

ক্যালিফোরনিয়ার দুই অনুসন্ধানকারী, জর্জ ডাবলু, বিড্‌ল ও এডওয়ার্ড এল, ট্যাটাম, রুটির উপর যে লাল ছাতা পড়ে তা নিয়ে পরীক্ষা করেন। তার থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র পাওয়া যায়। এই পরীক্ষার ফলটিকে বুঝতে হলে, আমাদের কতকগুলি প্রাথমিক তথ্য জানা দরকার। জীবদেহ স্বনিয়ন্ত্রিত রাসায়নিক পরিবর্তনের একটা যন্ত্র বিশেষ। এর প্রধান কাজ রাসায়নিক উপায়ে পুষ্টিকর খাদ্যকে অন্যান্য যৌগিক পদার্থে রূপান্তরিত করা। ওই যৌগিক পদার্থ আমাদের শরীর রক্ষার জন্য ও তার বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন। জীবদেহে রাসায়নিক পরিবর্তনের এই যে রীতি কতকগুলি সঙ্কেতের সাহায্যে তা সহজে বোঝান যায়।

ক--খ—গ—ঘ—ঙ—চ—ছ

'ক' এখানে খাদ্যের মৌলিক উপাদানকে বোঝায় ও 'ছ' এমন একটি যৌগিক পদার্থ বা জীবদেহের পক্ষে প্রয়োজন। অন্য সঙ্কেতগুলি মধ্যবর্তী বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ বা রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার ধারাটা বজায় রাখে। কোষের মধ্যে বিশিষ্ট ও পৃথক এনজাইমের ( Enzyme ) উপস্থিতি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার প্রত্যেকটি পর্যায়কে সম্ভব করে তোলে। এনজাইম এক প্রকার প্রোটিন পদার্থ যা অন্যান্য পদার্থের আনবিক ( molecule ) কণার মধ্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে, সেই প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে।

জীবদেহে যে অসংখ্য রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটে, সেই প্রত্যেকটি প্রক্রিয়ার জন্য ভিন্ন ভিন্ন এন্‌জাইমের "প্রতিনিধিত্ব" দরকার। যে অল্পসংখ্যক য়্যামিনো য়্যাসিড দিয়ে সবরকম প্রোটিন তৈরি সেই য়্যামিনো য়্যাসিডের জটিল অবস্থানগত বিন্যাসের উপর এন্‌জাইমের বিশিষ্টতা নির্ভর করে বলে মনে হয়।

সমস্ত জৈবিক গুণের প্রকাশকে তাই এন্‌জাইম নির্ধারিত প্রক্রিয়ার ফল বলে ধরা যেতে পারে। যেমন চর্মকোষে কতকগুলি এন্‌জাইমের একত্রিত প্রভাবে সাংশ্লেষিক বাদামী রঙ সৃষ্টি হওয়ার জন্য বাদামী চামড়াকে বাদামী

দেখায়। অর্থাৎ বিশিষ্ট এন্‌জাইমের উপস্থিতি গুণের প্রকাশকে নির্ধারিত করে। এখন প্রশ্ন জীবকণা ( gene ) ও এন্‌জাইমের মধ্যে কি সম্বন্ধে ?

কিছু পরিমাণ রুটির ছাতা নিয়ে বিড্‌ল ও ট্যাটাম পরীক্ষা করেন। এই ছাতা 'ক' পদার্থ থেকে 'চ' পদার্থ তৈরি করার সাহায্য করে। বৃদ্ধির জন্য ওই ছাতার 'ছ' পদার্থের দরকার। কিন্তু ছাতাতে 'ক' থেকে 'ছ' পদার্থে পরিবর্তন ঘটানর এন্‌জাইম থাকার দরুণ শুধু 'ক' এর উপস্থিতিতেই ছাতাটা বাড়তে পারে। তাঁরা দেখলেন ওই ছাতার উপর রঞ্জনরশ্মি ফেললে অনেকগুলি সন্তান-সন্ততির জন্ম হয় যারা শুধু 'ক' পদার্থের উপস্থিতিতে বাড়তে পারে না, তাদের 'ছ' এর প্রয়োজন। অর্থাৎ 'ক' কে 'ছ' এ পরিবর্তন করার শক্তি তারা হারিয়ে ফেলে।

আরও ভালভাবে বিশ্লেষণ করে তাঁরা দেখলেন যে রঞ্জনরশ্মি জনিত যে ক্ষমতা নাশ হয় তা 'ক' থেকে 'ছ' এ আসার মাঝামাঝি একটিমাত্র স্তরে ঘটে। ধরা যাক 'গ' থেকে 'ঘ' এ পরিবর্তিত হওয়ার শক্তি ক্ষয় হয়েছে। এর দুটি প্রমাণ। শুধু 'ঘ' এর উপস্থিতিতে স্বাভাবিক বৃদ্ধি বাধা পায় না, অর্থাৎ 'ঘ—চ—ছ' এর যে পর্যায়ক্রম তা অটুট থাকে। দ্বিতীয় প্রমাণ 'গ' পদার্থের অতিবৃদ্ধি, অর্থাৎ 'ক' থেকে 'গ' সৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু 'গ' থেকে 'ঘ' এ পরিবর্তন ঘটছে না। অর্থাৎ রঞ্জন-রশ্মি ফেললে ওই ছাতা তার একটিমাত্র এন্‌জাইম হারায়। পরীক্ষা করে বিড্‌ল ও ট্যাটাম এ সত্য প্রমাণ করেন। তাঁরা আরও দেখলেন যে "গ—ঘ" পর্যায়ের এন্‌জাইম কৃত্রিম উপায়ে যোগ করে রুটির ছাতাকে বাড়তে দিলে স্বাভাবিক প্রজনন হয় কিন্তু পরবর্তী বংশে সেই একই এন্‌জাইমের অভাব ঘটে। এর থেকে বিড্‌ল ও ট্যাটাম সিদ্ধান্ত করেন যে প্রতি এন্‌জাইমের জন্য একটি জীবকণা আছে। এই হল "একটি জীবকণা, একটি এন্‌জাইম"-এর প্রকল্প।

এর থেকে অন্যান্য রহস্যও পরিষ্কার হয়ে গেল। যেমন ওই লাল ছাতার আমাদের মতই 'বি১' ( $B_1$ ) ভিটামিনের দরকার। কিন্তু সরল যৌগিক পদার্থ থেকে তারা 'বি১' ভিটামিন তৈরি করতে পারে, যা আমরা পারি না। বিড্‌ল ও ট্যাটাম এমন একটা রূপান্তরিত বা পরিব্যক্ত জৈবিক পদার্থ উৎপন্ন করলেন যা নিজের প্রয়োজন মত 'বি১' ভিটামিন তৈরি করতে পারে না। কৃত্রিম উপায়ে ওই জৈব আধারে তাঁরা 'বি১' ভিটামিন যোগ করলেন। এই ভিটামিন তৈরি জিনিস কারণ ভিটামিনের সংজ্ঞা হল এমন জিনিস যা জীবদেহ উৎপন্ন করতে পারে না কিন্তু জীবদেহের যে জিনিসের প্রয়োজন

আছে। এটা যুক্তিযুক্ত অনুমান যে এক সময়ে আমাদের পূর্বপুরুষের শরীরে 'বি১' ভিটামিন তৈরির শক্তি ছিল কিন্তু কোন সময়ে পরিব্যক্তির ফলে সে ওই শক্তি হারিয়ে ফেলে। লাল রুটির ছাতা বা অন্য কোন জীব-সত্তা যদি তখন আমাদের সে অভাব পূরণ না করতে পারত, তবে তখনই আমরা এ পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতাম।

এবার প্রশ্ন ওঠে জীব-কণা ও এনজাইমের সম্বন্ধেব প্রকৃতি নিয়ে। জীব-কণাকে একটা মৌলিক নক্সার সঙ্গে তুলনা করলে অন্যায় হবে না। বিশেষ বিশেষ এন্‌জাইমের সৃষ্টির জন্য ওই জীব-কণার দিকটাই ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। একটি বিশেষ জীব-কণা থেকে একটি এনজাইম তৈরি হলে তাব মধ্যে যে বিশেষত্ব দেখা যায়, তাতে মনে হয় কাগজের সঙ্গে ছাপার সম্বন্ধের মত জীব-কণার সঙ্গে এন্‌জাইমের সম্পর্কটা দৈহিক। অতএব জীব-কণাকে একটা জটিল ছাঁচ হিসাবে দেখতে পারি যার বিশেষ ছাপ এন্‌জাইমের মধ্যে ফুটে ওঠে। জীব-কণার ক্ষতি হলে তাব এনজাইম নষ্ট হয়ে যায়।

এর থেকে আর একটি তথ্যেব খবর পাই। জীব-কণাব রাসায়নিক গঠন কেমন? আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে তার ক্রোমোসোম কি দিয়ে তৈরি? জীব-কণাব ধাবণাটা অনুমান-নির্ভর। কিন্তু ক্রোমোসোমগুলিকে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায়। আমবা ধরে নিই ওই ক্রোমোসোমেব মধ্যে জীব-কণা রয়েছে। আমরা বহুদিন থেকে জানি যে জীবকোষেব কেন্দ্র থেকে একটা বিশেষ পদার্থ আমরা বার করতে পারি। এই পদার্থ অম্ল বলে এর নাম দেওয়া হয়েছে নিউক্লিক য়্যাসিড। এর মধ্যে যেটা নাভিগত বা কেন্দ্রগত তার নাম Desoxyribonucleic য়্যাসিড, ছোট করে DNA, আর যেগুলি কেন্দ্রবহির্ভূত তাদের নাম Ribonueleic য়্যাসিড বা RNA।

নিউক্লিক য়্যাসিডের অণুগুলি অদ্ভুত রকম লম্বা শেকলের মত দেখতে। ওই শেকলের সন্ধিগুলিব মধ্যে অসংখ্য Nucleotides আছে। Nucleotides একটি নয়, চারটি বিভিন্ন ও জটিল যৌগিক পদার্থ ও তাদের বিভিন্নতা নির্ভর করে তাদের সঙ্গে যুক্ত নাইট্রোজেন-মিশ্রিত বাস্তব (base) পার্থক্যের উপব। সুবিধার জন্য এই চারটি Nucleotidesকে ১, ২, ৩, ৪—এই চারটি সংখ্যা দিয়ে বোঝাব। অতএব, রাসায়নিক ভাষায় DNA এর গঠন একটা লম্বা শেকলের মত যাতে চারটি মূল সংখ্যা ফিরে ফিরে দেখা দেয়।

···১—২—৩—৪—১—২—৩—৪···

অথবা···৩—২—১—৪···

সংখ্যাগুলি কি পারম্পর্যে, কি ধারায় আসে জানা যায় নি। নিউক্লিক য়্যাসিডের পর্যবেক্ষণ এইখানে শেষ করে, জৈব রাসায়নিকেরা তার আর কোন ব্যবহার খুঁজে পান নি। অদ্ভুত চটচটে ওই সাদা পাউডারটিকে তাকে তুলে রেখে দিয়েছিলেন।

কিন্তু সময়ে সময়ে অন্যান্য পরীক্ষণের ক্ষেত্রে নিউক্লিক য়্যাসিডের অভাবনীয় আবির্ভাব ঘটেছে। দেখা গেছে ভাইরাস ( Virus ) বা সংক্রামক রোগ-বীজ আর কিছুই নয় প্রোটিনের আবরণে ঢাকা কতকগুলি নিউক্লিক য়্যাসিডের কণা। যখন ওই রোগের বীজ সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য বীজকোষে ঢোকে তখন তার প্রোটিনের আবরণটা বাইরে পড়ে থাকে। এর থেকে বোঝা যায় যে বীজকোষের মধ্যে শুধু নিউক্লিক য়্যাসিডের সাহায্যেই নূতন ও পূর্ণাবয়ব সংক্রামক রোগের বীজ ( ভাইরাস ) তৈরি হয়। অতএব ভাইরাস সৃষ্টির জন্য যে প্রতিকৃতি বা ছক দরকার তা নিউক্লিক য়্যাসিডের মধ্যেই আছে বলে মনে হয়। দেখা যাচ্ছে বীজকোষে ভাইরাস কখন, কি ভাবে সৃষ্টি হবে, তা নির্ভর করছে নিউক্লিক য়্যাসিডের উপর। অতএব ওই নিউক্লিক য়্যাসিডের মধ্যেই ভাইরাসের বংশানুক্রমের খবর পাওয়া উচিত যার থেকে বোঝা যাবে নূতন রোগবীজ তাদের জনক-জননীর প্রতিকৃতি পাবে কিনা।

ইতিমধ্যে আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করা গেল। একই শ্রেণীর ব্যাক্‌টেরিয়ার দুটি শাখা পরীক্ষার জন্য তৈরি করা হল। তাদের মধ্যে পার্থক্য হল এই যে একটিতে “ব” গুণ আছে, অন্যটিতে তা নেই। ( সাঙ্কেতিক “ব” চিহ্ন দিয়ে এখানে বংশ পরম্পরাগত যে কোনও একটি গুণ বোঝান হচ্ছে, যেমন, পেনিসিলিন-প্রতিবন্ধকতা। বর্তমান আলোচনায় ব-ব্যাক্‌টেরিয়া পেনিসিলিনে সাড়া দেয় না, অন্যটি সাড়া দেয়। ) পরিশুদ্ধ ব-ব্যাকটেরিয়া তৈরি করে ব-হীন-ব্যাক্‌টেরিয়ায় যোগ করা হল। অতি বিস্ময়কর ফল দেখা গেল। পরীক্ষিত ব-হীন ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে ব-ব্যাকটেরিয়ার অনেক উপনিবেশ গড়ে উঠল। শুধু তাই নয়, এই নূতন ব-ব্যাকটেরিয়ার গুণগুলি বংশ পরম্পরায় ফুটে উঠতে দেখা গেল। এই ঘটনার নাম দেওয়া হল ‘রূপান্তর’, ও যে সামগ্রীর জন্য রূপান্তর ঘটল, তাকে বলা হল রূপান্তরকারী, **transforming principle** বা শুধু TP। পরীক্ষা করে আরও বোঝা গেল যে DNA এই TP। আবার DNA এই প্রজননের খবর এনে দিল।

এইসব তথ্য আবিষ্কারের পরে প্রশ্নের ঝড় উঠল। DNAএর যে

উপাদান তা দিয়ে কি জীব কণার উপাদানের ব্যাখ্যা করা যাবে ? ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর DNA nucleotides-এর মধ্যে কোন রাসায়নিক প্রভেদ দেখা যায় না, তা সত্ত্বেও তার থেকে প্রজনন সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য কি করে পাওয়া যায় ? জীবকোষে নূতন DNA তৈরি হলে, জন্ম-বৃত্তান্ত তাতে কি করে ব্যাঘাত হয় ? যে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তোলা সম্ভব হয়নি তা হল এই নাটকীয় সত্য যে অবশেষে জীববিদ্যা, রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞানের একটা মিলন-কেন্দ্র খুঁজে পাওয়া গেছে। এইখানে এসে তাদের সীমারেখা নিশ্চিহ্ন হয়েছে। কারণ DNA একটি যৌগিক রসায়নিক পদার্থ যার ভৌতিক অঙ্কে জীববিদ্যাগত তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে।

এখন বিজ্ঞানের যেটা সবচেয়ে বড় রহস্য তার উদ্‌ঘাটনের জন্য সমবেত চেষ্টার সুযোগ এসেছে। ১৯৫৩ সালে James D. Watson ও F. H. C. Crick জানান রঞ্জন-রশ্মির বিচ্ছুরণে ( diffraction ) বা অপবর্তনে DNAএর পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে DNA nucleotides দিয়ে গাঁথা সুতার মত জিনিস মোটেই নয়, তার গঠন স্ক্রুর প্যাচের মত জটিল ও সুসম্বন্ধ। এই আবিষ্কারের সবচেয়ে বিস্ময়কর বিষয় হল এই যে DNAএর প্যাঁচান গঠনে nucleotides-এর একটা নয়, দুটো সমান্তরাল সুতা আছে। একটির গঠন অপরটির গঠন নির্ণয় করে। এর কারণ ওই সীমাবদ্ধ জায়গায় নাইট্রোজেন-ক্ষারের কয়েকটি মাত্র জুটি একজোড়ে থাকতে পারে।

এই বর্ণনা থেকে অনেক কিছু বোঝা যায়। nucleotides-এর দুটো সুতা থাকার অর্থ এখানে নিজে নিজে দ্বিগুণ হবার ব্যবস্থা আছে। সুতা দুটো পৃথক হয়ে যেতে পারে ও এক অন্যের ছাঁচ হিসাবে কাজ করে। কাজেই DNAএর প্রজননে ঠিক একই রকম দুটো nucleotides-এর সুতা পাওয়া যাবে। এই শৃঙ্খলা থেকে বংশগত সংক্রমণের মূল সূত্রটি পাওয়া যায়। এইসব পরীক্ষার ফল দেখে একটা সিদ্ধান্তে অবিলম্বে পৌছতে পারি। DNAএর গঠনে যদি চারটি nucleotides-এর ১০০টি মাত্র জোড় থাকে ( প্রকৃতপক্ষে হাজার হাজার এমন জোড় আছে ) তাহলে লাইন-বাঁধা থাকের সংখ্যা সৌরজগতে যত পরমাণু আছে, তার চেয়ে বেশী হয়ে দাঁড়াবে। এই এত রকম প্রকারভেদ এন্‌জাইমের বিশেষত্বের কারণ বোঝাবার পক্ষে যথেষ্ট। অবশ্য আমরা ধরে নিচ্ছি যে nucleotides য়্যামিনো অম্লের উপাদানগুলিকে সঠিক অনুক্রমে সাজিয়ে নিতে পারে ও সেইভাবে এনজাইমের বিশেষত্ব নির্ণয় করে। Nucleotides-এর অনুক্রম

বিশেষ এন্‌জাইমের অবস্থিতি নিয়ন্ত্রিত করে ও সেই হিসাবে প্রতি পুরুষে কি গুণের প্রকাশ ঘটবে তা নির্ধারিত করে।

অতি আধুনিক তথ্য বলে এন্‌জাইমের সংশ্লেষণে DNA প্রত্যক্ষভাবে কাজ করে না। DNAএর কাজ অনেকটা মনোগ্রাফের রেকর্ড তৈরি করার মত। প্রথমে শিল্পীর গাওয়া গানের একটি মূল রেকর্ড তৈরি হয়। এর থেকে একটি নেগেটিভ তৈরি করে তার থেকে আবার পজিটিভ রেকর্ডের ছাপ তোলা হয়। এখানে মৌলিক সত্তা DNA, যার মূল প্রকৃতি বিবর্তন-নির্ধারিত। RNAএর নেগেটিভ যার থেকে অনুক্রমের ছকটা অন্য আধারে ফুটিয়ে তোলা যায় ও প্রোটিন হল সেই আধার যার উপর বিশিষ্ট ছকের ছাপ ফুটে ওঠে ও এইভাবে যা এন্‌জাইমে পরিণত হয়।

জৈব রাসায়নিক এখন কৃত্রিম উপায়ে nucleotide-এর শেকল তৈরি করতে শিখেছেন ও সেগুলিকে বিশেষ অনুক্রমে সাজাবার চেষ্টা করছেন। বলতে পারি এ হল প্রাণ-সৃষ্টিরই একটা প্রচেষ্টা। কিন্তু তার থেকে আজ পর্যন্ত আমরা কি করেছি বা কি করতে পারিনি তার কোনও ধারণা পাই না। আমরা এ পর্যন্ত বোধগম্য জড় পদার্থ নিয়ে কাজ করেছি ও এক্ষেত্রে 'প্রাণ' ও 'প্রাণী'র ছবিটা স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। আমরা এমন জায়গায় এসে পৌচেছি যেখানে ওসব কথার প্রয়োজন খুঁজে পাওয়া যায় না। এ এমন একটা অস্পষ্ট হেঁয়ালিভরা জগত যেখানে প্রাণের সুরু বা শেষ নিয়ে তর্কের কোন অর্থ নেই। যা ঘটছে তা ঘটছে, বাকিটা হল মানুষের মনের অবস্থা নিয়ে কারবার। জীব ও জড়ের মধ্যে একটা অনতিক্রম্য ও নিশ্চিত ব্যবধানের অভিজ্ঞতা-বহির্ভূত ধারণার যুক্তি একমাত্র অধিবিদ্যায় ( melikhyies ) পাওয়া যায়। যে সাক্ষ্য জড় করা গেছে তার থেকে বরং এই মনে হয় 'জীব' ও 'জড়' শব্দটিকে 'গরম' ও 'ঠাণ্ডা' এই দুটি শব্দের মত ব্যবহার করা যায়। সরল থেকে জটিল চিহ্নের একটা বর্ণালীর উপর তারা বিভিন্ন স্থান অধিকার করে বসে আছে। 'জীব' জটিল, 'জড়' সরল। মধ্যিখানটা জীব ও জড়ের কারও স্থান নয়।

জড়বাদী 'প্রাণ' সৃষ্টি করতে অক্ষম প্রাণবাদীদের এই যে তর্ক তার দুটি জবাব আছে। এক, জ্যোতির্বিদ সৌর মণ্ডল সৃষ্টি করতে পারেন না, বিবর্তনবাদী জাতি তৈরি করতে অক্ষম। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা সৌর মণ্ডল ও বিবর্তনের কথা বাস্তব সাক্ষ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারেন। দ্বিতীয় কথা এখনও সম্ভব হয়নি বলে কখনও সম্ভব নয় এ বলতে পারি না। এমন কোন

তথ্য আবিষ্কার হয়নি যাতে বলা যায় যে 'প্রাণে'র ব্যবস্থা পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন-বিদ্যার মধ্য দিয়ে করা অসম্ভব।

অবশ্য যান্ত্রিক জীববিদ্যা কখনও তার উদ্দেশ্যে পৌছতে পারবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ জাগার অন্যান্য বাস্তব কারণ রয়েছে। এসব কারণের কথা প্রাণবাদী তোলেননি। জীবসত্তার অনুশীলনের দুটি কীর্তি আছে—ব্যবহারিক ও বিশ্লেষণ-নির্ভর। জীব-জগতের তথ্য ব্যাখ্যার জন্য হয়তো এই দুই রীতির একসঙ্গে প্রয়োগ দরকার। এই দুটি উপায় কিন্তু পরস্পর বিরোধী। মাথার ব্যবচ্ছেদ করে বা তার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে দেখার সঙ্গে সঙ্গে, প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ রীতিমত তার ব্যবহারের বিচার করা সহজ কাজ নয়। অথচ কার্যরত মস্তিষ্কের অনুশীলনের এই একটিই রীতি জানা আছে। দুটো রীতির সাহায্যে মনের জগতের একটি কোন তথ্যের ব্যাখ্যা করতে হলে দুই রীতির সমকালীন প্রয়োগ দরকার। তেমনই যদি জীব-কণার পুনর্যোগ শুধু অটুট জীবকোষে ঘটাই সম্ভব হয়, DNA অণুর মধ্যে nucleotideএর শৃঙ্খলা ও ওই পুনর্যোগের কাজ একই সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয়। বিশ্লেষণের জন্য জৈব-গঠনের ব্যবচ্ছেদ দরকার, অন্যদিকে ব্যবহারিক বিশ্লেষণের জন্য অটুট জীব চাই। ক্যানসারের গবেষণায় এই সমস্যা বিশেষভাবে নৈরাশ্যের সৃষ্টি করেছে। এখানে জীব-কোষের মধ্যে যা ঘটছে সেইটাকেই দেহের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির কারণ বলে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করি। কিন্তু মরা জীব-কোষকে নিয়ে টেস্ট-টিউব পরীক্ষায় বৃদ্ধির লক্ষণটাই দেখা যায় না। যদি রঞ্জনরশ্মির বিচ্ছুরণ, ক্ষতিকর রাসায়নিক বা অনেকের বিশ্বাসমত সংক্রামক রোগ-বীজের ( ভাইরাস ) ফলে জীব-কণার পরিব্যক্তির মধ্য দিয়ে ক্যানসার রোগ দেখা দেয়, তবে অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ও DNA এর পরিবর্তনের মধ্যে যোগসূত্র বার করা সহজ হবে না।

তবু সমস্যার সমাধান অসম্ভব নয়। সমাধানের একটি সূত্র পাওয়া যাবে যদি ল্যাবরেটরিতে বিষাক্ত বীজাণুর কেন্দ্রীভূত য়্যাসিড তৈরি করতে পারি। প্রথমে প্রয়োজন মত ওই য়্যাসিডের সংশ্লেষণ করে তার জনন-ব্যবহার লক্ষ্য করতে পারলে সমকালীন পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন হবে না।

"জীবন-রহস্য" বলতে আমরা কি বুঝি জানি না, কিন্তু একদিন সেই রহস্য-উদ্ধারে হয়তো সক্ষম হব। কিন্তু পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়নের মধ্য দিয়েও প্রাণীর ব্যবহারের যথার্থ ব্যাখ্যা সম্ভব। সত্য বলতে কি পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফলের কথা যা বললাম, তাতে মনে হয় সে সম্ভাবনা খুব দূর নয়।

# ধর্মের লুপ্ত আয়তন

## পল টিলিস্

পশ্চিমী সভ্যতার দর্শকমাত্রই জানেন যে সেখানে ধর্মের ক্ষেত্রে একটা কিছু ঘটেছে। আমেরিকার সম্বন্ধে এ কথা বিশেষ করে খাটে। যাকে ধর্মের পুনরুত্থান বলা হয় তার লক্ষণ সেখানে চারিদিকে চোখে পড়ে, অন্তত ধর্মের প্রতি আগ্রহ যে নূতন করে জেগেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। গির্জার সভ্য সংখ্যা বেড়েছে, ছত্রাকের মত অনেক ধর্ম-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মশাস্ত্র বিষয়গুলির ছাত্র-সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। ধর্মের প্রতি আগ্রহের সবচেয়ে বড় প্রমাণ বিলি গ্রাহাম ও নরমান ভিন্‌সেণ্ট পীলের মত লোকের সাফল্য। প্রতি রবিবার তাদের প্রত্যেকটি বক্তৃতা শোনার জন্য লোকে ভিড় করে আসছে। এইসব সত্য অস্বীকার করবার উপায় নেই, কিন্তু এইসব লক্ষণকে কি অর্থে গ্রহণ করব? তথ্যগুলি বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পশ্চিমী মানুষের অবস্থার কথাটাই প্রকাশ করছে বলে আমার বিশ্বাস ও সেই কথাই এখানে বলতে চাই। আরও দেখাতে চাই যে আমাদের যুগে মানুষের ওই অবস্থা সকল কালের ও সকল দেশের মানুষের অবস্থার ইঙ্গিত দেয়।

মানুষ ও সমাজকে নানাভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা হয়েছে এ যুগে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মানুষের গুরুত্বপূর্ণ চারিত্রিক বিশেষত্বের পরিচয় পাওয়া গেছে, কিন্তু আমাদের বর্তমান অবস্থা সমাধানের জন্য কোথাও একটা সাধারণ সূত্র পাওয়া যায় নি। এই সূত্র বার করা সহজ কাজ না হলেও আমি তার চেষ্টা করব ও এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলব। প্রথমে একথাটা একটু অদ্ভুত বলে মনে হতে পারে। আজকের দিনে পশ্চিমী মানুষের অবস্থার যেটা সুনিশ্চিত নিদর্শন তা হ'ল তার মধ্যে গভীরতার পরিব্যাপ্তি বোধের বিলুপ্তি। অবশ্য গভীরতার পরিব্যাপ্তি বোধ বা বেধ-আয়তন বাক্যের অলঙ্কার মাত্র। ব্যক্তিগত কথাটিকে আমরা মানুষের আধ্যাত্ম জীবনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করছি। বেধ-আয়তনের অর্থ কি?

এর অর্থ মানুষ কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর হারিয়ে ফেলেছে। জীবনের অর্থ কি? আমরা কোথা থেকে এসেছি? আমাদের ভবিষ্যতে কি আছে? আমাদের কর্তব্য কি ও জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে নির্দিষ্ট অল্প সময়ে আমরা কি ভাবে নিজেকে গড়ব? এইসব প্রশ্নের কেউ জবাব দেয় না, এমনকি সে বিষয়ে কেউ প্রশ্নও তোলে না। প্রশ্ন ওঠে না আমরা জীবনের গভীরতা বোধটা হারিয়েছি কি না? আজকের মানুষ এই অবস্থায় এসে পৌঁচেছে। আমাদের পূর্বপুরুষ যে অসীম আগ্রহ নিয়ে এইসব প্রশ্ন তুলতেন, সেই আগ্রহ ও প্রশ্ন তোলার ও প্রশ্নের জবাব শোনবার সাহস আজ আমরা হারিয়েছি।

এই যে গভীরতার পরিব্যাপ্তি বোধ তাকেই আমরা মানুষের প্রকৃতিতে ধর্মবোধের আয়তন বলতে পারি। মানুষের ধার্মিকতার পরিমাপ হয় তার এইসব আবেগপূর্ণ প্রশ্ন-জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে। ধর্মপ্রাণ হওয়া মানে আমাদের অস্তিত্বের অর্থ কি সে বিষয়ে প্রশ্ন তোলা ও জবাবটা প্রীতিকর না হলেও তাকে স্বীকার করা। ধর্ম সম্বন্ধে এই ধারণা ধর্মকে সমগ্র ভাবে মানবীয় করে তোলে যদিও এটা ধর্মের প্রচলিত ধারণা নয়। এই ধর্মে এক ঈশ্বর বা বহু দেবতার বিশ্বাসের কথা নেই। এই ধর্ম বলতে ঈশ্বরের সঙ্গে চিন্তায়, আত্মসমর্পণে ও বশ্যতায় নিজেকে যুক্ত করার জন্য কতকগুলি ক্রিয়াকলাপ ও অনুষ্ঠান পালনের কথা বোঝায় না। ইতিহাসে ধর্মের এই রূপটিই দেখা গেছে সত্য কিন্তু ধর্মের অন্তরতম প্রকাশ এই সঙ্কীর্ণ অর্থের চেয়ে বড়। এই নূতন ধর্মে নিজের সম্বন্ধে ও সারা বিশ্বের সম্বন্ধে একটা চিন্তার কথাটাই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে।

অনেকের মধ্যে এই আগ্রহ-বোধের পরিচয় পাওয়া গেছে। এঁরা কিন্তু প্রচলিত সঙ্কীর্ণ অর্থে যে ধর্ম তার থেকে দূরেই থাকেন। প্রায়ই দেখা যায় এমন মানুষ জীবনের অর্থ সন্ধানের প্রশ্নকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেন এবং সেই জন্যই ইতিহাস অন্তর্গত যে ধর্ম তাকে অস্বীকার করেন। তাঁদের মতে এই পার্থিব ধর্মে তাঁদের অন্তরতম সন্ধানের বিষয়টির সঠিক প্রকাশ ঘটে না। তাঁরা ধর্মকে অস্বীকার করেও ধর্মপ্রাণ। এই অনুভূতি আছে বলেই, সঙ্কেতপূর্ণ আনুষ্ঠানিক ধর্মচিন্তা থেকে একটা গভীর স্তরে বাস করার অভিজ্ঞতাকে পৃথক করে দেখার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এখন যদি বর্তমান ধর্ম-পরিস্থিতির বিশ্লেষণে নাবি, কোনও বিশেষ ধর্ম, এমনকি খৃষ্টধর্মের বিচারেও সেই বিশ্লেষণ করলে চলবে না। যাকে আমরা মূল ধর্ম বলছি তাকেই সামনে রেখে

আজকের দিনের ধর্ম-পরিস্থিতির আলোচনা করতে হবে। মানুষের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে এ ধর্ম কি বলে?

যদি ধর্ম বলতে অসীম আত্মচিন্তায় ও বিশ্বচিন্তায় অভিনিবিষ্টতা বুঝি, তবে বলতে হবে আজকের দিনে আমরা সে ভাবনা ও নিবিষ্টতা হারিয়েছি। এই অর্থে ধর্মের পুনরুদ্ধার, যা হারিয়েছি তার পুনর্প্রাপ্তির জন্য বেপরোয়া ও প্রায়ই নিষ্ফল চেষ্টা ছাড়া কিছু নয়।

ওই গভীরতা পরিব্যাপ্তি বোধ, মনের বোধ-আয়তন, কি করে নষ্ট হল? যে কোনও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার মত এরও অনেক কারণ আছে। কিন্তু যে কারণ ধর্মযাজকের বেদী থেকে ও ভগবদ্‌বাক্য প্রচারকের মঞ্চ থেকে বিবৃত করা হয় সেটা এর প্রকৃত কারণ নয়। আধুনিক মানুষের ব্যাপক অশ্রদ্ধা ও অসাধুতা আমাদের গভীরতা বোধ নষ্ট করেনি। অন্যান্য যুগের তুলনায় আজকের মানুষ বেশী সাধুও নয়, বেশী অসাধুও নয়। এই যুগে (যে যুগে বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক কৌশলে প্রকৃতিকে মানুষের আয়ত্তে আনা হচ্ছে) মানুষের সঙ্গে তার বিশ্বের ও তার নিজেব যে সম্বন্ধ গডে উঠেছে তারই ফলে তার বেধ-আয়তন বোধ বিলুপ্ত হয়েছে। এ যুগে জীবন গভীরের আয়তন হারিয়ে একটা horizontal ব্যাপ্তি লাভ করেছে। যে শিল্পপ্রধান সমাজের আমরা অঙ্গ তার চালনা-শক্তি আনুভূমিক রেখায় (horizontal) কাজ করে, লম্ব-রেখায় জীবনের গভীরে পৌছতে পারে না। "আরও ভাল", "আরও বড়", "আরও বেশী", এইসব প্রচলিত ভাষার মাধ্যমেই ওই শক্তির প্রকাশ ঘটে। এইসব ভাষা ব্যবহারের পেছনে যে মনোভাব রয়েছে তার নিন্দা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। যে জগতে বাস করি তাকে জানব এবং তার মধ্যে অশেষ পরিবর্তন আনতে পারব, এই যে বোধ অন্যায় নয়। আমাদের গতি সীমাহীন ভাবে চতুর্দিকে প্রসারিত হতে পারে।

আনুভূমিক প্রসার প্রবৃত্তির একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন হচ্ছে—জাগতিক মাধ্যাকর্ষণের ক্ষেত্রকে ছাড়িয়ে বিশ্ব-মহাকাশে প্রবেশের চেষ্টা। মজার কথা এই বিশ্ব-মহাকাশকে শুধু মহাকাশ বলি, আর, মহাকাশ ভ্রমণের কথা ওঠে। কিন্তু সব ভ্রমণই কি দেশ-কালে ভ্রমণ নয়? হয়তো এ কথা মনে হতে পারে, সীমাহীন মহাকাশে প্রবেশ না করলে ব্যাপ্তির সত্য প্রকৃতিটা বোঝা যায় না। যাই হোক জাগতিক দেশের বাইরে মহাশূন্যের আবিষ্কার মানুষের বেধ-আয়তন বোধের জায়গায় আনুভূমিক প্রসার বোধকে আরও যে বাড়িয়ে তুলেছে তাতে সন্দেহ নেই।

সে বস্তুর জগতে আর একটি বস্তু হয়ে ওঠে। সে নিয়ন্ত্রিত উৎপাদন ও ব্যবহার পদ্ধতির একটি অঙ্গ হয়ে পড়ে। একথা আজ কারও অজানা নয়। আমাদের এই সামাজিক কাঠামোয় কে কতখানি ও কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছেন, তা নিয়ন্ত্রণ কারীরাও বোঝেন। কিশোরের দুর্বৃত্ত দলের প্রভাব, কর্মকর্তাদের উপর যৌথসংস্থার দাবি, গণ-সংযোগ, প্রচার ও বিজ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে সকলকে নির্দিষ্ট পথে চালনা করার কথা নানা বইএ ও প্রবন্ধে লেখা হয়েছে।

এই সবের চাপে মানুষ তার তৈরি জিনিসের মতই একটা বস্তুতে পরিণত হচ্ছে। স্বাধীন ও দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তির বদলে সে কতকগুলি নিয়োজিত প্রতিক্রিয়ার আধার হয়ে পড়েছে। মানুষ তার নিজের ব্যবহারের জন্য বস্তু উৎপাদনের যে বিরাট যন্ত্র তৈরি করেছে, সেই যান্ত্রিকতার চাপেই সে নিজে বস্তুতে পরিণত হচ্ছে।

কিন্তু মানুষ তার মনুষ্যত্ব সম্পূর্ণ হারায় নি। সে তার ভাগ্যকে ঠেকিয়ে রাখতে ব্যগ্র। ভাগ্যের সঙ্গে অবিরত যুদ্ধে সে যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিয়েছে। সে প্রশ্ন করে, এসবের কি প্রয়োজন?

অগ্রগতির মধ্যে সে শূন্যতা, অর্থহীনতা দেখতে পায়। যে উদ্দেশ্যে সে উপায় উদ্ভাবন করে সেই উদ্দেশ্যই পদ্ধতিরূপে দেখা দেয়, শেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধি কোন দিনই হয় না। ঠিক কি হয়েছে বুঝতে না পেরেও, সে জীবনের অর্থহীনতা, অগভীরতা উপলব্ধি করতে পারে।

এই উপলব্ধির জন্যই ধর্মের প্রশ্নটা ওঠে ও সেই উপলব্ধি অনুযায়ী সেই প্রশ্নের উত্তরকে আমরা মানি বা অস্বীকার করি। অতএব ধর্মের প্রতি সমকালীন মনোভাবের বর্ণনা দিতে হলে, আমাদের সেই সব বিষয়ের উপর দৃষ্টি ফেলতে হবে যে বিষয় সম্বন্ধে আজকের পশ্চিমী মানুষের মনোভাব খুব তীব্র ও স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পেয়েছে—যে ক্ষেত্রে তাদের সঙ্কট তারা বিশেষভাবে উপলব্ধি করছে।

এই বিষয়গুলি হল শিল্প-সাহিত্য ও কিছুটা আধুনিক দর্শন-শাস্ত্র। বোধ-আয়তন বোধ হারিয়ে মানুষ আজ জীবনের অর্থ নিয়ে যে আবেগপূর্ণ ও প্রায়ই হতাশাপূর্ণ যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে তারই ছবি সাহিত্য ও দর্শনের বিষয়-বস্তু ও প্রকাশ ভঙ্গির মধ্যে ফুটে উঠছে। সঙ্কীর্ণ অর্থে দর্শন সাহিত্য ধর্ম-শাস্ত্রের অন্তর্গত নয়। কিন্তু আজকের ধর্মতত্ত্বের প্রশ্নগুলির চেয়ে সাহিত্যে যে প্রশ্ন উঠেছে তা ধর্মের দিক থেকেই বেশী গূঢ় ও বৈপ্লবিক।

ঔপন্যাসিক নানা মানুষের ছবি আঁকেন। একজন জীবনের এমন একটা

অবস্থায় পৌছতে চায়, যেখানে পৌছলে তার সব সমস্যার সমাধান হবে, কিন্তু তার সে চেষ্টা সফল হচ্ছে না ; আর এক মনের জীবন একটা অপরাধ-বোধের চাপে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে ; আর এক লোক যার চরিত্রের কোনও ভিত্তি নেই, যে তার ভাগ্য দ্বারা চালিত হয়ে বিনা বাধায় মৃত্যু বরণ করছে ; কিম্বা এমন চরিত্র যার অভিজ্ঞতা তার মনে শুধু গভীর অসন্তোষের সৃষ্টি করছে। এই প্রত্যেক ছবির মধ্যে একটা ধর্মতত্ত্বগত প্রশ্ন রয়েছে।

কবি যখন অন্তরের আসুরিক বৃত্তিগুলির ভয়ঙ্কর রূপ ও আকর্ষণের বর্ণনা করেন, যখন আমাদের আত্মার রিক্ত ও মরুভূমিসম স্থানগুলি দেখান, যখন জীবনের তলায় যে কাদা জমা রয়েছে তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, কিম্বা সংসারের অনিত্যতা ও আমাদের অহরহ উদ্বিগ্নতা নিয়ে যখন গান রচনা করেন, তখন তিনি ধর্মের প্রশ্নই তোলেন।

ধর্মের প্রশ্নই ওঠে যখন নাট্যকার হাস্যকর প্রতীক সৃষ্টি করে তার মধ্য দিয়ে জীবনের মিথ্যা-মরীচিকার ছবিটা চোখের সামনে উপস্থিত করেন, যখন আত্মঘাতের মধ্যে রিক্ত জীবনের পরিণতির ছবি আঁকেন, যখন জীবনে পরস্পরের প্রতি ঘৃণা ও অপরাধবোধের যে পরিত্রাণহীন বাঁধন তা নিয়ে নাটক সৃষ্টি করেন, কিম্বা যখন তিনি আমাদের নিষ্ফল আশার অন্ধকার গহ্বরে নিয়ে গিয়ে ব্যক্তিত্বের ক্রমশ বিযুক্ততার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন।

চিত্রকর যখন দৃশ্য জগতকে টুকরো টুকরো করে, সেই টুকরো দিয়েই বিরাট ছবি আঁকেন, তখন সেই ছবির সঙ্গে আমাদের দেখা জগতের না মিললেও, তার মধ্য দিয়ে বাস্তবের সম্মুখীন হওয়ার জন্য আমাদের ব্যগ্রতা ও সাহসের প্রকাশ ঘটে। এরও মধ্যে ধর্মেরই প্রশ্ন রয়েছে।

স্থাপত্য শিল্পী যখন আধুনিক অফিস বাড়ি বা গির্জা তৈরি করার সময় পুরাতন শৈলীগত অলঙ্কার বাদ দেন তখনও তিনি ধর্মের প্রশ্ন তোলেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করেন ওই পুরাণ শৈলীর মধ্য দিয়ে আধুনিক জগতের সত্য রূপটি প্রকাশ পায় না। তাঁর শিল্পে পুরাতন ঐশ্বর্যের অনুকরণ নেই, প্রতারণা নেই, অভিপ্রায়-সিদ্ধিগত ওই ঐশ্বর্যহীন স্থাপত্যই তিনি চান। শেষ উত্তর তিনি দিতে পারেন না, কিন্তু অকপট উত্তর দিতে পারেন।

আধুনিক দর্শন-শাস্ত্রেও এমনই গুপ্ত ধর্ম-অনুগত চিন্তার পরিচয় আছে। এর দুটি প্রধান ধারা। একটি বিশ্লেষণাত্মক ও অপরটি সত্তাবাচক ( existentialist )। প্রথমটি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পিছনে যে যুক্তি ও

বাচনিক থাকে তার বিশ্লেষণ করে। এর সঙ্গে তুলনা হয় সেই সব শিল্পের যেখানে বস্তুর চিত্র জ্যামিতিক বিভিন্নরূপে প্রকাশ পায় অথবা সেই সব স্থাপত্যে যেখানে বাড়ির কাঠামোটা ঐশ্বর্যের আবরণে ঢেকে না রেখে নগ্নভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়। এই আত্ম-সংযম বিশ্লেষণাত্মক দর্শনের আশ্রমিক দৈন্য ও গাম্ভীর্য ফুটিয়ে তোলে। এর মধ্যে ধার্মিকতা আছে, কিন্তু ধর্মের রীতি-পদ্ধতির সঙ্গে এর সম্বন্ধ নেই। বিদ্বানের বিনয়ের মধ্যে এই ধার্মিকতার প্রকাশ।

সত্তাবাচক দর্শনে কিন্তু মানুষের অস্তিত্বের অনেক সমস্যার কথা আছে। লেখক, কবি, চিত্রকর ও স্থাপত্য-শিল্পী তাদের নিজেদের উপকরণের মধ্য দিয়ে যা প্রকাশ করেন সত্তাবাচক দর্শনে সেইটাই যুক্তির সাহায্যে ব্যক্ত করার চেষ্টা হয়। এই দর্শন দেশে-কালে মানুষের যে সঙ্কট, তার উদ্বেগ ও অপরাধবোধ, তার অর্থহীনতার অনুভূতি, এই সবের প্রকাশ করে।. সতের শতকে পাসকাল (Pascal) থেকে সুরু করে বর্তমানযুগে Heidegger ও Sartre পর্যন্ত প্রত্যেক দার্শনিক মানুষের মর্যাদা ও দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে যে বিরোধ তা স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন। এই দেখানর মধ্যেও ধর্মের প্রশ্ন রয়েছে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এ প্রশ্নের জবাব দেবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু উত্তর দিতে গিয়ে তাঁরা অতীতের ঐতিহ্যের দিকে ফিরেছেন, এবং এমন কথা বলেছেন যা এযুগে অচল। এ যুগের প্রশ্নের জবাব কি আর এক যুগ দিতে পাবে ?

বর্তমানে কেউ কেউ সমস্যা সমাধানের পথ দেখাতে চেয়েছেন, কিন্তু তাদের সে চাওয়া বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিকূল হয় নি ; প্রশ্নটাও সেই কারণে রয়েই গেছে। আমি বিলি গ্রাহাম ও নর্মান ভিন্‌সেণ্ট পীলের কথা বলছি যাঁরা একালের ধর্মের পুনরুদ্ধারের যাজক। বিলি গ্রাহাম সম্বন্ধে বলা চলে যে তাঁর ব্যক্তিগত সততা সত্ত্বেও, তাঁর প্রচার-পদ্ধতি ও আদিম বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ মতবাদ আজকের দিনের সমস্যা সমাধানের পক্ষে নেহাতই অযোগ্য। ঐকান্তিক চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি আমাদের মূল প্রশ্নগুলির গুরুত্বটা ধরতে পারেন নি।

নর্মান পীলের জনপ্রিয়তার মূল কারণ তাঁর বক্তব্যের মধ্যে বর্তমান যে অবস্থাকে তিনি কাটিয়ে উঠতে চান তারই স্বীকৃতি আছে। মানুষকে তিনি রোগমুক্ত করেন যাতে তারা আমাদের এই প্রতিযোগিতার দ্বন্দ্বে ভরা ও নিয়মিত সমাজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারে। যে সমাজের মধ্যে গভীরতাবোধ লুপ্ত হয়ে গেছে, সেই সমাজের সঙ্গেই মানুষ যাতে মানিয়ে

চলতে পারে তার শিক্ষা তিনি দিয়ে থাকেন। অতএব তাঁর উপদেশগুলি বর্তমান অবস্থাতেই খাটে। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন ওই অবস্থাকে নিয়ে যে সম্বন্ধে নর্মান পীল কিছু বলেন নি।

অনেকক্ষেত্রে গির্জার সভ্য সংখ্যার বৃদ্ধি ও ধর্মের প্রতি আগ্রহের অর্থ এই যে মানুষ তার অবস্থাকে ধর্মের একটা আবরণের মধ্য দিয়ে মেনে নিচ্ছে। মানুষ সমাজের অনুমোদিত কাজ করতে চায় কারণ তার মধ্য দিয়ে দেশের ভিতরে ও বাইরে সে নিজেকে নিরাপদ মনে করে। এই সমাজ-স্বীকৃতি খারাপ না, কিন্তু এর মধ্য দিয়ে আজকের যে সমস্যা তার সমাধান হবে না।

কোন সমাধান কি আছে? প্রশ্নের জবাব কি পাওয়া যাবে? জবাব অবশ্যই আছে, কিন্তু আমরা তার হদিস নাও পেতে পারি। যে অবস্থা-সঙ্কটের জন্য ওই প্রশ্ন উঠেছে, সেই অবস্থার মধ্যে আমরা এত বেশী লিপ্ত যে প্রশ্নের জবাব পাওয়া আমাদের পক্ষে কঠিন। লোক ঠকান উত্তর দিয়ে সমাধানের পথটা একেবারে বন্ধ করার চেয়ে আমাদের এই অক্ষম অবস্থাকে স্বীকার করা ভাল। হয়ত এই স্বীকৃতির প্রকৃত উত্তর পেতে আমাদের সাহায্য করবে। গভীরতা বোধ কি করে ফিরিয়ে আনা যায় তার প্রকৃত উত্তর গির্জার সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি বা বর্ধিত হারে মানুষের ধর্ম দীক্ষার মধ্যে নেই। বরং আমরা যদি গভীরতার অভাবটা সম্যক উপলব্ধি করতে পারি, এবং বুঝতে পারি যে ওই অভাব পূরণ করা সহজ নয়, তা হলে উভয়ের কাছাকাছি পৌছতে পারি। ওই অভাব বোধটাও মনের একটা অবস্থা যার মধ্য দিয়ে বেধ-আয়তন বোধ জেগে উঠতে পারে। আমরা আমাদের জীবন-বেদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি এই উপলব্ধিই সেই জীবন-বেদের সঙ্গে আমাদের পুনর্মিলন ঘটায়। এইটাই এখনকার অবস্থা। বর্তমান অবস্থা-সঙ্কট সম্বন্ধে সচেতনতাটাই আমাদের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। ধর্ম বিশ্বাস ও ধর্ম-নির্লিপ্ত চিন্তার মধ্য দিয়ে সেই অবস্থা-সঙ্কটকে না বোঝায় কোন ফল হবে না। ধর্মের পুনরুত্থানের জন্য যে আন্দোলন তাকে যদি লুপ্ত বেধ-আয়তন চেতনা ফিরিয়ে আনার আন্দোলনে পরিণত করতে পারি তবেই তা আমাদের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কিছু সৃষ্টি করতে পারবে।

এর অর্থ এই নয় যে আমরা আমাদের চিরন্তন ধর্মগুলিকে অস্বীকার করব। পুঁথিগত অর্থ তাদের বিকৃত করেছে সত্য, এবং সেইজন্যই ধর্মের আজ বহু সমালোচক, তবু তাদের প্রকৃত অর্থ নষ্ট হয় নি। এদিকে ধর্মের তাৎপর্য

হল শক্তি-সম্পন্ন, প্রকাশময় ও অমঙ্গল-প্রতিরোধী প্রতীকের মধ্য দিয়ে মানুষের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে প্রশ্ন তার উত্তর দেওয়া। ধর্মের পুনরাবির্ভাব যদি বর্তমান পরিস্থিতিতে ওই প্রতীকগুলি একটা নূতন অর্থবোধ জাগাতে পারে, তবে তা অনেকগুলি বিচ্ছিন্ন, উদ্বিগ্ন ও আশাহীন জীবনকে রক্ষা করতে পারবে, আমাদের সংস্কৃতিকে জাগিয়ে তুলতে পারবে। ধর্ম-বিশ্বাস-গত উত্তরের আগে এই একটি কথা যোগ করতে হয়, "তা সত্ত্বেও"। গভীরতা-বোধ লুপ্ত হওয়া সত্ত্বেও ধর্ম-বিশ্বাসের কাজ আছে ও এই কাজের ফল সবচেয়ে বেশী দেখা যায় তাদের মধ্যে যারা ওই অভাব সম্বন্ধে সচেতন, যারা গভীরতা-বোধ ফিরে পেতে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট।

# জড়ের রহস্য

## জে. রবার্ট ওপেনহেমার

সমসাময়িক বিজ্ঞানের যে সক্রিয় অথচ ক্ষুদ্র অংশ নিয়ে আমি লিখতে বসেছি এতে আমাকে ঝামেলা পোহাতে হবে জানি; অনেকে ভুল-বুঝবেন আমাকে, তাছাড়া বিবেক-বিচারের কথা তো আছেই। যাঁদের জন্য লিখছি তাঁদের বিজ্ঞানে আগ্রহ থাকলেও সে বিষয়ে তাঁদের হয়তো শিক্ষা নেই, বিজ্ঞান তাঁদের বৃত্তিও নয়। যেসব বাক্য ব্যবহার করব তা এই পাঠকের মনে হয়তো ভুল ধারণার সৃষ্টি করবে, অন্তত আমার কথাগুলির সম্পূর্ণ অর্থটা তাঁরা বোধ হয় গ্রহণ করতে পারবেন না।

এটাই স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী। ইলেকট্রন, মেশন, সংঘর্ষ ও তেজস্ক্রিয়তার প্রক্রিয়া ইত্যাদির আলোচনা করতে হবে। এই প্রত্যেকটি শব্দের পেছনে বিরাট পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যন্ত্রপাতি, ভুল-ভ্রান্তি, বিশ্লেষণ, কল্পনা ও পরিশ্রমের ইতিহাস আছে। দৈনন্দিন জীবনে যা কিছু দেখি তার কোন কিছুর সঙ্গে ওই শব্দগুলির মিল নেই। আমাদের এমন সব যুক্তির কথা তুলতে হবে যার জটিলতা ও প্রয়োগ-সম্ভাবনাটা বুঝতে হলে গণিতের ব্যবহার অবশ্যম্ভাবী, তাও এমন গণিত যা আজকের সাধারণভাবে সুশিক্ষিত লোকের অজ্ঞাত। ইতস্ততভাবে আমি কয়েকটি শব্দ বা সংকেতের ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করছি। কিন্তু এর জন্যও গতকালের বিজ্ঞানের পরিচয় ও জ্ঞানের উপর আমাকে নির্ভর করতে হয়েছে, যে জ্ঞান তখনই সাধারণের সহজলভ্য ছিল না ও আজ যা পরীক্ষাগারের বিশেষ অভিজ্ঞতা, গণিতশাস্ত্রের বিমূর্ত যুক্তি-তর্ক ও এই দুইএর পরস্পর প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার ফলে সাধারণের আয়ত্তের বাইরে।

এর আর একটা দিক আছে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আবিষ্কার নূতন তত্ত্বের সন্ধান দেয় ও ওই তত্ত্ব থেকে আমরা প্রয়োগ কৌশল শিখি। আমাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানের যেমন ক্রমশ পরিবর্তন ঘটেছে তেমনই আমাদের প্রতিদিনের জগতের আকার বদলেছে। কিন্তু এই পরিবর্তন বাস্তব জগতে ঘটেছে বলে ও তার মধ্য দিয়ে আমাদের প্রয়োজন মেটে বলে, সাধারণ লোকের কাছে এর ব্যাখ্যা সম্ভব।

পদার্থ বিজ্ঞানের উল্লেখ না করেও আমরা আণবিক শক্তির প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারি! এই শক্তির ফলাফলটা বর্ণনা করা কিন্তু কঠিন কারণ সেখানে ভবিষ্যতে যা ঘটবে তার কথা আসে: আমাদের নির্বাচন, সিদ্ধান্ত ও সঙ্কল্পের কথা আসে, আমাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জটিল প্রতিষ্ঠানগুলির কথা আসে। রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞানের উল্লেখ না করেও অস্ত্র-শস্ত্রের বিবরণ দেওয়া যায়। কিন্তু একই কারণে অস্ত্র-শস্ত্রের পরিণামের বর্ণনা দেওয়াটা সহজ নয়।

বৈজ্ঞানিক জগত সম্বন্ধে নূতন তথ্য আবিষ্কার করতে চান। কিন্তু মানুষের অন্যান্য কাজের সঙ্গে তার কয়েকটি কাজের চারিত্রিক মিল আছে। বিজ্ঞানের জ্ঞান বহুদিন ধরে জমা হয়েছে। বর্তমান অতীতের উপর ও ভবিষ্যৎ বর্তমানের উপর দাঁড়িয়ে আছে। বিজ্ঞানের ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে তার ভুলভ্রান্তি, বিস্ময়, আবিষ্কার ও বিচার শক্তির উপর। মানুষের সভ্য জীবন ও পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদানের ধারাটিকে বুঝতে হলে যেমন তার ঐতিহ্যকে জানতে হয় তেমনই জীববিদ্যা, জ্যোতিষ ও পদার্থ বিজ্ঞানের আংশিক ধারণা তাদের বিশিষ্ট ও পৃথক ঐতিহ্য-জ্ঞানের উপর নিভর করে। শিক্ষার সময় ও সারাজীবন ধরে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঐতিহ্যগুলির অভিজ্ঞতা অর্জন করা আমাদের দরকার। এর সাহায্যে আমরা পরস্পরকে কতটা বুঝতে পারব বা পারব না তার জ্ঞান হয়। এ কাজ সহজ নয় কিন্তু স্বাধীন সভ্যতার ভবিষ্যৎ ও আমাদের সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা ও সংহতির জন্য এর প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয়।

সমসাময়িক বিজ্ঞানের যে পর্যায়ের কথা বলেছি তা এখন বড় বড় গতিবর্ধক ( accelerator )—যাকে বলা হয় পরমাণু বিভাজন যন্ত্র এবং যা এখন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট, রাশিয়া ও পশ্চিমী ইউরোপে তৈরি হচ্ছে—তাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠছে। ওই গতিবর্ধকগুলি পদার্থ বিজ্ঞানের একটি দিক, পদার্থকণাগত বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বাড়াবে। জড়বস্তু কি দিয়ে তৈরি এখানে এই মূল প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা হচ্ছে।

পদার্থ বিজ্ঞানবিদের কাছে আজ পদার্থ বিজ্ঞানের এই বিশেষ দিকটির আলোচনা একটা রেওয়াজ হয়ে উঠেছে। এর অন্ততপক্ষে তিনটি কারণের উল্লেখ করা যায়। বিজ্ঞানের এই বিশেষ ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিকদের অত্যন্ত কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, তেমনই এক্ষেত্রে নূতনত্ব আছে ও সেই হিসাবে অভিযানের আনন্দ আছে। তাছাড়া, একথা বোঝা যাচ্ছে যে যদি এই

বিশেষ ক্ষেত্রের সমস্যাগুলির সমাধান সম্ভব হয় তবে প্রকৃতিগত সাম্য ও শৃঙ্খলা সম্বন্ধে আমাদের নূতন প্রত্যয় জন্মাবে।

জড় পরমাণুর সমষ্টি এ ধারণা বহুদিন ধরে চলে আসছে। অনুসন্ধিৎসু মানুষ পরমাণু আবিষ্কার হবার বহু আগে থেকেই সে নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করেছেন। উনিশ শতকের আগে পর্যন্ত এ বিষয়ে গবেষণার বিশেষ অগ্রগতি ঘটেনি। উনিশ শতকে যে অগ্রগতি ঘটল তারও একটি কারণ এক মূল পদার্থ ( element ) অন্য মূল পদার্থের সঙ্গে কি অনুপাতে যুক্ত হয় তার রাসায়নিক নিয়মের আবিষ্কার। এছাড়া অণু-পরমাণুর গঠন ও গতি-প্রকৃতি অনুসারে রাশিকৃত বস্তুর আচরণের গবেষণাও ওই অগ্রগতির আর এক কারণ। তবু বিশ শতকের গোড়ায় কয়েকজন বিখ্যাত পদার্থবিদ পরমাণু প্রকল্পের সভ্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে ওঠেন।

এই সন্দেহ পরে সম্পূর্ণ দূর হল। পরমাণুর আচরণের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য আমরা পেলাম। নূতন পদ্ধতিতে পরীক্ষণ করাব কৌশল আবিষ্কার করে একটি মাত্র পরমাণুর আচরণের ফলে যে সব ঘটনা ঘটে তা দেখে আমরা নূতন ভাবে পরমাণু তত্ত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলাম। এই নূতন পদ্ধতি মতে দেখা গেল যে পরমাণুগুলি গ্রীক্ অর্থে পরমাণু মোটেই নয়। অর্থাৎ পরমাণুব বিভাগ ও পরিবর্তন সম্ভব নয় এ ধারণা ভুল। আমাদের সব বিশ্বাসকে অপ্রমাণ করে পরমাণুগুলি দেখা গেল বিভক্ত হচ্ছে ও তার আকৃতিতে গভীর স্বতঃপ্রবৃত্ত পরিবর্তন ঘটছে। একটি পরমাণুর বিভাজনের অর্থ একটি ইলেক্‌ট্রনের অপসারণ। ইলেকট্রন অত্যন্ত হাল্‌কা পদার্থ-কণা যা ঋণাত্মক ( negative ) তড়িৎ সম্পন্ন। যখন একটা ব্যাটারির সাহায্যে তড়িৎ স্রোতের সৃষ্টি করা হয় তখন ইলেকট্রনগুলি ব্যাটারির নেগেটিভ দিক থেকে ঋণাত্মক তড়িৎ বহন করে বেরিয়ে আসে। ইলেকট্রনগুলি পরমাণুর বেশীর ভাগ জায়গা জুড়ে থাকে ও পরমাণুর রাসায়নিক আচরণ নিয়ন্ত্রিত করে। পরমাণু যে আলোক গ্রহণ করে বা বিকিরণ করে তার রঙও নির্ধারিত হয় ইলেকট্রন দিয়ে।

তেজস্ক্রিয় বস্তুর বিকিরণ একদিকে পরমাণুর বিঘটনের ফলেই হয়ে থাকে। অন্যদিকে সেই বিকিরণই পরমাণুর বহিঃস্থিত ইলেকট্রনে নয় তার কেন্দ্রগত অংশে, নাভির মধ্যে পরিবর্তন ঘটায়। এই বিকিরণ প্রণালী পরমাণু সম্বন্ধে গবেষণায় বিশেষ কাজে লাগে। এই শতকের গোড়ায় আরনেস্ট রাদারফোর্ড ( Arnest Rutherford ) বিকিরণ পদ্ধতির প্রয়োগের মধ্য

দিয়েই পরমাণুর নাভিটা আবিষ্কার করেন। যদিও পবমাণুর ভরের প্রায় সম্পূর্ণ অংশ এই নাভিতে গিয়ে জড়ো হয়েছে, পরমাণুর আকারের তুলনায় ওই নাভি বোধ হয় শত সহস্র গুণ ছোট। রাদাবফোর্ড দেখলেন এই নাভি ধনাত্মক বিদ্যুৎসম্পন্ন। হাইড্রোজেন পরমাণুর নাভিতে (প্রোটন) একটি মাত্র ধনাত্মক বিদ্যুৎকণা ইলেকট্রনের বিপরীতে রয়েছে। হিলিয়াম পরমাণুতে দুটি ধনাত্মক বিদ্যুৎকণা রয়েছে। এইভাবে একশ'র উপর যে মূল পদার্থ আছে তার নাভিগত বিদ্যুৎকণাব সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে গেছে।

১৯০০ সালের পর আমাদেব পবমাণুর জ্ঞান খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেছে। একদিকে ইলেকট্রন নিয়ে গবেষণা চলে। পরমাণুকে ইলেকট্রনের উপর কেন্দ্রগত শক্তিব প্রচণ্ড চাপের কথা আমাদের জানালেন বাদারফোর্ড। এর পর ওই চাপের প্রভাবে ইলেকট্রনগুলি কি ভাবে কাজ করে তা জানার দরকার হল। এই সমস্যা প্রথমে কঠিন বলে মনে হয়নি। গবেষকেরা নিউটন-আবিষ্কৃত শক্তিচালিত বস্তুব গতির নিয়মগুলি এক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চাইলেন। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে দেখলেন নিয়মগুলি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

এর কারণ বুঝতে আরও বিশ বছর কেটে গেল। ইলেকট্রনের তরঙ্গজনিত বিশেষত্ব আবিষ্কার না হওয়া পযন্ত ওই সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়নি। দেখা গেল যে ইলেকট্রনকে যদি বস্তুকণা ও তরঙ্গ এই দুই ভাবেই নেওয়া যায়, তবেই তার আচরণের ব্যাখ্যা কবা সম্ভব হয়ে ওঠে। ইলেকট্রনের তরঙ্গগুলির বিভিন্ন রূপ আছে, কতকগুলি একটা বিশিষ্ট অবস্থিত বস্তুকণার পরিচয় দেয়, কতকগুলি একটা নির্দিষ্ট বেগ-যুক্ত বস্তুকণাকে বোঝায়। কিন্তু এমন কোন তরঙ্গ দেখা যায়নি যা বস্তুকণার ওই দুই অবস্থারই পরিচয় দেয়।

এই তথ্য আবিষ্কারেব পর বস্তু-প্রকৃতির পরিচয়ের জন্য নূতন পথ-সন্ধানের দরকার হল। নিউটনের machanics বা বলবিদ্যার নীতিগুলিকে ছাড়িয়ে ওঠার প্রয়োজন দেখা গেল, তার কঠিন নিয়ন্ত্রণের বদলে পরিসাংখ্যিক একটা গড়পড়তার নিয়ম স্বীকার করে নিতে হবে দেখা গেল। এর মধ্য দিয়েই পদার্থের তরঙ্গগত ও বস্তুগত গুণের ব্যাখ্যা সম্ভব ছিল। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের অর্থ এই যে জড়জগতে যা কিছু ঘটছে তার সব কিছু পর্যবেক্ষণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। নিশ্চয়তার বদলে আমাদের সম্ভাব্যকে স্বীকার করতে হবে। এর পিছনে যে তত্ত্ব আছে তাকে বলা হয় পরমাণুর কোয়ানটাম তত্ত্ব (quantum theory) অর্থাৎ পদার্থের শক্তির স্ফুরণ ও বিলয় নিয়মিত পর্যায়ে হয় এই মতবাদ।

আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের মত এই পরমাণু তত্ত্ব আমাদের বুদ্ধির এক বিরাট অবদান। এর থেকে বোঝা গেল যে অতীতের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাগুলি সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ ছিল। এও বোঝা গেল ভবিষ্যৎ প্রগতির জন্য ওই তত্ত্ব অত্যাবশ্যক। কিন্তু জড় পদার্থ কি এই প্রশ্নের জবাব এখনও পাওয়া গেল না। আমরা জানলাম পরমাণুর একটা কেন্দ্রগত নাভি আছে, যার ধনাত্মক তড়িৎকণাকে তার চারিদিকে চক্রাকারে ঘূর্ণমান ইলেকট্রনগুলি নিষ্ক্রিয় করে। এর মধ্যে যে শক্তিগুলি ক্রিয়াশীল তা হল তড়িৎ-প্রবাহ ও তড়িৎকণার মধ্যে পরিচিত আকর্ষণ-বিকর্ষণ। এর কাজের সঙ্গে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কাজের যথেষ্ট মিল রয়েছে। কিন্তু পরমাণুর নাভির যে সূক্ষ্ম গুণগুলি রয়েছে, পবমাণু তত্ত্ব তার বিচারে নাবেনি। ইলেকট্রনের বিশেষ গুণ, তার ভর ও ভরণ ( charge ), পরীক্ষার মধ্য দিয়ে বার করা সম্ভব ছিল কিন্তু তখনও সে বিষয়ে কারও স্পষ্ট ধারণা হয়নি। পরমাণুর নাভির চেয়ে ইলেকট্রনগুলির ওজন যে অত্যন্ত কম এ তথ্য আমাদের শুধু কৌতুহলের খোরাক জুগিয়েছিল।

এর পরে অনুসন্ধান সুরু হল পরমাণুর কেন্দ্রগত নাভি নিয়ে। প্রথম গতিবর্ধক যন্ত্রের সাহায্যে ওই অনুসন্ধান সম্ভব হয়। ওই গতিবর্ধকের কাজ হল পরমাণুর কেন্দ্রস্থিত প্রোটনের গতি বাড়িয়ে দেওয়া, যাতে তা অত্যন্ত দ্রুতবেগে চলতে পারে। ওই প্রোটনগুলিকে এর পর একটা নিশানা লক্ষ্য করে ছোঁড়া হয় ও কখনও কখনও পরমাণুর নাভিস্থল ভেদ করে নিশানায় গিয়ে পৌছয়। এই সংঘর্ষের ফলে যে পদার্থ-কণা নির্গত হয় সেগুলিকে পর্যবেক্ষণ করে দেখা তখন সম্ভব হয়ে ওঠে। এর থেকে কেন্দ্রগত নাভির যে বিশেষত্ব তা ধরা পড়ে। দেখা যায় যে নাভি পরমাণুর অনুরূপ নয়। নিউট্রন ও প্রোটন দিয়ে গঠিত ওই নাভি সুসংহত। নিউট্রন ও প্রোটনগুলি একটা জটিল প্রচণ্ড শক্তির আকর্ষণে সংযুক্ত করা থাকে।

পরমাণুর কেন্দ্রগত নাভির ছবিটা বহুদিন পরিষ্কার হয়নি। প্রোটন-নিউট্রনের মধ্যে যে শক্তিগুলি কাজ করে তা ইলেকট্রনের উপরে যে শক্তি কাজ করে তার চেয়ে জটিল। যখন নাভিতে অনেকগুলি করে ইলেকট্রন-প্রোটন থাকে ও একটা জটিল, বহুমুখী সংগঠনের সৃষ্টি হয়, তখনই নাভিগত বহু বৈচিত্র্য বিশিষ্টতা চোখে পড়ে। তবু পরমাণু-কেন্দ্রের গঠন ও আচরণ সম্বন্ধে এখনও অনেক কিছু অজানা রয়ে গেছে। ইলেকট্রন-প্রোটনের আচরণ দেখে আমরা এমন কিছু নূতন তথ্য আবিষ্কার করব বলে আশা

করি না যা গত দশ-বিশ বছরের অনুধাবন পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটাবে। জড়-পদার্থ কি বোঝাতে তবে কেন ওই নিউট্রন-প্রোটন ও তার চারিদিকের ইলেকট্রনের কথা বলতে পারি না ?

নিউট্রন-প্রোটন ও ইলেকট্রনগুলিকে যখন প্রকৃতির মধ্যে পর্যবেক্ষণ করি তখন তার মধ্যে বহু অদ্ভুত ও অনির্ণনীয় গুণের সমাবেশ দেখতে পাই। আমরা যদি তাদের পরিবর্তন ঘটাতে না পারি বা সত্য সত্যই যদি ওই পদার্থ-কণা অপরিবর্তনীয় হয় তবে তাদের গুণ বিচারের কোন উপায় থাকে না। কিন্তু একথা সত্য নয়। তেজস্ক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে যেমন পরমাণু ও তার নাভিকে ভেঙে তাদের পরিবর্তনশীলতা প্রমাণ করা গিয়েছিল তেমনই গতিবর্ধক যন্ত্রের সাহায্যে নিউট্রন, প্রোটন ও ইলেকট্রন যে পরিবর্তনীয় তা প্রমাণ করা গেছে।

এইসব আবিষ্কারের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা নিয়েছে 'কস্‌মিক' রশ্মি ( Cosmic ray ) যা অতি শক্তিশালী ও অতি বৃহৎ গতিবর্ধক, বহিরাকাশের নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে বার হয়ে আসে। কস্‌মিক রশ্মি যখন জড় পদার্থের উপর এসে পড়ে তখন তাদের সংঘর্ষে নূতন কতকগুলি জড়-কণার সৃষ্টি হয় যা ওই রশ্মি বা পদার্থের মধ্যে ছিল না। এই জড়কণাগুলিকে আলোক-চিত্রের অবদ্রবের (emulsion) গতিপথে বা জলীয় বাতাসে জল-বিন্দুর গতিপথে রেখা হিসাবে দেখা যেতে পারে। এই রেখা থেকে বোঝা যায় যে ওই জড়-কণা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে আসে ও নূতন জড়-কণার সৃষ্টি করে। এর থেকে প্রমাণ হয় সাধারণ সমস্ত পদার্থ ও তার থেকে উপজাত পদার্থ বিভাজ্য ও পরিবর্তনীয়। যথাযথ অবস্থায় জড়-কণা দৃশ্যমান বা অদৃশ্য হয়। অনেকগুলির এক থেকে অপরে রূপান্তরিত হয়, যদিও এই রূপান্তর ঘটে একটা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের মধ্যে। প্রোটন নিউট্রনে ও নিউট্রন প্রোটনে রূপান্তরিত হতে পারে বা অন্য কোন জড়-কণায় পরিবর্তিত হতে পারে। মোমবাতির কাঁপা আলোর মত ইলেকট্রনগুলি যাওয়া-আসা করে।

গতিবর্ধক যন্ত্রে জড়-কণার প্রচণ্ড সংঘর্ষ লক্ষ্য করলে একটা বিস্ময়কর ছবি দেখা যায়। সাধারণত সংঘর্ষ-উপজাত জড়-কণা ও যে জড়-কণার মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে তারা ভিন্ন পদার্থ। শক্তির পরিমাণ যদি বেশী হয় তবে এমন নূতন নূতন জড়-কণার আবির্ভাব ঘটে, পূর্বে যাদের অস্তিত্ব জানা ছিল না। প্রোটন ও ইলেকট্রন ছাড়া আর সব জড়-কণাই স্থায়িত্বহীন। পরে ওই নূতন জড়-কণাগুলির বিভাজন হতে, তাদের ক্ষয় হতে দেখা যায় ও

তার থেকে আরও হালকা জড-কণা বার হয়ে আসে। যেগুলির ক্ষয় হয় না সেগুলিও স্থায়ী নয়। অন্যান্য জড-কণার সঙ্গে সংঘর্ষে তারা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়।

এই যে ছবি তার স্পষ্ট ধারণা করতে হলে বস্তুর ভর ও শক্তির এক থেকে অপরে সমমান পরিবর্তনের কথা ভাল করে বোঝা চাই। এর ফলে যখন শক্তির যোগান দেওয়া হয় তখন জড়কণার সৃষ্টি হয়, আবার জড়কণা শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। পরমাণুর যথেষ্ট শক্তি বিকিরণে আলোকরশ্মির অখণ্ড কণা তৈরি হয়। শক্তি থেকে উপজাত জড-বস্তুর প্রথম লক্ষ্যণীয় দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়েছিল যখন একটি পদার্থের মধ্য দিয়ে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন রঞ্জনরশ্মি প্রেরণ করে ধনাত্মক ইলেকট্রন ও ধনাত্মক প্রসিটনের সৃষ্টি হয়। যে সব তেজস্ক্রিয় বিকিরণে পরমাণুব নাভিস্থল থেকে ইলেকট্রন ও প্রসিটন বার হয় তার ব্যাখ্যা এইভাবে কবা যায়: আইনস্টাইনের বিখ্যাত সূত্র অনুসারে যখন নাভিগত শক্তির পরিমাণ নাভি থেকে সৃষ্ট বস্তু জড-কণাগুলির ভরের চেয়ে বেশি হয় তখন ওই কণাগুলি নাভি থেকে নির্গত হতে থাকে। আইনস্টাইনের সূত্রটি হল: আলোকের গতি জড-কণার ভরের সঙ্গে গুণ করলে শক্তির সমান হয়।

তড়িৎ-ভরণ যুক্ত জড়-কণার ঠিক বিপরীত ভরণ যুক্ত একটি দোসর থাকে। যে ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ জড়-কণায় কোনও তড়িৎ থাকে না কিন্তু তার কতকগুলি তড়িৎ শক্তিগত বিশেষত্ব থাকে, সে ক্ষেত্রেও এমনি জোড় দেখা যায়। কতকগুলি বিশেষত্ব দেখে আমরা জড়-কণাগুলিকে চিনতে পারি। তাদের ভর, ভরণ, তড়িৎ-প্রকৃতি ইত্যাদির আমরা বিচার করি। জড়-কণাগুলির বিভাজন ও ক্ষয় হতে কতক্ষণ সময় লাগে তা লক্ষ্য করি, তার থেকে পৃথক যে সব জড়-কণা বার হয় তার প্রকৃতি ও অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে সংঘর্ষের পর তাদের আচরণ কেমন তা দেখি।

জড়ের রহস্যের একটা সাময়িক সমাধান পাই বিভিন্ন জড়-কণার ওই সমষ্টিগত প্রকৃতি বিচারে। আমরা জানি জড়বস্তু কতকগুলি স্থায়িত্বহীন দ্রব্য দিয়ে তৈরি। অতীতের পদার্থের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে যে ধারণা গড়ে উঠেছিল এ ধারণা তার সম্পূর্ণ বিপরীত। বর্তমান পরমাণুর জগত ত্রিশটি জড়-কণা দিয়ে তৈরি। তার মধ্যে আছে ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন ও এদের প্রত্যেকের বিপরীত তড়িৎ-সম্পন্ন বস্তু-কণা। এ ছাড়া বস্তু-কণার নয়টি বিভিন্ন বিভাগের কথা জানা যায়। এর মধ্যে যে তিনটি শ্রেণীর ওজন নেই তারা

হল আইন্‌স্টাইনের আলোক রশ্মির অখণ্ড রাশি ও এন্‌রিকো ফার্মির (Enrico Fa1mi) নিউট্রিনস্‌ (Neutrinos) ও য়্যান্টিনিউট্রিনস্‌ (Antineutrinos)। শেষের দুটি তেজস্ক্রিয় বিকিরণে পাওয়া যায়। আরও তিনটি শ্রেণী যাতে দুটি, তিনটি ও চারটি করে জড়-কণা আছে, তাদের নাম দেওয়া হয়েছে মেশন (Meson) যার ওজন ইলেকট্রনের ওজনের চেয়ে অনেক শতগুণ বেশী। আরও তিনটি শ্রেণী যাদের হাইপেরন (Hyperons) বলা হয় তাতে দুটি, চারটি ও ছটি কণা আছে। এগুলি প্রোটনের চেয়ে ভারি।

মেশন ও হাইপেরনের স্থায়িত্ব এক সেকেণ্ডের দশলক্ষ ভাগের এক ভাগ। তাদের ক্ষয়ের বেগেব একটা মোটামুটি ধারণা কবা যেতে পাবে যদি তার ভর ও তার থেকে নতন সৃষ্ট বস্তু-কণার ভরের পার্থক্যেব জন্য যে শক্তি নির্গত হয় তার হিসাব কষা যায়। শক্তি যত বেশী নির্গত হয়, বস্তু-কণার ক্ষয়ের বেগ তত বাড়ে। তবু এদের ক্ষয় থেকে উদ্ভূত বস্তু-কণার বিভাজনে যে এক সেকেণ্ডের লক্ষ-লক্ষ কোটি ভাগের এক ভাগ সময় লাগে তার তুলনায় মনে হয় মেশন ও হাইপেবনের স্থায়িত্ব অনেক বেশী।

কণা-পদার্থ-বিজ্ঞানে কোন কোনও জড়-কণার অপেক্ষাকৃত এই দীর্ঘ স্থায়িত্ব রহস্যের সৃষ্টি কবেছে। এসব ক্ষেত্রে যে সব শক্তি স্বতঃস্ফূর্ত বিভাজন ঘটায় তা অত্যন্ত ক্ষীণবল বলে মনে হয়। দু' বছর আগে আমবা জেনে বিস্মিত হয়েছিলাম যে ক্ষয়সম্ভূত পদার্থের বামাবর্ত ও দক্ষিণাবর্ত সংস্থিতির মধ্যে পার্থক্য ঘটায় ওই শক্তিই। এই ধারণা সত্য বলে প্রমাণ হওয়ায় কণা-পদার্থ-বিজ্ঞানের ছাত্র মাত্রই খুশি হয়েছিলেন ও দু'জন চৈনিক যুবক—কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের Tsung Dad Lee ও প্রিন্‌স্টনের উন্নত শিক্ষার সংস্থার Chen Ning Yang—এই সূত্র আবিষ্কাবে সাহায্য করার জন্য ১৯৫৭ সালে নোবেল পুরস্কার পান।

ওই ত্রিশটি জড়-কণাই কি সব? এ বিষয়ে সঠিক কিছু বলা এখনও সম্ভব নয়। গতিবর্ধক যন্ত্রের ক্ষমতা বাড়া সত্ত্বেও কস্‌মিক রশ্মির গবেষণা আরও নিগূঢ় হওয়া সত্ত্বেও ত্রিশটির উপর আর কোন নাম যোগ করা যায় নি। আরও শক্তিশালী যে গতিবর্ধক যন্ত্র তৈরি হচ্ছে তার সাহায্যে হয়তো এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে।

পরমাণুর জড়-কণাগুলির গঠন ও আচরণের মধ্যে একটা নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলার পরিচয় পাওয়া যায়। কণা-পদার্থ-বিজ্ঞানের একটি মূল কাজ

ওই নিয়মানুবর্তিতার সূত্রটিকে খুঁজে বার করা। জড়-কণার ভর দিয়ে তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত। সব চেয়ে ভারি হাইপেরন, তারপর প্রোটন, নিউট্রন, মেশন ও ইলেকট্রন ও সবশেষে নিউট্রিনো, যার কোন ভর নেই। নিউট্রিনো একটি শক্তির মোড়ক মাত্র যা আলোর বেগে চলে অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল। ভরগুলির মধ্যেই একটা আংশিক শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা ধরা পড়ে। এ ছাড়া অন্যান্য নিয়মও চোখে পড়ে। সমস্ত প্রাথমিক জড়-কণার হয় কোনও তড়িৎ-ভরণ নেই কিম্বা ইলেক্ট্রনের ভরণের সমান তড়িৎ ভরণ আছে, কিম্বা সমমানের বিপরীত ভরণ আছে। জড়-কণাগুলি যখন স্বাধীন ভাবে ঘুরতে পারে, তাদের মধ্যে যখন সংঘর্ষ বাধে না, তখন তাদের সেই অবস্থাকে সহজ কতকগুলি তরঙ্গ প্রবাহের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়। এছাড়া আগেই দেখা গেছে যে জড়-কণা দল বেঁধে থাকে—ইলেক্ট্রনও তার দোসর, হাইপেরণ ও মেশনের গোষ্ঠী। এই দলবদ্ধ জড়-কণার ভর প্রায় সর্বত্র সমান ও গুণের দিক থেকেও তাদের মধ্যে অনেক মিল পাওয়া যায়।

নিয়মানুবর্তিতার আরও বিশেষ নিদর্শন আছে। জড়-কণা পরিবর্তনশীল হলেও সব জড়-কণা অন্য আর একটি জড়-কণায় রূপান্তরিত হয় না, যথেষ্ট শক্তির বিকাশ ঘটলেও, সব রকম প্রতিক্রিয়া ঘটে না। প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে এই যে ব্যতিক্রম তা একটা নির্বাচন নীতির ইঙ্গিত করে। সাধারণত এই বাছাই-এর নিয়মে ব্যাখ্যা করবার জন্য আমরা একটা পরিমাণ ধার্য করি বা কখনও কখনও উদ্ভাবন করি যা সংঘর্ষের ফলে বদলায় না, যা স্থায়ী, অপরিবর্তনশীল। এই পরিমাণ হল শক্তি ও ভরের একটা যোগফল বস্তু-প্রক্রিয়ার ফলে যার কোন পরিবর্তন ঘটে না। নিয়মানুবর্তিতার আরও দৃষ্টান্ত আছে। যেমন প্রতিক্রিয়ার ফলে যে তড়িৎ সৃষ্টি হয় তার পরিমাণ যে পদার্থের মধ্যে প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তাদের তড়িৎ-ভরণের যোগফলের সমান।

পদার্থের স্থিতিশীলতাকে কেন্দ্র করে নিয়ম গড়ে উঠেছে দেখা যায়। ভারি নিউট্রন ও প্রোটনে যে শক্তি থাকে তাতে তার অন্যান্য হাল্‌কা পদার্থে পরিবর্তন স্বাভাবিক বলে মনে হবে। কিন্তু সাধারণ বস্তুতে তা ঘটে না। এই পরিবর্তন ঘটলে সমস্ত পদার্থ, আমাদের বিশ্ব-ভুবনের অস্তিত্ব থাকত না। এর থেকে বোঝা যায় যে যদিও নিউট্রন প্রোটনে ও প্রোটন নিউট্রনে পরিবর্তিত হয়, বস্তু-প্রক্রিয়ায় তাদের মোট সংখ্যার পরিবর্তন ঘটে না।

অন্যান্য প্রতিক্রিয়াব ক্ষেত্রেও এই নিয়মকে সাধারণভাবে প্রয়োগ করতে হবে। তড়িৎ-ভরণের অক্ষয়তার নিয়মের মত জড-কণার মোট সংখ্যার অপরিবর্তনীয়তার নীতি আমাদেব মেনে নিতে হবে। সৃষ্টির সুরু থেকে এই নিয়মের কোন লক্ষ্যণীয় ব্যতিক্রম দেখা যায় নি। যেমন দেখা যায় যে শতকোটি বছর আগে বস্তু-নির্গত আলো বহিরাকাশ থেকে আমাদের কাছে অপরিবর্তনীয়ভাবে এসে পৌছায়।

একটা দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যাবে পারমাণবিক উপাদানগুলির পরিচয় ও শ্রেণী-বিভাগের চেষ্টা কতখানি সাময়িক ও প্রমাণসাপেক্ষ। পরমাণুর নাভি, হাইপেরন, মেশন ইত্যাদির মধ্যে প্রতিক্রিয়ার প্রভাব বোঝাবার জন্য পদার্থের স্থিতিশীলতার একটা নূতন প্রকৃতিব উদ্ভাবন কবা হয়েছে। এই আরোপিত গুণের নাম দেওয়া হয়েছে "অবিদিত গুণ"।

তড়িৎ-ভরণের অক্ষয়তা ও পারমাণবিক কেন্দ্রগত জড-কণার সংখ্যার অপরিবতনীয়তা পদার্থ-জগতেব একটা চূড়ান্ত বিধি বলে মনে হবে। কোন বস্তু-প্রক্রিয়ায় তাদের বদল হয় না, বল প্রয়োগে তাব মধ্যে পরিবর্তন আনা যায় না। কিন্তু পদার্থের অন্যান্য অনেক গুণ আছে যা বদলায়। ওই "অবিদিত গুণসত্তা" এরই মধ্যে একটি। এদের উপব কাজ করে যে বল তা অতি ক্ষীণ। বিশেষত তেজস্ক্রিয়তাব ব্যাপারে এই ক্ষীণ শক্তির কাজ দেখা যায়। আমরা এখনও জানি না কবে ওই ক্ষীণ বল পদার্থের গুণের পরিবর্তন ঘটায় যখন সংঘর্ষগত প্রবল বল প্রয়োগে ওই পরিবর্তন ঘটান সম্ভব হয় না। আমরা যে আলো ও উত্তাপ পাই তার মূলে রয়েছে এমনই অতি ধীর পরিবর্তন যেটা বাছাই নিয়মের বিরোধী। সূর্যের বিরাট অন্তর্দেশে কখন কখনও এক-আধটা সংঘর্ষের ফলে দুটি প্রোটন থেকে একটি ডিউট্রন ও একটি ধনাত্মক ইলেকট্রন বার হয়ে আসে যার ফলে আমরা আলো ও উত্তাপ পাই।

অবশ্য নির্বাচন বিধি ও পদার্থের অপরিবর্তনীয়তার নিয়ম চূড়ান্ত না হলেও তার মধ্য দিয়ে আমরা যা ঘটেছে তার ব্যাখ্যা করতে পারি ও যা ঘটবে তা বলতে পাবি। এই হিসাবেই পদার্থ-বিজ্ঞানে তার স্থান থাকবে। কিন্তু ওই নিয়মের অন্য কাজও আছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে পদার্থের মোট তড়িৎ-ভরণ বা শক্তি ও ভরের পরিবর্তন ঘটানর জন্য কোন বল উপস্থিত থাকে না। সে সব ক্ষেত্রে ওই বলের অভাবটাই প্রমাণ করে যে পদার্থ-বিজ্ঞানে সরল নীতিও আছে। সাধারণ বলবিদ্যায় বলে যে একটি

বস্তুর উপর যদি বাইরের থেকে কোন বল না কাজ করে তবে সে বস্তুর বেগ কমেও না বা বাড়েও না। শূণ্য দেশের সরলতা ও প্রতিসাম্য যার মধ্যে কোনও বল কাজ করে না এর কারণ বলে আমরা দেখিয়ে থাকি। গণিতশাস্ত্রের সাহায্যে প্রতিসাম্য ও অপরিবর্তনীয়তার সম্বন্ধ দেখান সহজ। অল্প কথায় এই তত্ত্ব ব্যক্ত করা আমার পক্ষে এখানে সম্ভব হচ্ছে না।

পদার্থ বিজ্ঞানের নিয়মগুলির শৃঙ্খলার পরিচয় আমরা পাই যে-কোন নির্বাচন নীতির শিক্ষা থেকে। ওই নিয়মগুলি কি ও কোন কোন সংখ্যা ও পরিমাণ তা দিয়ে নিয়ন্ত্রিত তা জানার এ একটা মূল্যবান সূত্র। পদার্থের গঠন সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের যে অল্প কয়েকটি সূত্র আছে তার মধ্যে এই সূত্র একটি।

এই সমস্যা সমাধানের আর একটি উপায় হল পদার্থ বিজ্ঞানবিদের পরিচিত দৃশ্য বর্ণনার অনুরূপ অপরিচিত দৃশ্যের বর্ণনা। এইজন্য, কোয়ানটাম সিদ্ধান্তের অদ্ভুত বিশেষত্ব সত্ত্বেও তা নিউটনের বলবিদ্যার সারূপ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। জীবনের সাধারণ মোটামুটি ঘটনার ক্ষেত্রে ওই পরিচিত নিয়মগুলি এখনও প্রযোজ্য। আলোকের উৎসরণ ও বিলয়ের তথ্য যা জানি তার তুলনামূলক বর্ণনার মধ্য দিয়ে ফার্মি তেজস্ক্রিয় পদ্ধতি বুঝিয়ে ছিলেন। অবশ্য উপমা বলেই তার পরিশোধন দবকার ছিল।

একটা নূতন অবস্থা উপমা দিয়ে ব্যাখ্যা করা আমাদের জ্ঞানের প্রসারের জন্য প্রয়োজন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কণা-পদার্থ বিদ্যার সত্যতা সম্বন্ধে অনেক উদ্বেগ ও সন্দেহের অবকাশ আছে।

তবু বিজ্ঞানের এই ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তিত ধারণার আশা আমরা দেখতে পাই। আমরা আশা করি কোনদিন ওই নূতন আবিষ্কৃত জড়-কণা, তার অবস্থিতি, প্রকৃতি ও আরোপিত গুণ, এবং যে নির্বাচন পদ্ধতি তাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া নির্ধারণ করে, সে সম্বন্ধে আমাদের সুসম্বদ্ধ জ্ঞান লাভ সম্ভব হবে। এই জড়-কণাগুলির অস্তিত্বের কারণ আমরা জানি না। আমরা জানি না এমন অন্য জড়-কণা আর আছে কি নেই। তাদের ভিন্ন ভিন্ন ভরের কারণ আমাদের অজ্ঞাত। তাদের পরিবর্তনহীনতার যেদিক তার ব্যাখ্যার জন্য যেসব গুণের অবস্থিতি দরকার সে বিষয়ে আমাদের জ্ঞান এখনও সম্পূর্ণ নয়। উনিশ শতকের রসায়নশাস্ত্রের সঙ্গে আমাদের এখনকার জ্ঞানের তুলনা করা চলে। তখন রাসায়নিক প্রকৃতি, পরমাণুর ওজন ও তাদের সংযোগের নিয়ম জানা ছিল। কিন্তু এই প্রত্যেকটি তথ্য ল্যাবরেটরি

পরীক্ষার মাধ্যমে জানতে হত, সেগুলিকে তখনও সরল নিয়মের অধীনে আনা যায় নি। পারমাণবিক বলবিদ্যা উদ্ভাবনের পর দেখা তথ্যকে তত্ত্বের সূত্রে গাঁথা গেল। আজ পূর্ব অর্জিত ও আরও অনেক নূতন তথ্যকে কয়েকটি মাত্র দৃশ্যগত ধ্রুবক ও প্রকৃতির একটি নিয়মের ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে বোঝান যায়। এই নিয়মে পরমাণুর কেন্দ্রগত তড়িৎক্ষেত্রে ইলেকট্রনের আচরণ জানা যায়।

মৌলিক কণাগুলির তুলনামূলক ব্যাখ্যা সম্বন্ধে দুটি মত আছে। একটি মতবাদ এই যে সমস্ত জড়-কণা একটা আদিম, মূল পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা। এই মৌলিক পদার্থ সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম আবিষ্কৃত হলে বোঝা যাবে ওই সব জড়-কণা কেন আছে, তাদের কি কি নির্দিষ্ট গুণ আছে।

আর একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন মতে আমাদের জড়-জগতের এই অংশকে বোঝাতে মৌলিক পদার্থের অস্তিত্ব কল্পনার প্রয়োজন নেই। আমাদের এই প্রাথমিক জড়-কণাকে, তার গুণ ও আচরণের নিয়মকে জানলেই হবে। এই জানার মধ্য দিয়ে শুধু জড়-কণার আচরণ নয়, তাদের অস্তিত্বের সম্বন্ধেও আমাদের জ্ঞান জন্মাবে। এই ব্যাখ্যায় দেশ ও কালের যে সূক্ষ্ম মান দিয়ে আমরা জড়-জগতের ঘটনার বিচার করি তার একটা সীমানা নির্দেশিত হবে। কারণ এই বিচারে যে প্রাথমিক জড় কণা নিয়ে আমরা কাজ করি তাদের সংখ্যা সীমাবদ্ধ।

ইতিহাসে বিশ্বাস করলে জানা যাবে পদার্থ বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাদের এই যে জল্পনা তার মধ্যে খুব একটা বিশেষ বুদ্ধির পরিচয় নেই। আমাদের বর্তমান চেষ্টা ও আশার কথা হয়তো ওই জল্পনার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয় কিন্তু তার মধ্যে ভবিষ্যৎ দর্শন নেই। ইতিমধ্যে যে দুটি মতবাদের কথা বলা হয়েছে তার যুক্তি-অযুক্তি নিয়ে চমকপ্রদ তর্ক চলবে।

পদার্থ বিদ্যার ইতিহাস হয়তো কোন পথ নির্দেশ করবে না। কণা-পদার্থ বিদ্যার ক্ষেত্রে হয়তো অনিয়ন্ত্রিত, জটিল, অসংবদ্ধ নীতি ও তথ্যকে আমাদের মেনে নিতে হবে। তার পিছনে যে সামঞ্জস্য আছে তা আমরা দেখতে পাব না। কিন্তু আমাদের মধ্যে যাঁরা পদার্থ বিজ্ঞানে ব্রতী তাঁরা সহজে এ হার স্বীকার করবেন বলে মনে হয় না।

# অতীতের শিক্ষা

## এডিথ হ্যামিল্‌টন

চিরন্তন অতীত বলে কিছু আছে কি? এমন কোন নিত্য সত্য আছে যা বর্তমানের জন্য চিরকাল মূল্যবান? আমরা যে অপরিচিত ও অপরীক্ষিত ভবিষ্যতের আজ সম্মুখীন হয়েছি ইতিহাসে তার তুলনা নেই। আমাদের সামনে যে সীমাহীন আকাশ রয়েছে তার কাছে কলম্বাসের জগতটা সত্যই ক্ষুদ্র ও আমাদের সভ্যতার ধ্বংসের যে সম্ভাবনা রয়েছে তা এর আগে কখনও দেখা যায় নি। এই অবস্থায় অতীতের আলোচনায় আমাদের কি সময় কাটান উচিত? এ প্রশ্ন আমাকে বারংবার করা হয়েছে। এই পারমাণবিক যুগে আমি কি গ্রীস ও রোমের ইতিহাস ও তাদের সভ্যতার অনুশীলন করতে বলি?

আমি তাই বলি এবং তা আমি বলছি বিনা দ্বিধায়। আমাদের এই বিরাট সভ্যতাকে বাঁচাতে হবে, নচেৎ হারাতে হবে। এই অবস্থায় আমাদের পূর্বের সেরা সভ্যতা, গ্রীক সভ্যতা, আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ও সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার আমাদের প্রয়োজন আছে। তারাও বিপদসঙ্কুল জগতে বাস করতো। ওই ছোট অতি সংস্কৃত দেশকে ঘিরে ছিল ইউরোপের অন্যান্য অসভ্য জাতি ও এশিয়ার সেকালের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী দেশ পারস্য তার আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পরিশেষে গ্রীসকে হার মানতে হয়। কিন্তু সে হারের কারণ শক্তিশালী শত্রু নয়, পরাজয়ের কারণ তার আত্মিক শক্তির বিলোপ। যতদিন ওই আত্মিক শক্তি ছিল ততদিন তাদের কেউ জয় করতে পারেনি ও তারা শিল্পকলা ও চিন্তার ক্ষেত্রে এমন সৃষ্টির নিদর্শন রেখে গেছে যার উৎকর্ষতা শত শত বৎসরের চেষ্টাতেও মানুষ ছাড়িয়ে উঠতে পারেনি।

এ কথা বলতে চাইছি না যে গ্রীক রুচি আমাদের চেয়ে ভাল ছিল। বিংশ শতাব্দীর আমেরিকার সঙ্গে পঞ্চম শতকের এথেন্সের পরিচিত তুলনা-মূলক আলোচনার মধ্য দিয়ে এ কথাও বলতে চাই না যে পারথেনন (Parthenon) গির্জার স্থাপত্যশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বা থিয়েটারের জগতে সোফোক্লিসই (Sophocles) শেষ কথা। আমার বক্তব্য সক্রেটিস সেদিন

কত রাস্তার মোড়ে ও খেলার মাঠে সাধারণ লোককে প্রশ্ন করে তাদের মনে যে জ্ঞানের শিখা জাগিয়ে তুলতে পেরেছিলেন তার আর তুলনা দেখা গেল না। তিনি সাধারণ লোককে চিন্তার জগতে নিয়ে যেতেন, যার অর্থ তাদের প্রকৃত শিক্ষালাভে সুযোগ দিতেন।

আজ এই মহৎ উদ্দেশ্যে কি ভাবে পৌছান যায়? বহু বছর ধরে শিক্ষার উপায় ও পথ নিয়ে আলোচনা চলেছে ও আজও তা বন্ধ হয় নি। উইলিয়াম জেমস্ এক সময়ে বলেছিলেন যে দুটি বিষয়ের কথা উঠলে আর সব আলোচনা বন্ধ হয়ে যায়—সে দুটি হল ধর্ম ও শিক্ষা। আজকে রাশিয়া বোধহয় আলোচনার প্রধান বিষয় কিন্তু শিক্ষা নিশ্চয় দ্বিতীয় স্থান পাবে। শিক্ষা সম্বন্ধে আমরা আরও জানতে চাই, শিক্ষার গুরুত্বটা আমবা বুঝি।

দেখা যাচ্ছে রুশদের পরাজয়টাকেই আজ আমরা শিক্ষার উদ্দেশ্য করে তুলেছি। শিক্ষার পরাজয় ঘটানর এর চেয়ে নিশ্চিত উপায় আর নেই। যখন বুঝব যে শিক্ষা ব্যক্তিবিশেষকে নিয়ে, কোনও আন্দোলন বা মতবাদকে নিয়ে নয়, তখনই প্রকৃত শিক্ষালাভ সম্ভব হবে।

শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ যখন পড়ি তখন প্রায়ই মনে হয় শিক্ষার এই যে ব্যক্তিগত দিক তার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় নি। শুধু শিক্ষিত হওয়ারই যে আকর্ষণ ও আনন্দ সে দিকটার দিকে দৃষ্টি ফেলা হয় নি। বহুদিন আগে জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বেসিল এল, গিল্ডারস্লিভের সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল। আমাদের দেশে গ্রীক সভ্যতার এতবড় পণ্ডিত আর কখনও জন্মায় নি। এই বৃদ্ধ লোকটি ইউরোপ ও আমেরিকার যেখানে যখন গেছেন সম্মান পেয়েছেন। সে সময় তিনি অক্সফোর্ডে আয়োজিত এক সম্মান সভা থেকে সবে ফিরেছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম তাঁর দীর্ঘ জীবনে যে এত প্রশংসা লাভ করেছেন, তার মধ্যে কোন্‌টি তাঁর সবচেয়ে ভাল লেগেছে। অধ্যাপক হাসলেন কিন্তু সেই সঙ্গে ভাবতেও সুরু করলেন। শেষে বললেন, সবচেয়ে বেশী খুশী হয়েছি যখন আমার এক ছাত্র বলেছিল, "অধ্যাপক, আপনার মনের খেলায় আপনি কত আনন্দ পান!" রবার্ট লুই ষ্টিভেনসন একবার বলেছিলেন যে ছোট একটা স্টেশানে বই না পড়ে ট্রেনের জন্য দু' তিন ঘণ্টা একা বসে থেকে বিরক্তি না বোধ করা এমন কিছু শক্ত কাজ নয়।

কোন শিক্ষায় এই সামর্থ্য জন্মায়? যে জায়গা একান্তভাবে আমার, আমার অন্তরের, যেখানে যেতে চাই, বাস করতে চাই, তা কি উপকরণ দিয়ে

সাজাব? এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারলে খুশী হতাম। ওই অন্তর জগতকে মনোরম, আকর্ষণীয় ও উদ্দীপনাময় করে তোলার জন্য যদি একটা নিখুঁত গৃহ-সজ্জার নকশা উপস্থিত করতে পারতাম তবে ভাল হত। কিন্তু পারলেই বা কি? কিছুদিনের মধ্যেই আবার ওই অন্তর-গৃহকে ভিন্ন সাজে সাজাবার দরকার পড়ত। আমার বক্তব্য এই যে যদিও পরিবর্তনের ও নূতন সজ্জার আবশ্যকতা আছে, কিন্তু পুরাণ আসবাবগুলিকে একেবারে ফেলে দেওয়াও উচিত নয়। ফেলে দিলে তাকে আর কোনদিন ফিরে না পাওয়া যেতে পারে। গত এক পুরুষে আমরা অনেককিছু পরিত্যাগ করেছি, যার ফলটি এখন দেখতে পাচ্ছি। যে আসবাবগুলি বহুদিন ধরে আমাদের জীবনের প্রধান সম্পদ ছিল, তাকে অবহেলায় ত্যাগ করে এসেছি। শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাচীন মহাকাব্যের পাঠ বন্ধ হয়েছে। এ এক মস্ত পরিবর্তন। এর সঙ্গে আর এক পরিবর্তন এসেছে। আজকালকার লেখক, যাঁরা গ্রীক ও ল্যাটিনে অজ্ঞ, তাঁদের সঙ্গে গত যুগের লেখকদের লক্ষ্যণীয় পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। এর মধ্যে কি কার্য-কারণ সম্বন্ধ রয়েছে? এটা সাধারণের বিচারের বিষয়। কিন্তু একটা কথা বোধহয় সকলেই স্বীকার করবেন যে আধুনিক সাহিত্যে প্রচ্ছন্ন স্পষ্ট চিন্তার অভাব আছে। আমরা অবোধ্য সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে বাঁধা পড়েছি। সাধারণ লোক এই সাহিত্য পড়তে ভালবাসে। এর থেকে মনে হয় তারা চিন্তা করবার শক্তি হারিয়েছে কিম্বা, আরও খারাপ, চিন্তা করবার ইচ্ছাটাই হারিয়েছে।

গ্রীকদের স্বভাবে এ দুটোই ছিল না। তাদের মধ্যে সমস্ত কিছুকে ভাল করে চিন্তা করে দেখার জন্য গভীর আগ্রহ ছিল। বক্তব্যে ও চিন্তায় তারা অস্পষ্টতা ভালবাসত না। রোমানদের মধ্যেও এই গুণ কিছু পরিমাণে ছিল। অল্প কথায় তারা তাদের বক্তব্য স্পষ্ট করে বলতে পারত। শুধু এখন যখন লেখকেরা ল্যাটিন ভাষার গঠন শিক্ষা করার প্রয়োজন বোধ করেনি, আমরা শুধু কথার মধ্যে ডুবে আছি। আমাদের সাহিত্য এখন শুধু কথা, কথা, কথা। আমাদের আজ বাগাড়ম্বরে পেয়েছে। ফলে কংগ্রেসের বক্তৃতা বিবরণী আকারে বড় হচ্ছে ও ডাক বিভাগে ডাক স্তূপীকৃত হচ্ছে।

যে স্কুল-শিক্ষার ভিত্তির উপর গ্রীক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তার সঠিক বিবরণ আমাদের জানা নেই। কিন্তু তার ফলটা জানি। প্লেটো বলেন, গ্রীক বালকদের সুন্দরকে ভালবাসতে ও কুৎসিৎকে ঘৃণা করতে শিক্ষা দেওয়া হত। বড় হয়ে সাধারণ বাসনপত্রগুলিও যাতে দেখতে সুন্দর হয় সে বিষয়ে

তাদের যত্ন নিতে হত। অপটুতা ও আনাড়িপনাকে তারা ঘৃণা করতে শিখত, তারা সামঞ্জস্যের, চারিত্রিক মাধুর্যতার সাধনা করত। প্লেটো আরও বলেন, "আমাদের দেশের শিশু সুন্দরকে দেখবে, সুন্দর শব্দ শুনবে, সুন্দর দেশের বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করে বড় হয়ে উঠবে।"

তবু এথেন্সবাসী যে সুন্দরকে নিয়ে সম্পূর্ণ লিপ্ত ছিল না তার পরিচয় পাওয়া যায় সক্রেটিসের সঙ্গে তাদের কথাবার্তার মধ্যে। তাদের চিন্তা করবার শিক্ষা দেওয়াটাই আসল। প্লেটো তাঁর একাডেমিতে প্রবেশের আগে ছাত্রদের শক্ত পরীক্ষায়, বিশেষত গণিতশাস্ত্রের পরীক্ষায় বসাতেন। এথেন্সবাসী চিন্তাশীল ছিল। আজ বৈজ্ঞানিক চিন্তার ক্ষেত্রের পুরস্কারগুলি সব নিয়ে যাচ্ছে। তবু বলব যে কোপারনিকাসের ১৮০০ বছর আগে একজন গ্রীক জানিয়েছিলেন যে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে। কলম্বাসের ১৭০০ বছর আগে একজন গ্রীকই জানিয়েছিলেন যে যদি স্পেন থেকে জাহাজে বেরিয়ে একই অক্ষরেখা ধরে চলতে থাকি তবে আবার স্থলে এসে পৌছাব। ডারউইনের মতে "এরিস্টটলের সঙ্গে তুলনায় আমাদের বৈজ্ঞানিক চিন্তা শিশুসুলভ।" তবু আমাদের বৈজ্ঞানিকদের মত গ্রীকদের কোন বিজ্ঞানের ঐতিহ্য ছিল না, তাদের গোড়া থেকে চিন্তা করে সমস্ত সিদ্ধান্তে এসে পৌছতে হত।

রাজনীতির ক্ষেত্রেও সেই একই কথা। তাদের গোড়া থেকে সমস্ত চিন্তা করে দেখতে হত। তারা তাদের ছেলেদের চিন্তার স্বাধীন রাজ্যে চিন্তাশীল নাগরিক হয়ে বাস করার শিক্ষা দিত।

স্বাধীনতাই গ্রীকদের সাফল্যের ভিত্তি। এথেন্সবাসীরাই জগতের একমাত্র স্বাধীন জাতি ছিল। ইজিপ্ট, ব্যাবিলন, এসিরিয়া, পারস্য প্রভৃতি বিরাট প্রাচীন সাম্রাজ্যে অতুল সম্পদ ছিল, প্রচুর ক্ষমতা ছিল, কিন্তু স্বাধীনতা ছিল না। স্বাধীনতার প্রশ্নটাই সেখানে কখনও জাগেনি। স্বাধীন ভাবনার সৃষ্টি গ্রীসের মত গরীব দেশে। কিন্তু ওই স্বাধীন অভিজ্ঞতার বলেই তারা বাইরের শক্তিশালী শত্রুদের ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছিল। ম্যারাথন ও স্যালামিসে মুষ্টিমেয় গ্রীক সৈন্যের কাছে অসংখ্য পারস্য সৈনিকের পরাজয় ঘটে। এ কথা প্রমাণ হয়ে গেছে যে একজন স্বাধীন মানুষ স্বেচ্ছাচারী রাজার বহু বাধ্য দাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এথেন্সবাসীর সবচেয়ে বড় সম্পদ ছিল তাদের স্বাধীনতা, তাই তারা সেই অতি অদ্ভুত যুদ্ধে বিজয়ী হয়। ডেমস্থিনিস ( Demosthenes ) বলেছিলেন যদি তাঁরা স্বাধীন হয়েই না

বাঁচতে পারেন তবে তাঁদেব কাছে বাঁচার অর্থ থাকে না। কয়েক বছর পরে একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক বলেন, "এথেন্সবাসী, তাদের যদি স্বাধীনতা কেড়ে নাও, তবে তারা মরবে।"

এথেন্স শুধু যে প্রথম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ছিল তাই নয়, তার উন্নতির শিখরে, আধুনিক মানুষের চোখেও একটা প্রায় ত্রুটিহীন গণতন্ত্র হয়ে উঠেছিল। সেখানে স্ত্রীলোক, বিদেশী বা দাসেদের ভোটের অধিকার ছিল না, কিন্তু দেশের পুরুষদের ধরলে এথেন্সবাসীব গণতন্ত্র আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। সাধারণ সভার ( Assembly ) উপর রাজ্য শাসনের ভাব ছিল ও সেই সভার সভ্য ছিল প্রত্যেকটি আঠার বছরের উপরের সমস্ত নাগরিক। পাঁচশ লোকের সংসদ ( Council of Five Hundred ) যা সাধারণ সভার কার্যসূচী তৈরি করত ও প্রয়োজন হলে সাধারণ সভার সঙ্কল্পগুলি কাজে পরিণত করার ভার নিত, তার সভ্যদের লটারির মাধ্যমে বাছাই করা হত। জুরী ও ছোটখাট কার্যনির্বাহকদেরও লটারির মাধ্যমে নির্বাচন করা হত। সাধারণ সভা প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট ও সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসারদের বাছাই করে দিতেন। পেরিক্লিস একজন অতি জনপ্রিয় সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন ও বহুদিন পর্যন্ত দেশের প্রধান শাসক হিসাবে কাজ করেন। কিন্তু প্রতি বছরই তাকে নির্বাচনে দাঁড়াতে হত। বক্তব্য প্রকাশের স্বাধীনতাকে সেখানে সবচেয়ে বেশী মূল্য দেওয়া হত। সে স্বাধীনতা আর কোন রাষ্ট্রে আজ পর্যন্ত সম্ভব হয় নি। যখন ভয়াবহ পেলপনেশিয়ন ( Pelponesian ) যুদ্ধের শেষে স্পার্টা এথেন্সের ওপর চড়াও হয়ে এসেছে তখনও নাট্যশালায় এরিসটোফেন্স এথেন্সের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষদের কাপুরুষ বলে বিদ্রূপ করেছেন, তখনও সাধারণ সভার সুরুতে ঘোষক কারও কিছু বক্তব্য আছে কিনা জানতে চেয়েছেন।

সে সময়ে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক সমতা ছিল। রাজ্য ছিল জনগণের, রাজ্যশাসনের ভার ছিল জনগণের হাতে ও রাজ্যশাসন হত তাদেরই মঙ্গলের জন্য। চতুর্থ শতকের গোড়ায় একজন নব আলোকহীন বৃদ্ধা অভিজাত লিখেছিলেন, "যদি গণতন্ত্রের একান্তই দরকার হয় তবে এথেন্সই আমাদের সবচেয়ে বড নিদর্শন। তার যেটাতে আমার আপত্তি তা হল ওই গণতন্ত্র নিম্নশ্রেণীর মঙ্গলের জন্য। বিদগ্ধ উচ্চ শ্রেণীর মঙ্গলের জন্য নয়। এথেন্সে মাঝি ও মজুর শ্রেণীর লোকের সুবিধা, তাদের উন্নতিটাই সেখানে গুরুত্ব পায়।" কিন্তু এই উক্তি সত্ত্বেও এথেন্সকে সুন্দর করে গড়ার উপরেও কম

জোর পড়ে নি, নাট্যমঞ্চে যে নাটকগুলির অভিনয় হত তার গুরুত্বও কম ছিল না। প্লেটো বলেছেন সাধারণ সভার প্রধান সব সভ্য হল মুচি, ছুতোর, কামার, চাষা ও ছোট ছোট ব্যবসাদার লোক। কিন্তু ওই সামান্য লোকেরাই পার্থেনন ও অন্যান্য অট্টালিকা গড়া অনুমোদন করেছিল, তারাই থিয়েটারে ভিড় করে যেত, যেখানে শ্রেষ্ঠ বিয়োগান্ত নাটকগুলির অভিনয় হত। এথেন্সে শুধু যে সাধারণ লোক শাসন কাজের ভার নিয়েছে তাই নয়, তারা সুন্দরের সৃষ্টিতেও অংশ নিয়েছে, সুন্দরকে ভালবেসেছে। এথেন্স ছাড়া এমন আর কোন রাষ্ট্রে ঘটে নি।

কিন্তু ওই স্বাধীন মনোভাবাপন্ন গ্রীকরাই দাস রাখত। এ কেমন ধরণের স্বাধীনতা বোধ ? কিন্তু প্রাচীন যুগে এই প্রশ্ন অবোধ্য ছিল। সে সময় দাস রাখা নিয়মের মধ্যে ছিল, সাংসারিক জীবনে ক্রীতদাস ছিল প্রথম প্রয়োজন। জীবনের ভিত্তি গড়ে উঠেছিল দাস প্রথার ওপর। ওই প্রথাকে সকলে প্রশ্ন না করেই মেনে নিত। যে গ্রীক চিন্তাবীরেরা মুক্তির সংজ্ঞা স্থির করেছিলেন, সৌর জগত আবিষ্কার করেছিলেন, তাঁরাই বুঝতে পারেন নি যে দাস প্রথাটা অন্যায়। একথা সত্য যে প্লেটো ওই প্রথা সম্বন্ধে খুব স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন না। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন অনেক দাসই অত্যন্ত সৎ ও বিশ্বাসযোগ্য, পরিবারের লোকদের চেয়েও তারা উপকার বেশী করে। কিন্তু এর বেশী তিনি আর এগোন নি। এই প্রথার নিন্দা করার প্রথম সম্মান ইউরিপাইডিসের, যিনি প্লেটোর অগ্রগামী। দাস প্রথার বর্ণনা করে তিনি বলেছিলেন, "ওই অমঙ্গলের মূর্তি।" নিজের বিয়োগান্ত নাটকে ওই কুপ্রথার ছবি তিনি দর্শকের সামনে তুলে ধরেন। কয়েক শত বছর পরে গ্রীসের স্টোইক সম্প্রদায় ওই প্রথার নিন্দাবাদ করেন। দাসত্বের প্রকৃত চেহারাটা গ্রীকদের চোখে প্রথমেই ধরা পড়ে। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ওই রীতি বন্ধ হয় নি অনেকদিন পর্যন্ত। বাইবেল এ সম্বন্ধে আপত্তি তোলে নি ও স্টোইকদের দু'হাজার বছর পর, একশ বছর আগে, আমেরিকা ওই প্রথা মেনে নেয়।

এথেন্সে দাসদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা হত। চতুর্থ শতকের গোড়ায় এথেন্স পরিভ্রমণকারী এক পর্যটক লিখেছেন, "এখানে দাসদের প্রহার করা নিয়মবিরুদ্ধ। রাস্তায় দাসেরা তোমার যাবার জন্য পথ ছেড়ে দাঁড়ায় না। পোষাক দেখে কে দাস, কে নয় চেনা যায় না। তাদের দেখতে অন্য সকলেরই মত। তাদের থিয়েটারে যাওয়াতে বাধা নেই। সত্য বলতে কি

এথেন্স দাস ও স্বাধীন মানুষের মধ্যে একরকম সাম্যের সৃষ্টি করেছে।” রোমে দাসেরা রাষ্ট্রের দিক থেকে একটা ভয়ের কারণ হয়েছিল, গ্রীসে সে ভয় দেখা দেয় নি। এথেন্সে ভয়াবহ দাস-যুদ্ধ ও দাস-বিপ্লব কখনও ঘটেনি। রোমে “ক্রুশ বিদ্ধ করা” ছিল দাসেদের দণ্ড। এথেন্সে এমন কোন দণ্ডই ছিল না। তারা দাসেদের ভয় করে চলত না।

এথেন্সের গৌরবময় যুগে এথেন্সবাসী ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন। কি করতে হবে বা কি ধারায় চিন্তা করতে হবে এ কথা তাদের কেউ বলে দিত না। চার্চ ছিল না, রাজনৈতিক দল ছিল না, ছিল না শক্তিশালী ব্যক্তিস্বার্থ বা শ্রমিক সঙ্ঘ। গ্রীক-স্কুলে সাহায্য দাতাদের কোন দাবি ছিল না, আবার রাষ্ট্রের আর্থিক সাহায্যের জন্য রাষ্ট্রের নির্দেশ মেনে চলার প্রয়োজন ছিল না। ফলে তাদের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হত—স্বাধীন হওয়ার এ দাম সকলকেই দিতে হয়। শক্তিশালী এথেন্সবাসী ওই দায়িত্ব গ্রহণে সক্ষম ছিল। চিন্তাশীল এথেন্সবাসী, স্বাধীনতার অর্থ বুঝত। তারা বুঝত দেশ স্বাধীন বলেই তারা স্বাধীন নয়, তারা মুক্ত বলেই তাদের দেশ মুক্ত।

দ্বিতীয় খৃস্টাব্দে একজন রোমীয় গ্রীস পরিভ্রমণকালে বলেছিলেন, “এথেন্স ছাড়া অন্য কোন রাষ্ট্র গণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে সমৃদ্ধি লাভ করে নি। এথেন্স-বাসীর মধ্যে একটা স্বাভাবিক আত্মসংযম ও আইন-আনুগত্য আছে।” তিনি ঠিকই বলেছিলেন। এইটাই সেখানের শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল। তারা এমন মানুষ তৈরি করতে চেয়েছিল যারা আত্ম-শাসন, আত্ম-সংযম ও আত্ম-বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে একটা স্বপরিচালিত রাজ্য রক্ষা করতে পারবে। প্লেটো যে সর্বাঙ্গসুন্দর শিক্ষার কথা বলেছেন “তা এমন নাগরিক তৈরি করবে যারা শাসন করতে ও শাসন মেনে চলতে জানবে।” পেরিক্লিস বলেছিলেন, “আমাদের গণতন্ত্র সম্পূর্ণ স্বাধীন। আমরা নিজেদের ব্যাপারে এতখানি লিপ্ত থাকি না যাতে রাষ্ট্রের কাজে বাধা পড়ে। আত্মিক স্বাধীনতায় ও পূর্ণ আত্ম-বিশ্বাসে আমরা কারও থেকে কম নই। যারা দশ ও দেশের কাজ থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখেন তাদের আমরা কোনও মূল্য দিই না।” এই রকম অকেজো লোককে বলা হত “আইডিওট” যার থেকে ইংরাজী ইডিয়ট কথাটি এসেছে।

গিলবার্ট মারে ( Gilbert Murray ) যাকে বলেছেন “প্রয়াসহীন বর্বরতা” তার মধ্য থেকেই এথেন্স স্বাধীনতা ও উৎকর্ষতার উচ্চ শিখরে উঠতে পেরেছিল। এই বর্বরতা তাদের চারিদিক থেকে ঘিরেছিল, সেই বর্বরতার

মালিন্য ও নৃশংস মূর্তিকে তারা ভয় করত। প্রয়াসহীনতার মধ্য থেকে যে ভাল জিনিস লাভ হয়, তা তারা চাইত না। প্লেটো বলতেন, "কঠিন কাজের মধ্যেই কল্যাণ" এবং তাঁর বহু বছর আগে, একজন কবি লিখেছিলেন—

Before the gates of Excellence
the hi h gods have placed sweat.
Long is the road thereto
and steep and rough at the first,
But when the might is won,
then is there ease.

গ্রীকরা কবে ও কখন ওই দুরারোহ রাস্তা বেছে নিয়েছিল আমরা জানি না। কিন্তু ওই পথে তারা সেইসব আচার-ব্যবহার ত্যাগ করতে পেরেছিল যা মানুষকে বর্বরতার নোংরামি ও নৃশংস জীবনের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখে। ওই পথে তারা বহুদূর এগিয়ে যেতে পেরেছিল। একটা দৃষ্টান্ত থেকে তারা কি পথ বেছে নিয়েছিল তার পরিচয় পাওয়া যাবে। ঠিক জানা নেই কত শত-সহস্র বছর আগে বিজেতা বিজয়ফলক বা স্তম্ভের মধ্য দিয়ে তার কীর্তি স্মরণীয় করার উপায় বার করে। ইজিপ্টে প্রচুর পাথর পাওয়া যায়, সেখানে তাই শিলাফলকে লেখা হত বিজয়ীর কীর্তিগাথা। আরও পূর্বে যেখানে বালুকাময় দেশের সুরু সেখানে কাটামুণ্ড দিয়ে বিজয়-স্তম্ভ রচনা করা হত। হাড় সহজে ক্ষয়ে যায় না, অতএব ওই স্তম্ভগুলির স্থায়িত্ব কম ছিল না। কিন্তু গ্রীসে বিজয়ফলক যদি বা রচিত হত, তা হত কাঠের তৈরি ও সেগুলির সংস্কার করা ছিল নিয়ম-বিরুদ্ধ। বিজেতা ফলক স্থাপন করবার সময়ই জানতেন যে কিছুদিনের মধ্যেই তা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বন্ধুর, দুরারোহ রাস্তায় যেতে যেতে গ্রীকরা অনেক কিছু শিখেছিল, তারা জানত আজকের বিজয়ী কাল বিজিত হবে। যা ক্ষণস্থায়ী তার স্থায়ী নিদর্শন তৈরি করার কোন অর্থ হয় না।

একটি পুরাতন গ্রীক শিলালিপিতে লেখা আছে যে মানুষের আদর্শ হওয়া উচিত "তার মধ্যের বর্বরতাকে আয়ত্তে আনা ও পৃথিবীতে শান্ত-সুস্থির জীবনধারার সৃষ্টি করা।" এরিস্টটলের মতে নগরের পত্তন হয় মানুষের নিরাপত্তার জন্য। কিন্তু দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল মানুষ যাতে সেখানে সৎ জীবন আবিষ্কার করতে পারে ও তাকে গ্রহণ করতে পারে। এই আদর্শকে বাস্তবে পরিণত হতে দেখেছিলেন পেরিক্লিস। তাঁর কথায় এথেন্স

মুক্তির জন্য, চিন্তার জন্য ও সৌন্দর্যের জন্য দাঁড়িয়েছিল কিন্তু এর কোনটার মধ্যেই আতিশয্য প্রকাশ পায় নি। গ্রীক সৌন্দর্যের মধ্যে আড়ম্বর ছিল না। গ্রীকেরা সৌন্দর্য ভালবাসলেও, সৌন্দর্যের বিলাস পছন্দ করত না। তারা অন্তরের জিনিস ভালবাসলেও কর্ম-পরাঙ্মুখ ছিল না। চিন্তা কাজের বাধা হয়ে দাঁড়াত না, বরং তার রাস্তা খুলে দিত। ধনীরা ঐশ্বর্য দেখাত না। দারিদ্র্য লজ্জার বিষয় ছিল না। তাদের মুক্তির পিছনে ছিল সহজ আইন-আনুগত্য, শুধু লিপিবদ্ধ আইনের আনুগত্য নয়, যে আইন কখনও লেখা হয়নি তাকে স্বীকার করে নেওয়া। ক্ষমা, সহানুভূতি, স্বার্থহীনতা ইত্যাদি এমন সব গুণের তারা চর্চা করত যা আইন করে চালান অসম্ভব।

সত্যই বড়, মহৎ ও স্থায়ী প্রজাতন্ত্র যদি গড়তে চাই তবে এইভাবে চলতে হবে। এথেন্সকে আমাদের আদর্শ-প্রতিদ্বন্দ্বী সহর হিসাবে বিবেচনা করতে হবে, যে সহরে শত শত বছর ধরে একের পর এক বহু প্রতিভার জন্ম হয়েছে। টাকা খরচ করে প্রতিভা তৈবি কবা যায় না। গ্রীকদেব শিক্ষা-পদ্ধতির আদর্শটা আমাদের গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের চোখ ছিল ব্যক্তিদেব উপব আর আমরা চাই কোটি কোটি ছাত্র। অল্প কিছুদিন হল এ বিষয়ে আমাদের নূতন জ্ঞান হয়েছে। আমরা যা করতে চেয়েছি, দেশের ১৭ কোটি লোকের মধ্যে প্রত্যেকটি যুবককে শিক্ষিত করে তোলা, ইতিহাসে এর আগে তা আর কেউ চেষ্টা করে নি। বিবাট আদর্শ সন্দেহ নেই। কিন্তু শিক্ষার এই যে রাশিকৃত তার সমস্যাটাও এখন আমরা বুঝতে পারছি। এতদিন অতলান্তিক থেকে প্যাসিফিক পর্যন্ত একই শিক্ষাধারার প্রসার আমাদের মনে শঙ্কার সৃষ্টি করে নি। কিন্তু এখন যেন অস্বাচ্ছন্দবোধ করছি, দেখতে পাচ্ছি শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্র থাকলেও ব্যক্তির অভাব ঘটছে। একই ছাঁচে ঢেলে শিক্ষা দেওয়ার পরিণামটা বুঝতে পারছি কাবণ এখানে মানুষ নিয়ে কারবার, যন্ত্র নিয়ে নয়।

এই অবস্থায় গ্রীকদের দিকে দৃষ্টি ফেরালে আমাদের অ-লাভ হবে না। এথেন্সবাসী তাদের বিপদে ঘেরা জগতে স্বাধীন মানুষের একটা জাতি গড়ে তুলতে চেয়েছিল। তারা চেয়েছিল যাতে প্রত্যেকটি মানুষ দায়িত্ব নিতে পারে ও সেইভাবেই তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল। তারা পৃথকভাবে প্রত্যেকটি বালকের কথা ভাবত, যারা হবে এথেন্সের ভবিষ্যৎ নাগরিক ও যারা এথেন্সের নিরাপত্তা ও গৌরব রক্ষার দায়িত্ব নেবে। পেরিক্লিসের কথায় "প্রত্যেকে জীবনের সুযোগ ও পরিবর্তনের জন্য সর্বতোভাবে প্রস্তুত

থাকত।” গ্রীসে শিক্ষা ছিল ব্যক্তিগত ব্যাপার। প্রকৃত শিক্ষার জন্য একটি বালককে গান-বাজনা শিখতে হত, কাব্য পাঠ করতে হত। এ কথাও মনে রাখতে হবে সে দেশে নানারকম বাদ্যযন্ত্র ছিল ও কবি একজন ছিলেন না, যদিও হোমার ছিল প্রধান পাঠ্য পুস্তক।

এ শিক্ষা সর্বসাধারণের জন্য নয়। এই শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ সহজ প্রবৃত্তির চালনায় একই পথ ধরে না। এইভাবে যখন এথেন্সের ছেলে-মেয়ে শিখতে ও বাঁচতে চেয়েছিল তখন আমাদের লক্ষ লক্ষ শিশু ঠিক একই সময়ে টেলিভিশানে ঠিক একই জিনিস দেখে সময় কাটায়। যে কারণেই হ'ক আমরা সব রকম পার্থক্যকে জীবন থেকে বাদ দিতে চাইছি। প্রত্যেকের মন ও চিন্তাকে আমবা একই ছাচে ঢেলে গ্যেটের ভাষায় “মারাত্মক একঘেয়েমিব মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখছি।' গ্রীকরা এ পথে চলে নি।

জগতের বিখ্যাত ঐতিহাসিকদের অন্যতম থুসিডাইড্‌স পেরিক্লিস যুগের যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে আত্ম-বিশ্বাসী ব্যক্তিদের গড়া একটি রাষ্ট্রের ছবি ফুটে উঠেছে। এ মানুষগুলি কেউ কারও প্রতিধ্বনি বা নকল নয়, তারা তাদের নিজেদের কাজে স্বাধীন, কিন্তু সেই সঙ্গে যেখানে সকলের কল্যাণ সেখানে দলবদ্ধ। দেশেব প্রতি তাদের ভালবাসা এত গভীর যে তার সেবায় নিযুক্ত হওয়াই তাদেব প্রধান লক্ষ্য ছিল। একি শুধু আদর্শমাত্র। কিন্তু আদর্শের শক্তি অশেষ। আদর্শ একটা যুগের উপর তার ছাপ রেখে যায়। আদর্শ বড হলে মানুষকে সে বড করে তোলে, ছোট হলে তাকে ছোট করে। ক্ষুদ্র আদর্শের লোক জীবন-যুদ্ধে হেরে গিয়ে বিস্মৃতির তলে তলিয়ে যায। দু' হাজাব পাঁচশ' বছর ধরে গ্রীক আদর্শ বেঁচে আছে কারণ সে শক্তি তার ছিল।

এই পারমাণবিক যুগে যখন ভবিষ্যৎ মানুষকে আরও কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে, তখন গ্রীক ও বোমান সভ্যতার অনুশীলন বন্ধ করা কি উচিত? এখানে মনে বাখা দবকাব যে বর্বর জাতি পরিবৃত হয়েই গ্রীক ও রোমান সভ্যতা বেঁচে ছিল। শুধু বেঁচে থাকাই নয়, যখন তাদের মধ্যে শৈথিল্য ও আলস্য দেখা দিল তখন তাদের পতনও ঘটল। সেটাও শিক্ষার ব্যাপার। শেষকালে তারা স্বাধীনতার চেয়ে নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ চেয়েছিল বেশী, ফলে তারা নিরাপত্তা, স্বাচ্ছন্দ ও স্বাধীনতা সব হারাল।

এর থেকে আমাদের কি কিছু শিক্ষা করবার নেই? একি সত্য নয় যে আমাদের শিক্ষাতেও শৈথিল্য ও আলস্য দেখা যাচ্ছে, কঠিন পরিশ্রমের

অভাব ঘটছে শুধু যার মধ্য দিয়ে আমরা চিন্তা জগতে প্রবেশ করতে পারি? রাজনৈতিক জীবনেও কি ওই একই শৈথিল্য ও আলস্যের পরিচয় নেই? এথেন্সবাসী যখন শুধু রাষ্ট্র থেকে পেতেই চেয়েছিল তাকে কিছু দিতে চায়নি, যখন স্বাধীনতার অর্থ হয়ে দাঁড়াল দায়িত্ব-মুক্তি, তখনই তারা স্বাধীনতা হারাল ও সে স্বাধীনতা আর ফিরে পেল না। এর থেকেও কি আমাদের শিক্ষা করবার কিছু নেই?

সিসেরো ( Cicero ) বলেছিলেন, "ইতিহাসে অজ্ঞ হয়ে থাকার অর্থ শিশু হয়ে থাকা।" সান্তায়ানা ( Santayana ) বলেছিলেন, "যে জাতি ইতিহাস পড়ে না সে জাতির জীবনে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে।" গ্রীক ইতিহাস পড়ে আমরা জানতে পারি স্বাধীনতা কি করে অর্জন করা যায়, কি ভাবেই তা আমরা হারাই। আরও বড়, আমরা স্পষ্ট জানতে পারি স্বাধীনতা কি? পৃথিবীর প্রথম স্বাধীন জাতি ভবিষ্যৎ জাতিদের শত শত বছরের ওপার থেকে স্বাধীন হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে। গ্রীস সভ্যতার শিখরে উঠেছিল আয়তনে বড় ছিল বলে নয়, গ্রীস ছোট দেশ; সম্পদশালী বলে নয়, গ্রীস গরীব দেশ ছিল; তার লোকের মধ্যে নানারকম গুণের প্রকাশ ঘটেছিল বলেও নয়—প্রাচীন রাজ্যে এমন গুণের প্রকাশ অন্যত্র দেখা গিয়েছে কিন্তু তারা কিছু আমাদের জন্য রেখে যায় নি; গ্রীকদের বড় হবার কারণ তার আত্মিক শক্তি যা মানুষকে মুক্ত করে।

প্লেটো ওই শক্তি কি তার ব্যাখ্যা করেছেন। "স্বাধীনতা আইন বা সংবিধানের কীর্তি নয়। একমাত্র সেই স্বাধীন ও মুক্ত যে নিজের মধ্যে দৈবী শৃঙ্খলার পরিচয় দেখেছে, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার ও নিজের মূল্য বোঝার একটা সত্য মাপকাঠি খুঁজে পেয়েছে।" সত্য আদর্শ গ্রীকদের মধ্যে দেখা গেছে তাই তার আলো কখনও নেভেনি।

ডেমস্থিনিস্ বলেন, "যারা জ্ঞানী তারা ইতিহাসের কাছ থেকে যে কোন সময়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে সক্ষম।"

# মনের উপর মাদকদ্রব্যের প্রভাব

**অলডাস্ হাক্স্‌লি**

ইতিহাসের গতিপথে দেশ ও ধর্মের জন্য যত মানুষ প্রাণ দিয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী মানুষ জীবনদান করছে তাদের পানাসক্তি ও মাদকপ্রীতির জন্য। এই শত-সহস্র মানুষের মধ্যে বিশুদ্ধ এ্যালকোহল ও প্রাণ-স্নিগ্ধ-করা মাদকদ্রব্যের জন্য যে গভীর আকাঙ্ক্ষা দেখা গেছে তা তাদের ভগবদ্‌প্রীতি, গৃহ-সংসারে আসক্তি ও পুত্রকন্যার প্রতি ভালবাসার চেয়ে বড়—বোধ হয় তাদের প্রাণের চাইতেও বড়। স্বাধীনতার জন্য প্রাণদানের আহ্বানে সাড়া জাগে নি, বরং দাসত্বপীড়িত মৃত্যুর কামনা বেশী প্রকাশ পেয়েছে। এ এক রহস্য, পরস্পর বিরোধীধর্মী স্বভাবের অদ্ভুত পরিচয়। কেন এত মানুষ সম্পূর্ণ নৈরাশ্যজনক লক্ষ্যের জন্য অত বেদনাদায়ক ও হীনতাপূর্ণ মৃত্যু বরণ করে?

এই জটিল প্রশ্নের কোন সরল জবাব নেই। মানুষ অত্যন্ত জটিল সৃষ্টি। একই সঙ্গে মনের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে তার বাস। ব্যক্তি মাত্রই স্বতন্ত্র, অদ্বিতীয়। একটি মানুষ তার সমগোত্রীয় অন্যান্য মানুষের থেকে নানাভাবে পৃথক। আমাদের কাজের পিছনে যে উদ্দেশ্য বা ইচ্ছা-অভিপ্রায় থাকে সেগুলি সরল ও নির্ভেজাল নয়। যে কোন কাজের একটি মাত্র উৎস খোঁজা বৃথা। একটি বিশেষ শ্রেণী বা গোষ্ঠীর মানুষের ব্যবহারের মধ্যে একটা ছক খুঁজে পাওয়া যেতে পারে কিন্তু ওই ছকে-বাঁধা কার্যধারার পিছনেও নানা কারণের সমাবেশ থাকে।

কতকগুলি মানুষের পানাসক্তি জৈব-রাসায়নিক ক্রিয়ার ফল। (টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রোজার উইলিয়ামস্ প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে কতকগুলি ইঁদুর জন্ম থেকেই নেশাখোর আবার কতকগুলি ইঁদুর পানীয় স্পর্শ করে না।) অন্যান্য ক্ষেত্রে বাল্য ও যৌবনের দুঃখ-পীড়নে ও তার প্রতি বিকারগ্রস্ত কতকগুলি প্রতিক্রিয়ার ফলে মানুষকে পানাসক্ত হয়ে উঠতে দেখা গেছে। অনেকে আবার অনুকরণ ও সঙ্গলাভের লোভে ওই ধীর মৃত্যুর পথ বেছে নিয়েছে। এদের মনে হয়েছে নেশার সঙ্গী হয়ে তারা সামাজিক হতে পারে, দলের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে। কিন্তু অসৎ, অশিক্ষিত ও মূর্খের দলে পড়লে সুস্থ, সুসংবদ্ধ জীবনে সর্বনাশ নেমে

আসতে দেরি হয় না। এই সঙ্গে ভুললে চলবে না যে অনেকে নেশা করে দৈহিক কষ্ট কমাবার জন্য। এস্‌পিরিন নূতন আবিষ্কার। কিন্তু ভিক্টোরিয়ান যুগের শেষ পর্যন্তও দৈহিক যন্ত্রণা কমানোর জন্য সভ্য মানুষ নানাপ্রকার মাদকদ্রব্য ব্যবহার করে এসেছে। দাঁতের ব্যথায়, বাত ও স্নায়ুরোগের বিকারে মানুষ অনেক সময় আফিম ব্যবহার করেছে।

"মাথার অসহ্য যন্ত্রণা থেকে মুক্তির" জন্য ত্য কুইন্‌সি আফিম ধরেন। আফিম খাওয়ার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে "জীবনীশক্তির অতি নিম্নস্তর থেকে সে কী উত্থান! এ কী দিব্যজ্ঞান!" ত্য কুইন্‌সি শুধু যে বেদনামুক্ত হতেন তাই নয় "অপার স্বর্গীয় আনন্দে মনের অবনত ভাব ঘুচে গিয়ে সেখানে উচ্ছ্বাসের প্রকাশ ঘটত।···যে সুখ নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে এত মতদ্বৈধতা, তার গুপ্ত রহস্য মনে হল এখানেই নিহিত, সহসা আবিষ্কৃত সেই মহাসুখ!"

"পুনর্জীবন লাভ, দিব্যজ্ঞান, ঐশ্বরিক আনন্দ", ত্য কুইন্‌সির কথাগুলি আমাদের আপাত-বিরোধী ওই রহস্যের মাঝখানে টেনে নিয়ে যায়। মাদক-প্রীতি ও অতিরিক্ত মদ্যপান মানসিক বিকার বা জৈব-রাসায়নিক ক্রিয়ার ফল নয়, বেদনা-মুক্তি বা অসৎ সমাজের সঙ্গে মানিয়ে চলার পরিণতিও নয়। এর মধ্যে একটা আধ্যাত্মিক সমস্যার প্রশ্ন আছে, এমন কি এর মধ্যে ঈশ্বরতত্ত্বের ইঙ্গিত পাওয়াও অসম্ভব নয়। উইলিয়াম জেমস্ তাঁর "Varieties of Religious Experience" বইএ পানাসক্তির আধ্যাত্মিক দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন:

মানুষের প্রকৃতিতে যে অতীন্দ্রিয় প্রবণতা আছে, মাদকদ্রব্য তাকেই বিশেষভাবে প্ররোচিত করে, ক্রিয়াশীল করে তোলে। অন্যদিকে নিরুত্তাপ তথ্য ও সংযত, অপ্রমত্ত অবস্থার নীরস আত্মসমালোচনা মানুষের ওই গুণগুলিকে বিনষ্ট করে। সংযম সঙ্কুচিত করে, বিচার-বিভেদ করে ও বাধার সৃষ্টি করে। প্রমত্ততা মনের প্রসারতা ঘটায়, বিভেদ লোপ করে ও ব্যবধান ঘুচিয়ে দেয়। সত্য বলতে কি প্রমত্ত অবস্থা মানুষের মনে স্বীকৃতির ভাব জাগানোর পক্ষে সবচেয়ে বড় যন্ত্র। ওই অবস্থা মাদকদ্রব্যের সেবককে বস্তুর উত্তাপহীন বহির্ভাগ থেকে সমুজ্জ্বল অন্তর্কেন্দ্রে পৌঁছে দেয়, তাকে সত্যের সঙ্গে একাত্ম করে। কেবলমাত্র মানসিক বিকার পানাসক্তির কারণ নয়। দরিদ্র ও অশিক্ষিতের জীবনে মাদকতা সঙ্গীতের ও সাহিত্যের স্বাদ মেটায়। যে প্রমত্ততা পরিণতিতে জীবনকে বিষিয়ে তোলে, তারই প্রথম অবস্থায় জীবনের এমন নিগূঢ় রহস্য ও ট্র্যাজেডির পরিচয় পাই যাকে অতি উৎকৃষ্ট

জিনিস বলে স্বীকার করে নিতে আমাদের দেরি হয় না। প্রমত্ত-চেতনা একটা আত্মকেন্দ্রিক অনির্বচনীয় চেতনার অংশ। প্রমত্ততার বিচার ওই বিরাট চৈতন্যের মাপকাঠিতে করা দরকার।

মাদকতার সঙ্গে মনের অতীন্দ্রিয়তা ও তার পূর্ব অবস্থার তুলনা শুধু উইলিয়াম জেমস্ই করেন নি। "ফসল কাটার" পর্বদিনে ইহুদীদের ব্যবহার দেখে লোকে বলত, "তারা নূতন মদ খেয়েছে"।

পিটার এই ভুল ধারণা ভেঙে দেন, "আপনাদের এ অনুমান ভুল দিনের এই দ্বিতীয় প্রহরে এরা পানমত্ত হয় নি। ধর্মগুরু জোয়েলও এই অবস্থার কথা বলেছেন। ঈশ্বরের এই দৈববাণী ছিল, শেষ দিনে আমার আত্মার স্ফূর্তি আমি মানব-দেহের উপর ঢেলে দেব।"

ঈশ্বর-প্রমত্ততার সঙ্গে পানোন্মত্ততার মিলের কথা শুধু সংযমী মানুষের শুষ্ক সমালোচনাতেই স্থান পায় নি। অনির্বচনীয়কে প্রকাশ করার চেষ্টায় বড় বড় অতীন্দ্রিয়বাদী ওই একই উপমা দিয়েছেন। "আভিলার" সেণ্ট টেরেসা বলেছেন, তাঁর "কাছে আত্মার কেন্দ্রস্থল একটি সুরার ভাণ্ডার। ঈশ্বরের ইচ্ছামত আমরা সেখানে প্রবেশ করতে পাই ও তাঁর দয়ায় সুস্বাদু মদিরা পান করে মাতাল হই।"

প্রত্যেক পূর্ণাঙ্গ ধর্মেরই বিভিন্ন স্তর আছে, এই বিভিন্ন স্তরে তার প্রকাশ। ধর্ম অনেক ক্ষেত্রে জগত ও তার প্রশাসন সম্বন্ধে কতকগুলি বিমূর্ত ধারণার সমষ্টি। অন্যত্র ধর্ম কতকগুলি আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কলাপ মাত্র। এই গতানুগতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমরা কতকগুলি প্রতীকের পূজা করি ও ওই প্রতীক-পূজার মধ্য দিয়ে বিশ্ব-সংহতিতে আমাদের বিশ্বাসের প্রকাশ ঘটে। এই পূজার মধ্যে আমাদের মনের যে ভয়-ভক্তিব প্রকাশ দেখি, সেই ভয়-ভক্তিকেও অনেক সময় ধর্মের আঙ্গিক বলা হয়।

সবশেষে ধর্মকে আমরা একপ্রকার অনুভূতি বা অন্তর্দৃষ্টি হিসাবে দেখে থাকি। এই অন্তর্দৃষ্টি বস্তুজগতকে একটিমাত্র দৈবনীতির অধীনে চলতে দেখায়। ফলে সকল বস্তুর মধ্যে আমরা একটা ঐক্য খুঁজে পাই। হিন্দু ধর্ম-বিশ্বাসে "তুমিই সেই বস্তু"র উপলব্ধি এই একই জিনিস। ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার এ একটা অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা।

সাধারণ জাগ্রত-চেতনা বেশীর ভাগ সময়ে আমাদের মনের একটা প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য অবস্থা। কিন্তু এই জাগ্রত চেতনাই আমাদের একমাত্র চেতনা নয় ও সর্ব ক্ষেত্রে জ্ঞানলাভের পক্ষে শ্রেষ্ঠ চেতনাও নয়।

সাধারণ আত্মজ্ঞান ও সাধারণ ধারণাপদ্ধতিকে ছায়াবাদী যোগী যতই অতিক্রম করতে পারেন, ততই তাঁর দৃষ্টির প্রসার ঘটে, জীবনের অতল রহস্যের গভীরে তাঁর দৃষ্টি গিয়ে পড়ে।

দুই ভাবে এই অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার বিশেষ মূল্য আছে। প্রথমত, ওই অভিজ্ঞতার ফলে আমরা নিজেকে ও জগতকে আরও ভাল করে বুঝতে পারি। দ্বিতীয়ত, ওই অভিজ্ঞতা আমাদের আত্ম-কেন্দ্রিকতা ঘুচিয়ে আমাদের বেশী সৃষ্টিধর্মী করে তোলে।

একজন মহৎ ধর্মপ্রাণ কবি লিখেছেন, "যে ধর্মভ্রষ্ট মানুষ নরকে দণ্ডিত হয়েছে সে কলুতে বাঁধা ঘর্মাক্ত বলদের চেয়েও নিকৃষ্ট। পৃথিবীর মানুষ শুধু কাজের চাকায় বাঁধা ঘর্মাক্ত জীব, তার চেয়ে আর নিকৃষ্ট নয়।"

দুঃখের বিষয় আমাদের অবস্থাটাও কিছু কম নয়। আমাদের আত্মপ্রেম পৌত্তলিকতার পর্যায়ে গিয়ে পড়ে। অথচ আমরা আমাদের অত্যন্ত ঘৃণাও করে থাকি—ব্যক্তি হিসাবে আমরা নিজেদের কাছে বিরক্তিকর ভাবে একঘেয়ে। আত্ম-পূজার অরুচির সঙ্গে আমাদের সকলের মধ্যেই আপন ব্যক্তিত্বের কারাগার থেকে মুক্তি পাবার জন্য, নিজেকে ছাড়িয়ে ওঠার জন্য, কখনও জাগ্রত, কখনও সুপ্ত একটা আবেগ ও গভীর বাসনা দেখা যায়। এই আবেগ ও বাসনা থেকেই অতীন্দ্রিয়তত্ত্বের, অধ্যাত্মচর্চার ও যোগের সূচনা হয়েছে। আবার ওই বাসনাই আমাদের মদ ও মাদক সেবার প্রেরণা জুগিয়েছে।

আধুনিক ঔষধ-বিজ্ঞান অনেকগুলি সাংশ্লেষিক ও রাসায়নিক ঔষধের উদ্ভাবন করেছে। কিন্তু মনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রকৃতির যে দান তার বাইরে নূতন কিছু আবিষ্কার করতে পারে নি। অনেক গাছগাছড়ার ঔষধ আছে যা মনে প্রশান্তি আনে, হাস্যরসের উদ্রেক করে, সুখানুভূতি জাগায়, বিশেষ দৃষ্টি খুলে দেয়, কিম্বা উত্তেজনার সৃষ্টি করে। কিন্তু এই ঔষধগুলি আমরা বহু বছর ধরে ব্যবহার করে আসছি।

অনেক সমাজে সভ্যতার বিভিন্ন পর্যায়ে, ঈশ্বর-প্রমত্ততার অভিজ্ঞতার সঙ্গে সুরাপানের মাদকমদির অবস্থার মিল করার চেষ্টা হয়েছে। প্রাচীন গ্রীসদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্মে সুরার নির্দিষ্ট স্থান ছিল। গ্রীকদের আসব-দেবতা ব্যাকাস, যিনি ডাওনিসস্ নামেও পরিচিত, তিনি দেবতা হিসাবেই গণ্য হতেন। ভক্তেরা তাঁকে সম্বোধন করত "ত্রাণকর্তা" বা "সুরাদেবতা" বলে।

"ফসল কাটার" উৎসবে অতি প্রাকৃতের অভিজ্ঞতা ও আঙুর রসের

আস্বাদ যেমন মিশে থাকে, উপরের শেষ নামটিতেও তেমনই একটি মিশ্রণ ঘটেছে। ইউবিপাইডিস লিখেছেন, "ঈশ্বররূপে অবতীর্ণ ব্যাকাস, সুরারূপে অন্যান্য দেবতার কাছে নিবেদিত হতেন। এই নিবেদনেব ফলে মানুষ উপকৃত হত।" দুঃখের বিষয় তাব অনিষ্টও কম হত না। যে সুরাপান আপন ব্যক্তিত্বকে অতিক্রম কবাব, নিজেকেও ছাডিযে যাওয়াব স্বর্গীয় সুখভোগ সম্ভব কবে তোলে, অশেষ দুঃখেব মধ্য দিযেই শেষে মানুষকে তাব দাম দিতে হয।

আইন করে মদ ও মাদকেব ব্যবহার বন্ধ করা যায়। কিন্তু সেই আইনকে কাজে খাটান আব এক কথা ও তাব থেকে মঙ্গলেব চেযে অমঙ্গলই বেশী ঘটে। অন্যদিকে এ বিষযে সম্পূর্ণ উদাবতা আবও অনিষ্টকব। ইংলণ্ডে আঠার শ' শতাব্দীব প্রথম দিকে পানীযেব ব্যবহাব অবাধ ছিল—"এক পযসায মাতাল, দু' পযসায পাঁড-মাতাল"—এই নীতিব ফলে সমাজ দুর্নীতিতে ছেয়ে গিযেছিল। এব এক শতাব্দী পরে শিল্প-বিপ্লবে বলি হওযা মানুষ আফিমের নেশায নিজেদেব দুরবস্থাব কথা ভুলতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু মত্ততা, অসুস্থতা ও অকাল-মৃত্যুব মধ্য দিযে নেশাব দাম তাদেব ভাল ভাবেই দিতে হযেছিল।

আধুনিক সকল সভ্য সমাজ পানীয ব্যবহাব সম্বন্ধে একটা মাঝামাঝি নীতি মেনে চলে—আইন কবে সুরাপান সবাসবি বন্ধ করা হয না আবাব তাব অবাধ ব্যবহারও যাতে না ঘটে তার জন্য ব্যবস্থা নেওযা হয়। মদের উপর চডা হাবে শুল্ক বসান তার ব্যবহাবকে সংহত কবাবই একটি উপায। কোনও কোন মাদকদ্রব্য ডাক্তারের অনুমতি ছাডা ব্যবহার কবতে দেওয়া হয না। এইভাবে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা হযেছে কিন্তু সেই চেষ্টা যে সর্বত্র সফল হযেছে এমন কথা বলা চলে না। নিজের আত্ম-কেন্দ্রিক জগতটাকে অতিক্রম করাব অপরিসীম চেষ্টায অতীন্দ্রিয সাধকের দল পানাসক্ত হয, নানারকম পাপ কাজ করে ও অনেক দুর্ঘটনা ঘটায যা স্বাভাবিক অবস্থায বোধ করা অসম্ভব হত না।

তবে তাদেব এই পরিণতিটাকেই কি চিরকালের জন্য মেনে নিতে হবে? কয়েক বছর আগে পর্যন্ত এ ছাডা আর উপায় ছিল না। কিন্তু আজ জৈব-রাসায়নিক ও ঔষধ-বিজ্ঞানেব ক্ষেত্রে কয়েকটি নূতন আবিষ্কারেব ফলে অন্য আর একটি পথেরও নিশানা মিলেছে। গত সত্তর আশী শতাব্দী ধরে নিজেকে ছাডিযে ওঠার যে অ-নিপুণ চেষ্টা আমবা করে আসছি, রাসাযনিকের ব্যবহারে সেই চেষ্টাই আজ সফল হতে চলেছে।

মাদক শক্তিশালী হবে অথচ মানুষের কোনও ক্ষতি করবে না, এমন হয়তো সম্ভব নয়। কিন্তু এমন রাসায়নিক ঔষধ থাকতে পারে যার থেকে শারীরিক ক্ষতি অতি অল্পই হবে। কয়েকটি মাদকের কথা আমরা জানি যা মনের পরিবর্তন ঘটাতে পারে কিন্তু দেহ-মনের বিশেষ অনিষ্ট করে না, আমাদের মধ্যে এমন উত্তেজনার সৃষ্টি করে না যাতে আমরা পাগলের মত ব্যবহার করি, খারাপ কাজ করি। জৈব-রাসায়নিক শাস্ত্র ও ঔষধ-বিজ্ঞান তাদের জয়যাত্রা সুরু করেছে এবং অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই এমন অনেকগুলি মাদক ঔষধ সুলভ হবে বলে আশা করা যায়।

মন-পরিবর্তক মাদক সুলভ হলে কতকগুলি সমস্যা নিশ্চয় দেখা দেবে। সে বিষয়ে চিন্তা করার সময় এসেছে। প্রশ্ন হচ্ছে, এমন মাদক ঔষধ ব্যবহার করা কি উচিত হবে? কি ভাবে এর অব্যবহার ঘটতে পারে? এগুলির ব্যবহারে মানুষ কি উপকৃত ও সুখী হবে, না তারা আরও ক্ষতিগ্রস্ত ও অসুখী হয়ে উঠবে?

এই প্রশ্নগুলির নানাভাবে বিবেচনা করা দরকার। জৈব-রাসায়নিক, চিকিৎসক, মনোবিজ্ঞানবিদ, সামাজিক নৃতত্ত্ববিদ, আইন-প্রণেতা ও আইন-প্রবর্তক, সকলকেই এই প্রশ্নগুলি বিচার করে দেখতে হবে। মাদক দ্রব্য ব্যবহারের যে নীতির ও ধর্মের দিক আছে শেষে সে বিষয়েও আলোচনা করার প্রয়োজন হবে। সময় এসেছে কিম্বা আসছে যখন বিশেষজ্ঞদের একত্রিত হয়ে বসে সর্ববিধ প্রমাণ যাচাই করে কর্তব্য স্থির করতে হবে। এর জন্য কল্পনাশক্তি ও দূরদৃষ্টি চাই। ইতিমধ্যে এই বহুমুখী সমস্যার একটা প্রাথমিক বিচার করে দেখতে পারি।

গত বছর ( ১৯৫৮ সালে ) মার্কিন চিকিৎসকেরা চার লক্ষ আশি হাজার প্রেসক্রিপশনে ঘুমের ঔষধের ব্যবস্থা দিয়েছিলেন। এই প্রেসক্রিপশানগুলি যে বার বার ব্যবহার করা হয়েছিল তাতেও সন্দেহ নেই। এই ঔষধগুলি মনের অবস্থার পরিবর্তনকারী নূতন ও প্রায় নির্দোষ মাদক। সম্পূর্ণ কুফল মুক্ত না হলেও, শরীরের উপর অল্প অত্যাচারে, ঔষধগুলি প্রায় সকলেই ব্যবহার করতে পারে। এগুলির অসম্ভব জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে আমাদের মধ্যে অনেকেই আমাদের পরিবেশ ও আমাদের কাজের চাকায় জোতা "ঘর্মাক্ত কলেবর" অবস্থা বিশেষভাবে অপছন্দ করি। ঔষধগুলি মনের মধ্যে হয়তো একটা মধুর ভাবের সৃষ্টি করতে পারে না কিন্তু দুর্গতি ও সন্তুষ্টির মধ্যে যে ব্যবধান তা ঘুচিয়ে দেয়। সাধারণ নিয়মে স্নায়ুরোগ ও মানসিক

বিকারে যে লোক অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করে, তাদেরই ওই ঔষধ ব্যবহার করতে দেওয়া উচিত। কিন্তু কার্যত চিকিৎসকেরা চিকিৎসা জগতের নূতন রেওয়াজ অনুযায়ী যাকে তাকে এই ঔষধ খেতে দেন। এখানে বলে রাখা ভাল যে চিকিৎসার রেওয়াজ অনেকটা মেয়েদের মাথার টুপির ফ্যাসানের মতই অদ্ভুত। এক্ষেত্রে মানুষের জীবন নিয়ে টানাটানির প্রশ্ন থাকায় শুধু অদ্ভুতই নয়, অনেক বেশী ট্র্যাজিকও বটে। আজকাল দেখা যায় অপ্রয়োজনে কতো রোগীকে ডাক্তারেরা প্রশান্তিদায়ক ঔষধের ব্যবস্থা দেন। ফলে রোগীরাও সামান্যতম অস্বাচ্ছন্দ্যেও ওই ঔষধের আশ্রয় নেন। এটা কুচিকিৎসা ও রোগীর দিক থেকে নৈতিক অবনতির ও স্বল্পবুদ্ধির পরিচায়ক।

বিশেষ অবস্থায় স্বাস্থ্যবান লোকও তাদের অশান্ত ভাবাবেগকে সংযত করতে রাসায়নিক ঔষধ ব্যবহার করতে পারেন। রাগ দমন করা অসম্ভব হলে প্রশান্তিদায়ক ঔষধের সাহায্যে নিজেকে সংযত করা ভাল। কিন্তু সামান্যতম বিরক্তি, উদ্বেগ বা অস্থিরতা বোধ করলেই যে ঔষধের সাহাযে্য মনোভাবের পবিবর্তন ঘটাতে হবে, এটা উচিতও নয়, সুবুদ্ধির পরিচায়কও নয়। খুব বেশী উদ্বেগ বা উত্তেজনা মানুষের কার্যকুশলতা কমিয়ে দেয়। অবশ্য সামান্য উদ্বেগ উত্তেজনাতেও মানুষ ঠিকভাবে কাজ না কবতে পারে।

কিন্তু অনেক সময় উদ্বেগ ও উত্তেজনার প্রয়োজন থাকে। সে সময় যদি নিজেদের মধ্যে উত্তেজনা না বোধ করি, সন্তুষ্ট চিত্তে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকি, তবে আমাদের সঙ্কট কাটিয়ে ওঠার সম্ভাবনাও কমে যায়। এ অবস্থায় মনের দিক থেকে উত্তেজনা প্রশমন করে নিজেকে সংযত করা রাসায়নিক ব্যবহারে আত্মতুষ্টি সৃষ্টি করার চেয়ে অনেক ভাল।

এখন দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী সমাজের কথা ধরা যাক। দুভাগ্যবশত এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা কাল্পনিক নয়—সম্পূর্ণ বাস্তব। এর একটি সমাজে প্রশান্তিদায়ক ঔষধ চড়া দামে ডাক্তারের ব্যবস্থা অনুযায়ী বিক্রয় হয়। ফলে ঔষধগুলি প্রতিশক্তিশালী ও ধনী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ব্যবহারে আসে। সেখানে এই সম্প্রদায়ের লোকেদের হাতেই সমাজের নেতৃত্বের ভার ও এঁরা প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ বড়ি ব্যবহার করে আত্মতুষ্টিলাভ করে থাকেন। অন্যদিকে, দ্বিতীয় সমাজ ব্যবস্থায় প্রশান্তিদায়ক ঔষধ সহজলভ্য নয়। সেখানে সংখ্যালঘু ক্ষমতাবান নেতারা সামান্য কারণে ঔষধের আশ্রয় নেন না। তাঁরা রাসায়নিক ব্যবহার করে স্বভাবিক উদ্বেগ চেপে মনের মধ্যে কৃত্রিম প্রশান্তির

সৃষ্টি করেন না। এই দুটি সমাজের মধ্যে কোনটি জয়ী হবে? যে সমাজের নেতারা ঔষধ খেয়ে ঘুমিয়ে আছে না যে সমাজের নেতারা উত্তেজনা ও কর্ম প্রেরণার মধ্যে জেগে আছে?

এবার আর এক রকম ঔষধের কথা ধরা যাক। অল্পকালের মধ্যেই এমন ঔষধ বার হবে যা আমাদের মনে সুখের অনুভূতি সৃষ্টি করতে পারবে। এই ঔষধ খেয়ে মানুষ অত্যন্ত দৈন্য ও দুঃখের মধ্যেও সুখবোধ করবে। এক হিসাবে এমন ঔষধ ভগবানের আশীর্বাদ। কিন্তু রাজনীতির দিক থেকে বিচার করলে ওই আশীর্বাদে অনেক অভিশাপ মেশান আছে দেখা যাবে। স্বেচ্ছাচারী একনায়ক নেতার কথা ধরা যাক। সে নির্দোষ সুখদায়ক ঔষধের বড়ি সকলকে ব্যবহার করার অগাধ সুযোগ দিয়ে তাদের যে কোন অবস্থা মেনে নিতে বাধ্য করতে পারে। স্বাভাবিক অবস্থায় এ অবস্থা মেনে নিতে মানুষের আত্মসম্মানে বাধবে। স্বেচ্ছাচাবী শাসকেরা বলপ্রয়োগের সঙ্গে রাজনীতিক ও ধর্মসম্বন্ধীয় প্রচারের প্রয়োজন চিরকাল বোধ করে এসেছেন। এই হিসাবে তারবারির চেয়ে কলম বেশী শক্তিশালী। মানসিক চিকিৎসাগাবে দেখা গেছে যে দৈহিক বাধা বন্ধন ও মানসিক চিকিৎসার চেয়ে রাসায়নিক ব্যবহারে অনেক বেশী ফল পাওয়া যায়।

ভবিষ্যতে একনায়কত্ব মানুষের স্বাধীনতা কেড়ে নেবে বটে কিন্তু তার জন্য যে সুখের ব্যবস্থা করবে তা কৃত্রিম রাসায়নিক উপায়ে সৃষ্টি হলেও ব্যক্তিগত অনুভূতি হিসাবে কম বাস্তব হবে না।

সুখের সন্ধান মানুষের চিরন্তন অধিকারের অন্যতম। কিন্তু এখানে সুখের জন্য মানুষকে তার আর একটি সনাতন অধিকার, তার স্বাধীনতা হারাতে হচ্ছে।

কিন্তু ঔষধ-বিজ্ঞান বোধ হয় এক হাতে যা নেয় অন্য হাতে তা ফিরিয়ে দেয়। রাসায়নিক উপায়ে সুখানুভূতির সৃষ্টি মানুষকে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করার পথ হতে পারে। কিন্তু রাসায়নিক উপায়ে অর্জিত শক্তি ও বুদ্ধির প্রসার স্বাধীনতা রক্ষার প্রধান অবলম্বন হবে। সাধারণত আমাদের মধ্যে যে শক্তির সম্ভাবনা থাকে তার শতকরা মাত্র পনেরো ভাগ আমরা কাজে লাগাই। এই শোচনীয় কর্ম-অপটুতা আমরা কি করে কাটিয়ে উঠব?

দুটি উপায় আছে—শিক্ষার উন্নতি ও জৈব-রাসায়নিক ঔষধের ব্যবহার। বড় ছোট সকলের জন্য আমরা আরও উন্নত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারি।

কিম্বা জৈব-রাসায়নিক উপায়ে উন্নততর ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে পারি। উচ্চতর ব্যক্তিত্বের অধিকারী এইসব মানুষকে যদি উন্নততর শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয় তবে বৈপ্লবিক ফল পাওয়া যাবে। এমন কি বর্তমান ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা-ব্যবস্থাতেও তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ আমাদের বিস্ময়ের জিনিস হবে।

প্রশ্ন হচ্ছে জৈব-রাসায়নিক উপায়ে উচ্চতর ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি সম্ভব কিনা। রুশীয়দের স্থির বিশ্বাস এ সম্ভব। তারা "স্নায়বিক উত্তেজনার মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে কাজ করার ও মানুষের কর্মক্ষমতা বাড়ানর জন্য ঔষধ" আবিষ্কারের একটা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আধাআধি সময় অতিক্রম করে এসেছে। প্রাথমিক পরাক্ষা-নিরীক্ষার কাজ শেষ হয়েছে। এর ফলে দেখা গেছে নিকোটিনিক ও আসরবিক এসিডের মতন কয়েকটি ভিটামিনের প্রচুর পরিমাণ ব্যবহারে মানসিক শক্তি বৃদ্ধি হয়। এথিলিন ডাইসালফোনেট ( ethylene disulphonate ) ও এডিনোজাইন ট্রাইফস্‌ফেট ( adenosine triphosphate ) এই দুটি এন্‌জাইম ( enzyme ) বা খামিরা একসঙ্গে শরীরে ইন্‌জেকশান দিলে দেহের স্নায়ুতে রাসায়নিক রূপান্তর ঘটে।

ইতিমধ্যে কয়েকটি নির্দোষ সাংশ্লেষক মাদকের ব্যবহারে ভাল ফল পাওয়া গেছে। কারও কারও মতে ইপ্রোনিয়াজিড ( iproniazid ) আমাদের মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করে। কিন্তু এর অতিরিক্ত ব্যবহারের পরিণাম মারাত্মক। এমিনো এলকোহল আর একটি রাসায়নিক যা আমাদের দেহে এসিটিলকোলিনের ( acytelecholine ) সৃষ্টি বাড়িয়ে দেয়। এই এসিটিলকোলিন আমাদের স্নায়ু যন্ত্রের কাজে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ পর্যন্ত পরীক্ষার ফল দেখে মনে হয় খুব সম্ভব কয়েক বছরের মধ্যেই আমরা জৈব-রাসায়নিক উপায়ে নিজেদের উন্নত মানুষ করে গড়ে তুলতে পারব।

আপাতত রুশীয়দের ঔষধ-বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক অভিযানের সাফল্য আমরা কায়মনোবাক্যে কামনা করছি। মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করতে পারে এমন ঔষধ আবিষ্কার করে সোভিয়েত দেশে তার ব্যাপক ব্যবহার ঘটাতে পারলে সেখানকার বর্তমান শাসন-ব্যবস্থার হয়তো পরিবর্তন হবে। একনায়কত্বের সবচেয়ে বড় শত্রু সাধারণের বুদ্ধি-বৃত্তি ও মানসিক সতর্কতা, যা কার্যকরী গণতন্ত্রের মূল উপাদান। পশ্চিমের গণতন্ত্রেও মানসিক শক্তির উৎকর্ষতার প্রয়োজন অল্প নয়। আমাদের প্রাণধারণের সামগ্রীর অবনতির দিকে জীববিদ্যাবিদ প্রায়ই দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শিক্ষা ও ঔষধ-বিজ্ঞান হয়তো ওই অবনতির কুফল থেকে আমাদের একদিন বাঁচাতে পারবে।

রাজনৈতিক ও নৈতিক বিচারের পর এবার আমরা মন-পরিবর্তক নূতন ঔষধগুলি ধর্মের দিক থেকে যে সব সমস্যা উপস্থিত করবে তার আলোচনা করব। পূজা-অর্চনায় বহুকাল থেকে কতকগুলি মাদকের ব্যবহার প্রচলিত আছে। মনের উপর তাদের প্রভাবের কথা বিচার করলে ভবিষ্যৎ সমস্যার রূপটি কেমন হবে তার ধারণা করা যাবে। উত্তর মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের প্রদেশগুলিতে পিওট নামে যে নাগফণি পাওয়া যায় আমি তার কথা বলছি। পিওটে "মেসকালিন" নামে এক রকম মাদক আছে, যা এখন কৃত্রিম উপায়েও তৈরি করা যাচ্ছে। উইলিয়াম জেমস বলেছেন মেসকালিন "মানুষের স্বাভাবিক অতীন্দ্রিয় শক্তির বিকাশ ঘটায়" মেসকালিন মদের চেয়ে জোরাল। সবচেয়ে বড় কথা এর থেকে শারীরিক ক্ষতি হয় না ও এর ব্যবহারে সামাজিক কুফল দেখা যায় না।

পিওট দু'রকমে আমাদের মধ্যে আত্মমুক্ত উদ্বুদ্ধভাবের সৃষ্টি করে—আমাদের কাল্পনিক বা অলৌকিক অভিজ্ঞতার ভিন্ন জগতে নিয়ে যায় ও পূজার সহচর, সাধারণ সকল মানুষ ও বস্তুর দৈবী প্রকৃতির সঙ্গে একটা ঐক্য বাঁধনে বেঁধে দেয়।

মনের উপর পিওটের যা কাজ কৃত্রিম মেস্‌কালিন ও L. S. D.র (আরগটের উৎপাদ্য) সেই একই কাজ। অতি অল্পমাত্রায় ফলপ্রসূ L. S. D. এখন ইউরোপ, দক্ষিণ আমেরিকা, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রে মনোরোগের চিকিৎসকরা ব্যবহার করে দেখছেন। এই ভেষজ ঔষধ সজ্ঞান ও অধশ্চেতন মনের মধ্যে যে ব্যবধান তা দূর করে। ফলে মানুষ তার মনের নিভৃত কোটরগুলির ভিতর পর্যন্ত দেখতে পায়। কাল্পনিক এবং অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার পটভূমিতেও এই নিগূঢ় আত্মজ্ঞানের বিশেষ মূল্য আছে।

উপযুক্ত মানসিক পরিস্থিতিতে এই রাসায়নিক ব্যবহার করলে যথার্থ অলৌকিক অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। মেস্‌কালিন ব্যবহার করে আমরা শুধু বুদ্ধি দিয়ে নয় আমাদের সমস্ত সত্তা দিয়ে ধর্ম-বাক্যের সত্য রূপটি প্রত্যক্ষ করতে পারি। "প্রেমই ঈশ্বর" ও "তিনি আমাকে হত্যা করলেও আমি তাকে বিশ্বাস করব।" এইসব বাণীর প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারি।

বলা বাহুল্য যে এই অস্থায়ী প্রবুদ্ধ ভাব আমাদের মনে কোনও স্থায়ী দীপ্তি আনে না, আমাদের আচরণেও নিশ্চয় কোনও পরিবর্তন ঘটায় না। "বিনামূল্যে পাওয়া এই দয়ার দান" আমাদের মুক্তির জন্য আবশ্যকও নয়, যথেষ্টও নয়। কিন্তু যারা ঈশ্বরের দয়া কণামাত্র লাভ করেছে, তাদের কাছে

ওই অস্থায়ী মনোভাবের কিছু মূল্য আছে। রাসায়নিক মন-পরিবর্তক ব্যবহার করেই হ'ক, কিম্বা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই হ'ক, অথবা আধ্যাত্মিক ব্যায়াম বা শারীরিক কৃচ্ছ্র-সাধনের ফলেই হ'ক ওই অভিজ্ঞতা লাভ যে আমাদের মুক্তির সহায়ক তাতে সন্দেহ নেই।

ঔষধের বড়ি খেয়ে প্রকৃত আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা লাভ করতে হবে, এ কথা অনেকের পছন্দ হবে না। এদের মনে করিয়ে দেওয়া উচিত যে প্রত্যেক ধর্মমতের সন্ন্যাসী উপবাস, স্বেচ্ছাকৃত অনিদ্রা, শারীরিক পীড়ন, ইত্যাদি প্রচলিত আত্ম-নিগ্রহেব পথে যে গুণ ও ক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা কবেন তা মন-পরিবর্তক ঔষধের মতই দেহের বাসায়নিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়াব ও বিশেষ করে স্নায়ুমণ্ডলের মধ্যে পবিবর্তন ঘটায়। এক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক ব্যায়ামের ক্রিয়া-কলাপগুলিবও উল্লেখ করা যেতে পাবে। ভারতেব যোগীদের প্রাণায়াম পদ্ধতিতে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস অনেকক্ষণ বন্ধ করে বাখার শিক্ষা দেওয়া হয়। এতে রক্তে কাবরন-ডাইঅকসাইড ( carbon dioxide ) ক্রমশ ঘনীভূত হয যার পরিমাণ দেখা যায় আমাদের মনেব উপর—আমাদের চেতনার রূপেব স্তরের পবিবর্তন হয়। আবার যখন আমবা কোনও একটি ভাব বা প্রতিমূর্তিকে কেন্দ্র করে গভীব ধ্যানে বসি তখন আমাদেব প্রশ্বাস-ক্রিয়া মন্থর হয়ে যায় বা অনেকক্ষণ বন্ধ হযে থাকে। এব স্নায়ুতত্ত্ব আমাব জানা নেই।

বহু সন্ন্যাসী ও ছায়াবাদী আধ্যাত্মিক ব্যায়াম ও কৃচ্ছ্রসাধনে যাতে দেহের রাসায়নিক ক্রিয়ার হেরফের ঘটে, উদ্দেশ্যে অল্প বা দীর্ঘকালের জন্য নিভৃত বনবাস গ্রহণ করেন। সেণ্ট এন্‌থনির মত বনবাসী সন্ন্যাসীদের জীবনে বাইরের উত্তেজনা খুব কম। হেব,, জন লিলি ইত্যাদি মনোবিদেরা অল্প কিছুদিন আগে তাদের ল্যাবরেটারিতে পরীক্ষা কবে দেখিয়েছেন যে উত্তেজনাহীন সীমাবদ্ধ পবিবেশে বাস কবলে মানুষের চৈতন্যের রূপ বদলায়। তারা তাদের স্বাভাবিক সত্তাকে অতিক্রম করে হয়তো নানা রকম কণ্ঠস্বব শুনতে বা দৃশ্য দেখতে পায়। সেণ্ট এন্‌থনির রূপ দর্শনেব মত ওই দৃশ্য সাধারণত সুখকর হয় না কিন্তু কয়েকটি ক্ষেত্রে তার সৌন্দর্য স্বর্গীয়।

দৈহিক রাসায়নিক ক্রিয়ার মাধ্যমে যথার্থ আধ্যাত্মিক পথে নারী-পুরুষ আত্ম-অতিক্রমণ করতে পারবে। এ কথায় কঠিন আদর্শবাদী মনে আঘাত পাবেন। কিন্তু এ কথা মনে রাখা উচিত যে ঔষধ বা দৈহিক ব্যায়াম আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার কারণ নয়, অভিজ্ঞতা লাভের একটা উপলক্ষ মাত্র।

উইলিয়াম জেমস্ নাইট্রাস অক্সাইড নিয়ে পরীক্ষা করে যে ফল পান বার্গস অল্প কয়েকটি কথায় তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছেন : মনের মধ্যে ওই প্রবণতা একটি সঙ্কেতের অপেক্ষায় সুপ্ত হয়ে থাকে। সঙ্কেতের সঙ্গে সঙ্গে তা প্রস্ফুটিত হয়। এই প্রস্ফুটন আধ্যাত্মিক স্তরে আধ্যাত্মিক উপায়ে ঘটান সম্ভব। আবার বাধার প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে, মনের অবরোধ কাটিয়ে জাগতিক উপায়েও ওই সম্ভাবনার বিকাশ ঘটান যায়। মাদক বা ঔষধের কাজ এইখানে। যেখানে এই মানসিক প্রবণতাগুলি দৈহিক বা নৈতিক বিচারে আমাদের প্রতিকূল হয়ে দাঁড়ায়, সেখানে ঔষধ বা আধ্যাত্মিক ব্যায়ামের সাহায্যে বাধার অপসারণ আধ্যাত্ম-বিরোধী অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতাব সৃষ্টি করে। নরককুণ্ডের এই অসহনীয় অভিজ্ঞতা কিন্তু কারও কারও কাজে লাগতে পারে। এমন অনেক মানুষ আছে যারা নিজের কুকার্য সৃষ্ট নরকে কিছুক্ষণও যদি ফলভোগ করে তবে তাদের অপরিসীম উপকার হয়।

দেহের দিক থেকে নির্দোষ ও প্রায় মূল্যহীন অতীন্দ্রিয় প্রবণতা সৃষ্টকারী উত্তেজক ঔষধের ব্যবহার আজকাল দেখা যাচ্ছে। কিছুদিনের মধ্যেই এমন ঔষধ সুলভও হয়ে উঠবে। সুলভ হলে এর ব্যবহার যে ব্যাপক হবে তাতেও সন্দেহ নেই। আমাদের মধ্যে নিজেদের ছাড়িয়ে ওঠার ইচ্ছা এতই প্রবল ও এতই সাধারণ যে এ ছাড়া অন্যকিছু ঘটতে পারে না। অতীতে খুব অল্প লোকই অলৌকিক বা প্রাক-অলৌকিক অবস্থার একটা স্বতঃস্ফূর্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। যে-সব দৈহিক মানসিক নিয়ম শৃঙ্খলা সমাজ-বিযুক্ত একাকী মানুষকে আত্ম-অতিক্রমণে সাহায্য করে সেই নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলবার লোক তখন আরও অল্প ছিল। ভবিষ্যতের শক্তিশালী ও অল্প মূল্য মন-পরিবর্তক ঔষধ এই অবস্থাব পরিবর্তন ঘটাবে। অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা তখন সাধারণ জিনিস হয়ে উঠবে। যে আধ্যাত্মিক অধিকার অল্পের আয়ত্তে ছিল তা হবে সকলের। এর ফলে পৃথিবীর সংগঠিত ধর্মগুলির যাঁরা যাজক তাঁদের অনেক নূতন সমস্যার সামনে পড়তে হবে। বেশির ভাগ মানুষের কাছে ধর্ম কতকগুলি সনাতনী প্রতীকের সমষ্টি এবং ওই প্রতীকগুলির প্রতি তাদের বুদ্ধিগত, নীতিগত ও ভাবাবেগগত যে প্রতিক্রিয়া তাই দিয়েই তাদের ধর্ম গঠিত। যারা আত্ম-অতিক্রমণ করে মনের অন্য জগত প্রত্যক্ষ করেছে ও বস্তু-প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মবোধ করেছে তারা ওই প্রতীক দিয়ে গড়া ধর্ম নিয়ে সন্তুষ্ট হবে না। ভোজ খাওয়ার জায়গায় একটা সুন্দর করে লেখা

পাক্‌প্রণালীর বই পড়ে নিশ্চয় আমরা তুষ্ট হই না। আমাদের "ঈশ্বরের দয়া প্রত্যক্ষ করতে ও ঐশ্বরিক রস আস্বাদন করতে" হবে।

মন-পরিবর্তক ঔষধের প্রচলনে যে সমস্যা উপস্থিত হবে তার সঙ্গে আধুনিক ধর্ম যাজকদের বোঝাপড়া করতে হবে। যদি তাঁরা বিরোধী মন নিয়ে ঔষধগুলিকেই সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন, তাহলে সংগঠিত ধর্ম ব্যবস্থার আওতার বাইরে আধ্যাত্মিক সম্ভাবনাপূর্ণ একটি মানসিক অবস্থার প্রকাশ ঘটবে। অন্যদিকে এই ঔষধগুলিকে তাঁরা মেনে নিতে পারেন—কি ভাবে তা আমার জানা নেই।

আমার নিজের বিশ্বাস মনের পরিবর্তনে নূতন মাদকের ব্যবহার প্রথমে আমাদের কিছুটা বিভ্রান্ত করলেও, ক্রমশ সেগুলি সামাজিক জীবনের আধ্যাত্মবোধ গভীর করে তুলবে। যে "ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার" কথা অনেকে অনেকদিন ধরে বলে আসছেন, তা ধর্মের সভা ডেকে বা সৌম্যদর্শন ধর্ম যাজকদের টেলিভিশানে আবিভাবের ফলে সম্ভব হয়ে উঠবে না। জৈব-রাসায়নিক আবিষ্কারের ফলে ওই পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটতে পারে কারণ তখন বহু নারী-পুরুষ একসঙ্গে আপন সত্তার উপরে উঠতে পারবেন ও বস্তু-প্রকৃতি সম্বন্ধে তাদের নিগূঢ় জ্ঞান জন্মাবে। ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এইভাবে একই সঙ্গে একটা বিপ্লবের সূচনা করবে। প্রতীক ভিত্তিক ধর্মের বদলে অভিজ্ঞতা ভিত্তিক ও অন্তর্দৃষ্টিগত ধর্মের প্রতিষ্ঠা হবে। একটা সাধারণ অতীন্দ্রিয়বোধ আমাদের প্রাত্যহিক কাজ-কর্ম, বিচার-বুদ্ধি ও আমাদের পরস্পরের সম্বন্ধকে নির্দেশিত করবে, তাকে বিশেষ তাৎপর্য দেবে।

# বীরের পতন

**আর্থার এম, শ্লেসিন্‌জার** ( জুনিয়ার )

রুজভেল্ট যুগ নিয়ে আর্থার এম, শ্লেসিন্‌জার অবিরাম চর্চায় নিযুক্ত। এ বিষয়ে তাঁর প্রথম বই, The Crisis of the Old order এর জন্য আমেরিকার ইতিহাসবেত্তার সম্প্রদায় ( Society of American Historians ) তাঁকে Francis Parkanan পুরস্কার দেন। ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত The Age of Jackson, Pulitzer পুরস্কার পায়। তাঁর পিতার মত ( যার সামাজিক ও ঐতিহাসিক বিষয়ে লেখা পনেরটি গুরুত্বপূর্ণ বই আছে ) আর্থার শ্লেসিন্‌জার ( ছোট ) হার্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপক। তিনি বিবাহিত ও তার চারটি পুত্র-কন্যা আছে।

আমাদের যুগে বীরপূজা বন্ধ, আমরা নায়কহীন। একথা বলতে হঠাৎই বুঝতে পারি এক পুরুষের মধ্যে এই পৃথিবীর কি বিস্ময়কর পরিবতন ঘটেছে। আমাদের মধ্যে অনেকেই বিরাট ব্যক্তিত্বের যুগে মানুষ হয়েছি। ভাল হোক বা মন্দ হোক, মহৎ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোক আমাদের জীবনের উপর প্রভুত্ব করেছেন, আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রিত করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রে ছিলেন থিওডোর রুজভেল্ট, উডড্রো উইলসন, ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট, গ্রেট ব্রিটেনে লয়েড জর্জ, উইনস্টন চার্চিল। অন্যান্য দেশে লেলিন্, স্টালিন্, হিট্‌লার, মুসোলিনি, ক্লেমেনস্যো, গান্ধী, কামাল, সানিয়াৎ সেন। রাজনীতির বাইরে পূজনীয় ছিলেন আইনস্টাইন, ফ্রয়েড, কেনস্। এই বিরাট পুরুষদের মধ্যে কেউ আমাদের জীবনে ভাল, কেউ মন্দ প্রভাব রেখে গেছেন। কিন্তু ভালই হোক আর মন্দই হোক জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের যে মৃত্যু ঘটেনি তাতে পরবর্তীকালে আমাদের জীবনে একটা পার্থক্য ঘটেছে।

আজ আমাদের এই সঙ্কীর্ণ জগতের উপরে অতিকায় মূর্তির মত কেউ দাঁড়িয়ে নেই; এমন কোন বিরাট পুরুষ নেই যার ভূমিকা যে অন্য কেউ গ্রহণ করতে পারবে তা আমরা কল্পনা করতে পারি। কেউ কেউ অবশ্য অতুলনীয়তার কাছাকাছি পৌছান, যেমন, এডেন্যর, নেহেরু, টিটো, দ্য গ্যল, চিয়াং কাইশেক, মাও শেতুঙ। কিন্তু এঁরা এই সবেমাত্র ফেলে আসা অতীতের বিশাল পুরুষদের মত মহাকাব্যের ভঙ্গিতে ইতিহাসকে হাতের

মধ্যে ধরে তাতে নিজের ছাপ রাখতে পারেন না, তার দিক-নির্দেশ করতে পারেন না। স্টালিনের মৃত্যুর পর যেমন দ্য গ্যল বলেছিলেন, "বীরের যুগ শেষ হয়ে গেল।" যে যাই ভাবুক, রুজভেল্ট, চার্চিল, স্টালিন বা হিটলারকে তারা শ্রদ্ধাই করুক বা ঘৃণাই করুক, তাদের জীবনের উপর এইসব পুরুষের ব্যক্তিত্বের নিরেট চাপটা তারা যে অনুভব করেছিল তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। এমন ব্যক্তিত্বের প্রভাব আমাদের জীবনে আজ আর নেই। আমাদের প্রেসিডেন্টের প্রীতিকর গুণগুলি সত্ত্বেও তিনি যে ইতিহাসের পাতায় তাঁর মতবাদের ছাপ রেখে যেতে চান না তা প্রায় স্পষ্টভাবেই বলেছেন। ম্যাকমিলান, ক্রুশ্চভ ও গ্রঁসিসের দলের নেতাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব তাঁদের পূর্বনায়কদেব চেয়ে অনেক কম। তাঁদের জায়গায় আমেরিকায়, ব্রিটেনে, রাশিয়া ও ইতালীতে অন্য নেতা শাসনভার গ্রহণ করতে পারেন এবং তাতে ইতিহাসের কোন গতি পরিবর্তন ঘটে না। আমাদেব এই যুগে বীরের অভাব কেন ঘটল ও বীরশূন্য এই সভ্যতা ভাল কি মন্দ তা বিচার করে দেখা যেতে পারে।

বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ আর দেখা যায় না কেন? ইতিহাসে আকস্মিকের স্থান না মেনে উপায় নেই, এবং এই ব্যাপারে হয়তো আকস্মিকের হাত আছে। কিন্তু আকস্মিক যখন নিয়ম হয়ে দাঁড়ায় তখন তার আকস্মিকতা লোপ পায়। অতএব এ বিষয়ে আবও চিন্তার দরকার। আমাদের যুগে শুধু যে অতুলনীয় মানুষের অভাব ঘটেছে তাই নয়, আমরা এখন সর্বগ্রাসী ব্যক্তিত্বের বিরোধী। এমন হল কেন? অবশ্য আজ বীরপুরুষের অভাব ঘটার কারণ এক পুরুষ আগে তার প্রাচুর্য। সাধারণ মানুষ মহত্ত্বের ভাব বেশীদিন সহ্য করতে পারে না। এমারসন বলেছেন, "বীরত্বেব অর্থ কষ্ট স্বীকার, প্রশংসা ও স্বাচ্ছন্দের আশা ত্যাগ করা, বাইরের জগতকে নিজের ঘরে টেনে আনা ও বৈঠকখানার দেওয়াল-ঘড়ি দিয়ে চিরন্তনকে মাপার চেষ্টা।" বীরের জগতে ব্যক্তি বিশেষের নিজস্ব জীবনধারার স্থান নেই।

এ ছাড়া বীরপুরুষের রীতি জীবনে বিপদকে টেনে আনা। তাঁদের বাস চূড়ান্তকে নিয়ে, হয় চূড়ান্ত ভাল, নয় চূড়ান্ত মন্দকে তাঁদের চাই। সাধারণ মানুষ কিছুদিনের মধ্যেই এই চূড়ান্ত পরিণতির প্রশ্নকে এড়াতে চায় ও নির্ঝঞ্ঝাট নিরাপত্তার জন্য 'ব্যগ্র হয়ে ওঠে। এমনই বিপদকে আহ্বান করা জীবনের একটি চূড়ান্ত পরিণতির দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। এর ফলে বিরাটত্বের

প্রতি আজ যদি ব্যাপক বিদ্বেষ দেখা গিয়ে থাকে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এই যুদ্ধই হিটলার ও মুসোলিনিকে নিঃশেষ করেছে। সেই সঙ্গে বীরের আলেখ্যও আমাদের মনে অটুট থাকেনি। যুদ্ধের পরেই ইংরেজ চার্চিলকে ও আমেরিকা রুজভেল্টকে অস্বীকার করে। যথাকালে ফরাসী দেশের রাজনীতির অঙ্গন থেকে দ্য গ্যলকে সরে দাঁড়াতে হল ( পরে এর জন্য ফরাসীদের অনুশোচনা করতে হয়েছিল কিন্তু গৃহ-যুদ্ধের ভয় না দেখা যাওয়া পর্যন্ত তাকে ফিরিয়ে আনা হয় নি ); রাশিয়ায় স্টালিনযুগের ও চীনে চিয়াং কাইশেক যুগের অবসান ঘটল। স্টালিনকে তাঁর উচ্চ বেদী থেকে নিচে নামিয়ে ক্রুশ্চভ অসাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে আজকের যে রায় তাকে জোরাল করলেন। তিনি ঘোষণা করলেন আজকের জগতে "ব্যক্তি পূজার" কোনও প্রয়োজন নেই। এবং সত্যই ব্যক্তিত্বের পূজা, যা হিটলার-স্টালিনের ভক্তরা চূড়ান্তরূপে করেছিল এবং রুজভেল্ট-চার্চিলের সমর্থকরা কিছুটা অল্প আড়ম্বরের সঙ্গে করত, তার বিপদ অনেক। কোনও মানুষই ত্রুটিহীন নয় ও মাঝে মাঝে তাকে তা স্মরণ করিয়ে দেওয়া ভাল। কিন্তু আজকের জগত আরও বেশীদূর গেছে, তারা যে শুধু বীর পূজার বিরোধী তাই নয়, তারা মহাপুরুষেরই বিরোধী। এ যুগ বিশেষভাবে সাধারণ মানুষের যুগ।

এই "সাধারণ মানুষের" সংজ্ঞা গভীরতর সমস্যা নিয়ে এসেছে। যে অতিকায় মানুষের ধারণার সঙ্গে যুদ্ধ ও যন্ত্রণার ছবিটা আমাদের মনে গেঁথে গেছে এর মধ্যে তাকে বর্জন করার চিন্তাই শুধু নেই। সাধারণ লোকের মনে মহামানব সম্বন্ধে দু'রকম ভাবের প্রকাশ দেখা যায়, তারা মহাপুরুষকে ভয়ও করে, ভক্তিও করে, শ্রদ্ধা করে আবার অশ্রদ্ধাও করে। এথেন্সবাসী এরিসটাইডিসের নামের সঙ্গে "বিচার পরায়ণ" শব্দের বার বার যোগ দেখে বিরক্ত হয়ে তাকে ভোট দিতে অস্বীকার করে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াই প্রকাশ করেছিল। মহৎ মানুষ ক্ষুদ্র মানুষকে তার ক্ষুদ্রতা সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে। রাজনীতির ক্ষেত্রে বিদ্বেষ একটা অস্বীকৃত কিন্তু প্রধান ভাব। একথা ভুললে চলবে না যে নিঃস্বের ঈর্ষা-বিদ্বেষ পার্থিব অর্থে ধনী লোকেদের বিরুদ্ধে যতটা তীব্র ঠিক ততটাই তীব্র হতে পারে যাদের চরিত্রের ও বুদ্ধির ঐশ্বর্য আছে তাদেরও বিরুদ্ধে।

আধুনিক গণতন্ত্র অতর্কিতভাবে হিংসা বিদ্বেষের প্রসারের নূতন সুযোগ সৃষ্টি করেছে। গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য অবশ্য সকলকে বড় হবার সুযোগ দেওয়া। কিন্তু ঈর্ষান্বিত মানুষ ওই সুযোগে "মমতার" নজির দেখিয়ে সকলকে নিজের

স্তরে নাবিয়ে আনে। ১৮৩৩এ যুক্তরাষ্ট্র পরিভ্রমণ করার পর এলিক্সিস দ্য তোক্যোভিল লেখেন, "রাজনীতির ক্ষেত্রে খ্যাতিমান লোকের অভাবের কারণ সংখ্যা গরিষ্ঠের পরিবর্ধমান যথেচ্ছাচার।......

সংখ্যাগরিষ্ঠের ক্ষমতা এতই সর্বাঙ্গীন ও অপ্রতিহত যে যদি কেউ সংখ্যাগরিষ্ঠের নির্দিষ্ট পথ ত্যাগ করতে চায় তবে তাকে নাগরিক অধিকারও ছাড়তে হবে, এমন কি মানুষের মত বেঁচে থাকার স্বত্বগুলিকেও হারাতে হবে।" জেমস ব্রাইস্ তার "আমেরিকার কমনওয়েল্থ" ( মার্কিন লোকায়ত শাসনতন্ত্র ) বইএর একটি পরিচ্ছেদেব নাম দিয়েছিলেন, "প্রতিভাবান মানুষ কেন প্রেসিডেণ্টের পদে নির্বাচিত হন না।"

ইতিহাস দেখিয়েছে যে এই সব ভবিষ্যৎদ্রষ্টা অকারণেই অতিরিক্ত নিরাশাবাদী। রাজনীতিতে প্রতিভাবান লোকের প্রবেশ যে ঘটেনি তা নয়, মহৎ মানুষ প্রেসিডেণ্টের পদেও নিযুক্ত হয়েছেন। গণতন্ত্রে যেমন সাধারণ গুণের প্রকাশ ঘটেছে তেমনই বীর্যবান লোকেরও স্থান হয়েছে। এ সত্বেও তোক্যোভিল গণতন্ত্রে বীরের প্রতি বিরূপতার যে স্থায়ী প্রবণতা দেখেছিলেন তাও সত্য। যন্ত্রশিল্পের প্রসার এই প্রবণতাকে আরও গভীর করেছে। উত্তরোত্তর বহুলোক বৃহৎ বৃহৎ সংস্থাকে কেন্দ্র করে তাদের জীবন কাটাচ্ছে। একটি বইএ ভবিষ্যৎ মার্কিনবাসীকে সংস্থার মানুষ হিসাবে আঁকা হয়েছে। মার্কিন জীবনে আমলাতন্ত্রের প্রবেশ, শ্রমিক সংখ্যা হ্রাসের সঙ্গে হোয়াইটকলার কর্মী দলপুষ্টি ও উপনাগরিক জীবনের উন্মেষ সবগুলি মার্কিন জীবনধারাকে ক্রমশ বেশী সঙ্ঘবদ্ধ করে তুলেছে। যদিও আমরা আমাদের নিখাদ ব্যক্তিতান্ত্রিক বলে থাকি, প্রকৃত জীবনে সমবায়িক ও বৈশিষ্টহীন হয়ে পড়েছি। মনস্যানটো কেমিক্যালের একটি চলচ্চিত্রে যেমন একদল যন্ত্রবিদকে পরীক্ষাগারে কার্যরত দেখিয়ে মন্তব্য করা হয়েছিল "এখানে প্রতিভাধর কেউ নেই, একদল সাধারণ মার্কিনবাসী শুধু এক সঙ্গে কাজ করছে।" ক্রমশই আমাদের আদর্শ হয়ে উঠছে দলের সঙ্গে নিজেদের মিশিয়ে দেওয়া। পূর্বের মত বলিষ্ঠ ও বেপরোয়া ভাবে ব্যক্তিত্বের উপলব্ধি বর্তমানের পথ নয়। এই যৌথ সমাজে বীরের স্থান কোথায় ?

একশ' বছর আগে জন স্টুয়ার্ট মিল লেখেন, "এখন ইংল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠত্বের প্রকাশ ঘটছে তার সঙ্ঘবদ্ধ যৌথ জীবনের মধ্য দিয়ে। ব্যক্তিগতভাবে ছোট হলেও আমাদের একত্রিতভাবে কাজ করার অভ্যাসের ফলে আমাদের বিরাট বলে মনে হয়।" তাঁর এই উক্তি সমসাময়িক আমেরিকা

সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। কিন্তু যেখানে আমরা দলের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে খুশী, সেখানে মিল পূর্ণ গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলেছিলেন, "আজকের যে ইংল্যাণ্ড তাকে তৈরি করেছিল অন্য জাতের লোক ও ইংল্যাণ্ডের পতন রোধ করতে হলে সেই জাতের লোকেদের চাই।"

মিল কি ঠিক কথা বলেছেন? ইতিহাসে ব্যক্তি বিশেষের কোনও প্রভাব দেখা যায় কি? একদল শক্তিশালী দার্শনিক এ কথা স্বীকার করেন না। তাঁদের ধারণা বীরত্বের ধারণা অতীতের একটা ছেলেমানুষী ছাড়া কিছু নয়, যে অতীতে সমস্ত ঘটনার সূত্র খোঁজা হত ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যে। এঁদের মতে বিশেষ মানুষ ইতিহাস গড়ে নি, ইতিহাস গড়েছে অপ্রতিহত শক্তি ও অপরিবর্তনীয় নিয়ম। এই শক্তি ও নিয়ম একের মধ্যে প্রকাশ না পেলে অন্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাবে। বর্তমান ঘটনা নিশ্চিতভাবে সমগ্র ভবিষ্যৎকে নির্ধারিত করে। টলস্টয়ের মতে, "যদি স্বাধীন ইচ্ছায় কোনও মানুষ একটা কাজও করতে পারত তাহলে ঐতিহাসিক নিয়ম থাকত না ও ঐতিহাসিক ঘটনার কোন ব্যাখ্যা সম্ভব হত না।" এই যদি সত্য হয় তবে কোন বিশেষ সময়ে কোন বীর নেতার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিতে কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটত না।

এই ধারণায় অদৃষ্টচালিত নিমিত্তবাদের মনোভাব দেখা যায়। টলস্টয়ের "War and Peace" এ এই ধারণারই একটা প্রকৃষ্ট পরিচয় ফুটে উঠেছে। টলস্টয় প্রশ্ন করেছেন, নেপোলিয়ানের রাজত্বকালে কেন লক্ষ লক্ষ লোক তাদের সাধারণ বুদ্ধি ও সব মানবিক অনুভূতি জলাঞ্জলি দিয়ে তাদেরই আপনজনকে হত্যা করবার জন্য পশ্চিম থেকে পুবে ছুটে গিয়েছিল? ঐতিহাসিকের জবাব অত্যন্ত ভাসাভাসা, অস্পষ্ট। টলস্টয় নিজে জবাবে বলেছিলেন, "যুদ্ধ ঘটেছিল তা অবশ্যম্ভাবী বলেই।" অতীতের ঘটনা সেই যুদ্ধকে নির্দিষ্ট করেছিল, অনিবার্য করে রেখেছিল। এ অবস্থায় বীর নায়কের স্থান কোথায়? টলস্টয়ের মতে ওই নায়করা ইতিহাসের সবচেয়ে বড় আত্ম-প্রতারিত জীব। "তারা ঐতিহাসিক ঘটনার মার্কার কাজ করে, ও মার্কার মতই ঘটনার সঙ্গে তার কিছুমাত্র সম্বন্ধ থাকে না।" মানুষের পুরুষকার যত বড় "ততই তার প্রত্যেক কাজ অনিবার্যতা ও পূর্ব নির্দেশের সূত্রে দৃঢ়ভাবে বাঁধা।" টলস্টয় বলেন যে হিরোরা "ইতিহাসের দাস।"

ঐতিহাসিক অদৃষ্টবাদের নানা রূপ আছে। টয়েনবি ও স্পেঙ্গলার সভ্যতার অপরিহার্য বিকাশ ও বিলয়ের মতবাদ প্রচার করেছেন।

মার্কসবাদীরা বলেন উৎপাদন পদ্ধতিব বিভিন্নতা ইতিহাসের গতি নির্ধারিত করে। ক্রুশ্চভ যখন একজন বিশেষ নেতাকে হিরো করে তোলবার চেষ্টা ও ব্যক্তি পূজার নিন্দা করেন তখন তিনি মার্কসবাদের মূল নীতিরই সমর্থনে কথা বলেন। মার্কসবাদ অর্থনৈতিক নিমিত্তবাদের একমাত্র রূপ নয়। যারা অবাধনীতির ( laissez-faire ) অনুসরণে মনে করেন সভ্যতার ভিত্তি নির্মাণ হয়েছে ব্যক্তিগত সম্পত্তির শুচিতার কোনও আদর্শে আত্মনিয়োগের ফলে, তারাও অর্থনৈতিক নিমিত্তবাদের আর এক রূপ প্রচার করেন।

অদৃষ্টবাদীদের মধ্যেও অনেক পার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু এক বিষয়ে তাঁরা একমত, ইতিহাসে ব্যক্তিব নিজস্ব কোনও ভূমিকা নেই। অদৃষ্টবাদীর কথা ঠিক হলে আজকেব দিনে আদর্শ নেতার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিতে নিশ্চয় কিছু আসে যায় না।

কিন্তু এঁরা ভ্রান্ত। এই ঐতিহাসিক অদৃষ্টবাদের দার্শনিক তত্ত্বে অনেক ভুল আছে। প্রথম ভুল তাঁদের ধারণা ঘটনামাত্রই অনিবার্য কিন্তু কার্য-কারণ-সম্বন্ধ এক কথা আর কাজ বা ঘটনা আগে থেকে স্থির হয়ে থাকা আর এক কথা। ঘটনার পর তার ব্যাখ্যা ওই ঘটনাকে বুঝতে হয়তো সুবিধা করে। কিন্তু ওই ব্যাখ্যা থেকে একথা কখনই প্রমাণ হয় না যে সেই ঘটনা কিম্বা অন্য যে কোন ঘটনা ঘটা অনিবার্য ছিল, তার জায়গায় অন্য কিছু ঘটা অসম্ভব ছিল। অদৃষ্টবাদকে প্রমাণ কবতে গেলে ঘটনাব আগে তার প্রয়োগ দরকার। যে ঘটনা ঘটেনি তার সম্বন্ধে সঠিক ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যেই অদৃষ্টবাদের পরীক্ষা। অতএব টলস্টয়ের ভাষায় যদি বলি যে অতীত বর্তমানকে নির্ধারিত করছে তা হলে কিছুই বলা হয় না। এই ব্যাখ্যা যে কোনও জায়গায় খাটে এবং সেইজন্য তা এত অস্পষ্ট ও সাধারণ হয়ে পড়ে যে তার থেকে কোন কিছু বোঝা যায় না।

অদৃষ্টবাদের অন্য অসুবিধাও আছে। তাকে অনেকগুলি অলৌকিক ঐতিহাসিক শক্তির কথা ধরে নিতে হয় সত্য নয়। শ্রেণী, বর্গ, জাতি, জনগণের ইচ্ছা, কালগত ধারণা, ও ইতিহাসও এঁদের কাছে এক-একটি অলৌকিক শক্তির আধার। কিন্তু সত্যই এমন কোন শক্তি নেই। যা আছে তা হল দর্শকের মনের কল্পনা ও কতকগুলি উপমা। এদের একমাত্র প্রমাণ ব্যক্তির আচরণ-নির্ভর কয়েকটি সিদ্ধান্ত। অতএব ব্যক্তিই ইতিহাসের মৌলিক উপাদান। যদিও কোন ব্যক্তিই সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়—সাম্প্রতিক কতকগুলি আবিষ্কার প্রমাণ করেছে কত রকম ভাবে মনের অগোচরে আমাদের

আচার-ব্যবহার নির্দিষ্ট হয়ে থাকে—তবু একটা সীমিত ক্ষেত্রে আমাদের স্বাধীন নির্বাচন ক্ষমতার কথা মানতে হবে। মানতে হবে অন্তত ততদিন যতদিন না পরীক্ষণীয় প্রমাণে এ যে মিথ্যা তা প্রতিপন্ন হচ্ছে, অর্থাৎ ভবিষ্যতে যা ঘটবে তা পূর্ব থেকেই আমরা নির্ধারণ করে বলে দিতে পারছি।

এ ছাড়া অদৃষ্টবাদ মনোবিজ্ঞানও আমাদের নীতি-বিরুদ্ধ। জীবনের নিয়তিতে যদি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস কবি, তবে মানুষেব দায়িত্বের কথা তোলার আর কোন অর্থ থাকে না। মানুষের কার্যধারা যখন আগে থেকেই নির্দিষ্ট তখন তার কাজের জন্য তাকে দায়ী করা মিথ্যা। কিন্তু আমাদের সমস্ত কাজ, কথা ও চিন্তার মধ্যে আমরা আমাদের স্বাধীন নির্বাচন শক্তির অস্তিত্ব মেনে নিই এবং এইভাবে প্রতি পদক্ষেপে অদৃষ্টবাদেব ধারণাকে অপ্রমাণ করি। স্যার ইসিয়া বার্লিন নিমিত্তবাদ সম্বন্ধে বলেছিলেন, "এই মতবাদে যদি সত্যই বিশ্বাস কবতে হয়, তবে আমাদের ভাষায়, আমাদের নৈতিক ধারণায়, আমাদেব পবস্পরেব প্রতি মনোভাবে, ইতিহাস, সমাজ ও অন্য সমস্ত কিছু সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টির মধ্যে এমনই বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটবে যে তার বর্ণনা করাও অসম্ভব হবে।" কালাতীত জগতে বা সতেরটি দিক যুক্ত ব্যাপ্তির মধ্যে বাস করার কল্পনা যেমন আমাদের কাছে অবাস্তব তেমনই নিমিত্তবাদীর জগতের অস্তিত্ব কল্পনা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

যে ঐতিহাসিক বাস্তব ঘটনাব প্রত্যক্ষ ব্যাখ্যায় অভ্যস্ত, তার কাছে অদৃষ্টবাদের তত্ত্বগুলি বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে তার অসারতা দেখান কঠিন কাজ নয়। উগ্র নিমিত্তবাদীর কাছে এক ব্যক্তির সঙ্গে অন্য ব্যক্তির কোন পার্থক্য নেই। ইতিহাসেব দাস হিসাবে প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে অন্য মানুষের স্থান বিনিময় সম্ভব, একের জায়গায় অন্যে এসে দাঁড়ালে কোনও ক্ষতি হয় না। টলস্টয় বোঝাতে চেয়েছিলেন যে নেপোলিয়ান যদি ইউরোপের উপর দিয়ে সৈন্য চালনা না করতেন তবে অন্য কেউ তা করত। এই অদৃষ্টবাদকে খণ্ডন করতে গিয়ে একবার উলিয়াম জেম্‌স নিমিত্তবাদীদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন তারা কি সত্যই বিশ্বাস করে যে "সামাজিক চাপের এমন সমাবেশ ঘটেছিল যাতে ১৫৬৪ সালের ২৩শে এপ্রিল ঠিক স্ট্র্যাটফোর্ড অন্ এভনে বিশেষ মানস-চরিত্রসম্পন্ন উইলিয়াম'সেক্সপিয়ারের জন্ম হয়।" জেম্‌স আরও প্রশ্ন করেন এরা কি বিশ্বাস করে যে "ওই সেক্সপিয়ার যদি শৈশবে কলেরায় মারা যেত, তা হলে সামাজিক শক্তির সাম্য বজায় রাখবার জন্য স্ট্র্যাটফোর্ডের কোন মাতা সেক্সপিয়রের একটি প্রতিলিপি, কার্বন কপি তৈরি

করতেন?" এসব কথা কে বিশ্বাস করবে? আর নিমিত্তবাদীরা যদি ঠিক এই কথা না বলেন তবে তাঁরা ইতিহাস থেকে ব্যক্তিকে বাদ দেন কি করে?

১৯৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে রাত্রি সাড়ে দশটা নাগাদ এক ইংরেজ রাজনীতিজ্ঞ নিউইয়র্কের পঞ্চম এভিন্যু পার হচ্ছিলেন ৭৬ ও ৭৭ নম্বর সড়কের মাথায়। সে সময় একটা গাড়ি তাঁকে চাপা দিয়ে গুরুতরভাবে আহত করে। চোদ্দমাস পরে একজন মার্কিন রাজনীতিজ্ঞ ফ্লেরিডার মিয়ামি সহরে একটা খোলা গাড়িতে যখন বসেছিলেন তখন একজন আততায়ী তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে কিন্তু সে গুলিতে মারা পড়ে তাঁর পাশের লোকটি। যদি কণ্টাসিনির গাড়ির ধাক্কায় চার্চিল নিহত হতেন ও জাংগারার গুলিতে ফ্র্যাঙ্কলিন রুজভেল্ট মারা পডতেন তবে পরের দুই দশক কি ঠিক একইভাবে কাটত?

আরও ধরা যাক ১৯২৩ সালে মিউনিক গোলযোগের সময় রাস্তার মারামারিতে হিটলার নিহত হয়েছেন ও লেলিন ও মুসোলিনি জন্মের সময় মারা গেছেন। তা হলে এ শতাব্দীর রূপটা কেমন হত?

ব্যক্তি বিশেষকে অবশ্য একটা গণ্ডির মধ্যেই কাজ করতে হয়। সে সবকিছু করতে পারে না। উপযুক্ত মানুস ও পরিবেশ না থাকলে তারা ইতিহাসের গতি বদলাতে পারে না। কোনও প্রতিভা, তার বীর্য যতই হ'ক, প্রাচীন ট্রয়ে টেলিভিশান নিয়ে যেতে থাকতে পারতেন না। তবু সিডনি হুক তাঁর সুচিন্তিত গ্রন্থ The Hero in Historyতে যে কথা সুবিচার করে বলেছেন যে "যখন বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে ঘটনার গতি বিভিন্ন দিকে যেতে পারে" তখন পুরুষকার সম্পন্ন মানুষ তাঁর নিশ্চিত প্রভাবটি রেখে যান, একথা সত্য।

অদৃষ্টবাদ ও পুরুষকারের তর্কে দুই পক্ষের তরফেই বলবার অনেক কিছু কথা নেই। এদের পার্থক্যটা এতই তীক্ষ্ণ যে দু'দিক মানিয়ে নেওয়ার উপায় নেই। যদি ইতিহাসের বিবর্তন পূর্ব থেকেই নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত হয়, তাহলে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার কোন মূল থাকে না। যদি তা না হয় তাহলে বীরের পুরুষকারের অপরিহার্য ভূমিকা থাকে। বাস্তব প্রত্যক্ষ ঘটনার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ইতিহাস কিছুটা অনির্দিষ্ট ও অসম্পূর্ণ। সেখানে ব্যক্তি বিশেষকে দেখা গেছে যাদের কাজ অন্য কারও দ্বারা করান সম্ভব ছিল না; তাঁদের উপস্থিতি ইতিহাসের গতিকে বিশিষ্ট পথে নিয়ে গেছে। তাই যদি হয় তবে "কোনও মানুষই অপরিহার্য নয়" প্রাচীন এই প্রবাদটিও ভুল। পুরুষকারের পক্ষে তাহলে কিছু যুক্তি আছে।

কিন্তু বীরের পক্ষে যুক্তি থাকার অর্থ ব্যক্তি পূজার পক্ষে যুক্তি থাকা নয়। বিচার-বুদ্ধি ত্যাগ করা, নির্বিচারে নেতৃত্ব স্থানীয় লোককে দাসত্ব ও বিরাট ব্যক্তিত্বের সামনে সাধারণ মানুষের অসহায় অবনত ভাব—এগুলি বীরত্ববাদের কুফল ও মানুষের মর্যাদার পক্ষে হানিকর। কিন্তু বীর-পূজার আতিশয্য ঘটলে তার বিরুদ্ধে স্বাভাবিকভাবেই প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এমারসন বলেছেন, "বীরপুরুষ কিছুদিনের মধ্যেই বিরক্তিকর হয়ে ওঠে।" বীরকে দেবতার স্থানে না বসিয়েও তাঁকে যে পূজা করা যায় তার ঐতিহাসিক নজির পেতে আমাদের বেশীদূর যেতে হয় না।

ইতিহাসে এও দেখতে পাই যে যখন সমাজ বীরপূজা থেকে সরে থাকতে চায় ও বীরকে নির্বাসিত করতে চায়, তখন সে অন্য সমস্যার সৃষ্টি করে। আমাদের সময়কার মার্কিন সমাজে যেমন ব্যক্তির স্থান নেই। ব্যক্তিত্ববাদের অর্থ দলকে অস্বীকার। আর দলকে অস্বীকারের অর্থ সংঘর্ষ। আমাদের চোখে এই সংঘর্ষ বিভেদকর, আমেরিকানত্ব-বিরোধী ও সেই হিসাবে অসহ্য। আমাদের সবচেয়ে বড় শিল্পের কাজ হল দলের মধ্যে বিরোধ মেটাবার কলা-কৌশল সৃষ্টি করা। এর জন্য গণ-যোগের বিজ্ঞান থেকে ও মনঃসমীক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ের নীতি সর্বত্র প্রয়োগ করা হয়। আমাদের জাতীয় আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছে মনের ও আত্মার তুষ্টি। ঘুমপাড়নি ঔষধটাই এ যুগের লক্ষণযুক্ত। আমাদের নূতন বীর জগতে আমরা "একত্রিত" হওয়ার পতাকার তলায় যাত্রা করে চলেছি।

আমাদের সমস্যাগুলি ঘনীভূত ও ক্রমশ জটিল হয়ে উঠেছে বলেই যে সমাজে যৌথ প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু যৌথ প্রচেষ্টারও একটা ক্ষেত্র আছে, সেটা অতিক্রম করাও ঠিক নয়। ক্রুশ্চভ চিন্তিত কারণ তাঁর সমবায়ী সমাজে ব্যক্তিপূজার প্রবণতা দেখা গেছে। সে হিসাবে আমাদের এই ব্যক্তিত্ববাদী সমাজে যে দলের পূজা সুরু হয়েছে তাতেও আমাদের চিন্তিত হওয়া উচিত। আমরা ধরে নিই যে কঠিন প্রশ্নের সমাধানের জন্য বিভিন্ন ধর্মের লোকের সভা বা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক গঠিত গবেষণার দল কিম্বা জ্ঞানী লোকের সম্মেলন একান্তই দরকার। কিন্তু এই যে যৌথ প্রচেষ্টা তার অর্থ কি এই নয় যে আমরা আমাদের দায়িত্ব ভাগ করে দিতে চাই, বিপদের ঝুঁকিটা আংশিকভাবে অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চাই? ফলে আমরা আমাদের গভীর অন্তর্দৃষ্টি হারাই ও হাল্‌কা, ফালতু মানুষের জয়ের পথ পরিষ্কার করি। বাঁচতে হলে আমাদের দৃষ্টির

প্রসার চাই, ভাব-সম্পদ চাই, সাহস চাই। সমিতি-সম্মেলন করলেই এসব গুণের প্রকাশ ঘটবে না। আমাদেব জ্ঞান ও নীতিগত জীবনে যা কিছু গুরুত্বপূর্ণ তাব স্থরু ব্যক্তিগত এলাকায় নিজের মন ও বিবেকের সঙ্গে ব্যক্তির সামনা সামনি বোঝা-পডার মধ্যে।

আবামপ্রিয সমাজে সৃজনী শক্তির অভাব ঘটে। জন স্টুয়ার্ট মিল বলেছিলেন, "সমাজে খামখেযালিপনাব অনুপাতে মনীষা, মানসিক কর্মশক্তি ও নৈতিক সাহস দেখা যায। আমাদের কালের সবচেযে বড বিপদ এই যে আমবা খামখেযালি হতে ভয় পাই।" ভিক্টোরিয়ান যুগের ইংল্যাণ্ডে যদি এই ভয জেগে থাকে তবে আজকে সে ভয় জাগার আবও ঢের বেশী কারণ আছে। আমরা দলের বা সমষ্টিব পূজাব মধ্যে সমাজের খামখেযালি, মৌলিক, গর্বিত, কল্পনাশক্তি সম্পন্ন ও একলা মানুষগুলিকে আমবা ছেঁটে ফেলে দিই, অথচ এদেব কাছ থেকেই আমবা নূতন চিন্তা ও ভাব-ধারণা পেয়ে থাকি। বীরপজাব বিবোধিতা ক্রমশ সৃষ্টিশক্তিব বিরুদ্ধে ষডযন্ত্র হয়ে দাঁডায। যদি বীরপূজা আমাদের এক পথে নরকে নিযে যায, তবে বীরকে পরিহার কবার চেষ্টাও অন্য পথে আমাদেব সেখানেই নিযে গিয়ে ফেলে। বীবেব গুণে যদি মগ্ধ না হই, তবে কিছুদিনেব মধ্যেই মুগ্ধ প্রবৃত্তিটা নিজের উপরই এসে বতায। গণতন্ত্রে বীবপূজার চেয়ে খাবাপ যা তা হল আত্মপূজা।

স্বাধীন সমাজ পুরুষকাব ছাডা চলতে পারে না, কাবণ তার মধ্য দিযেই স্বাধীন মানুষের শক্তিব প্রকাশ ঘটে। ভাবের অবিশ্বাস্য সম্ভাবনা ও শক্তির কল্পনাতীত প্রয়োগের পরিচয পাই বীরেব মধ্যে। এমারসন লিখেছেন, "মহৎ লোকেব আবির্ভাবে আমাদের কর্মচক্রের বাইরে আব একটা নূতন চক্রের সৃষ্টি হয যা আমাদের মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে।" কার্লাইল প্রয়াসহীন সাধারণ জীবন ও তাব অবিশ্বাস ও তার বিভ্রান্তির সঙ্গে শুকনো, মরা জ্বালানি কাঠের তুলনা করেছেন, যে কাঠ জ্বলে ওঠার জন্য স্বর্গের বজ্রপতনের অপেক্ষায থাকে। "মহৎ মানুষ, যে মানুষ তাব স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি লাভ করে ঈশ্বরের নিজেব হাত থেকে, তাবাই ওই বজ্র সাধারণ লোক জ্বালানি কাঠের মত এদের অপেক্ষায থাকে, যাতে তাবাও জ্বলে উঠতে পারে।"

মহান পুরুষ আমাদেব শক্তির চরম বিকাশে সাহায্য করেন। সামান্য মানুষকে তাঁরা নিজের অন্তর্নিহিত শক্তির উপর আস্থা রেখে তাদের অবস্থাকে ছাডিয়ে ওঠার বল দেন। উইলিয়াম জেমস্ বলেছেন, "ইতিহাস থেকে আমাদের আদর্শ বীরকে বাছাই করে নিয়ে আমরা প্রত্যেকে আমাদের

অন্তরের শক্তিকে জোরাল করতে পারি, জাগিয়ে তুলতে পারি। বীরপূজার এই শেষ সমর্থন।” আমাদের আদর্শের বিগ্রহ, সক্রেটিস ও তাঁর বিরাট জ্ঞান, সেক্সপিয়ার ও তাঁর অদ্ভুত সৃজনীশক্তি, ওয়াশিংটনের ক্ষমতা, লিন্‌কনের মৈত্রী, এবং সকলের বড় জেসাসের জীবন ও মৃত্যুর নিদর্শন থেকে আমরা কে না সহিষ্ণুতা ও বিশ্বাস অর্জন করেছি? এমারসন বলেছেন, “প্রতিভা আমাদের পুষ্টি দেয়। মহৎ লোক আছেন মহত্তর লোকের আবির্ভাবের জন্য।”

কিন্তু তবু এ হল তাঁদের সেবার ছোট অংশ। তাঁদের আরও বড কাজ হল ইতিহাসের অনিবার্যতার ধারণার বিরুদ্ধে মানুষের স্বাধীন সত্তার অস্তিত্ব প্রচার করা। জগতের প্রথম বীর প্রমিথিউস যিনি দেবতাদের না মেনে মানুষের স্বাধীনতা ও আত্ম-নির্ভরতা জাহির করে সমস্ত নিমিত্তবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। সেইজন্য জিউস তাঁকে পাথরে বেঁধে শকুনি দিয়ে ছিঁড়িয়ে খাইয়ে শাস্তি দিয়েছিলেন।

সেই সময় থেকে প্রমিথিউসের মত মানুষ ইতিহাসের সঙ্গে সংগ্রাম করে এসেছে। এ সংগ্রাম হিংস্র ও নির্দয়। কারণ মানুষের জড়ত্বে ভারি চাপ অদৃষ্টবাদের অনুকূল। অসাধারণ দৃষ্টি, সামর্থ ও ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন মানুষ, এক কথায় আদর্শ বীরপুরুষ ইতিহাসের, সাধারণ সামান্য মানুষের মতে যা পূর্ব নির্ধারিত পথ, তার থেকে তাকে অন্য পথে চালিয়ে নিয়ে যায়। এবং প্রায় এর জন্য তাকে ইতিহাস দণ্ড দেয়, তাকে পাথরে বেঁধে রাখে ও শকুনিকে দিয়ে খাওয়াতে চায়। কিন্তু প্রমিথিউসের আদর্শে মানুষ তার সত্তা বজায় রাখতে পারে। সাহসী মানুষ তাঁর নিজের নিয়তি স্থির করতে পারেন।

যে যুগে বীর নেই, যে যুগ ইতিহাসের চাকায় বাঁধা। এই বদ্ধ অবস্থা এক হিসাবে আরামপ্রদ ও লোভনীয়। অদৃষ্টবাদের একটা বড় আবেদন দায়িত্বমুক্তি। মহৎ লোকের আদর্শ বলে আমাদের কিছু করবার আছে, অদৃষ্টবাদ বলে করবার কিছু নেই। অদৃষ্টবাদ এইভাবে আমাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতার পোষণ করে। বার্লিনের কথায় “অদৃষ্টবাদ ইতিহাসে একটা বড় অজুহাত খাড়া করেছে।”

বড় লোক, মহৎ লোককে বাদ দিয়েও আমরা চলতে পারি এ ধারণার বশবর্তী হয়ে আত্মশ্লাঘায় কোন ফল নেই। আমাদের সমাজ যদি বীরপূজার বাসনা হারায় ও পুরুষকার সৃষ্টি না করতে পারে, তবে শেষ পর্যন্ত সে তার সর্বস্ব খোয়াবে।

# কবির দৃষ্টিতে জগত

## এডিথ্ সিটওয়েল

ডেম্ এডিথ সিটওয়েল, ইংরেজ কবি, সমালোচক, সমাজ-বিদ্রোহী ও সাহিত্য বিষয়ে তার্কিক, অস্বাট ও স্যাচেভরেল সিটওয়েলের ভগ্নি। এই ত্রয়ী প্রাচীন আদর্শভঙ্গকারী চার দশক ধরে ইংল্যাণ্ডে আমেরিকার সাহিত্য-সমুদ্র মথিত করে রয়েছেন। অত্যন্ত ব্যক্তিত্বপূর্ণ রচনা-শৈলীর অধিকারী ও বহু কবিতার লেখিকা এডিথ সিটওয়েলের কাব্যে খামখেয়ালিপনা থেকে প্রচুর শক্তি ও গভীর বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। সমালোচনার ক্ষেত্রে তাঁকে কাব্যাদর্শের স্বীকৃত সমর্থক হিসাবে দেখা হয়। সত্তর বছরের বিচিত্র ও সংহত চরিত্র শ্রীমতী এডিথ ইয়র্কসায়ারের রেনিশ পার্কে বাস করেন। এই রেনিশ পার্ক ছয়শত বছরের উপর সিটওয়েলদের পারিবারিক সম্পত্তি গত।

অধুনা ইংল্যাণ্ডে আধুনিক কবিদের সম্বন্ধে অনেক অর্থহীন কথা লেখা চলেছে। বলা হচ্ছে যে আধুনিক কবি ও সাধারণ পাঠকের মধ্যে কোন যোগ নেই, একের প্রতি অন্যের কোন আগ্রহ ঔৎসুক্য নেই। যাঁরা একথা প্রচার করছেন তাঁরা নিজেরা অসফল কবি, ও পাঠক সমাজের সুখ্যাতি লাভে অক্ষম হয়ে তাঁরা সমালোচক হয়ে উঠেছেন ও কৃতী কবিদের বিরুদ্ধে লিখতে সুরু করেছেন।

সত্য কথা এই যে আধুনিক কবিতা যদি একান্তভাবেই বিরক্তিকর না হয় তবে তা পড়ে সাধারণ পাঠক আনন্দ পান—অবশ্য নিকৃষ্ট সমালোচনা যদি কবিতা পাঠে তাদের প্রথমেই বিরত না করে। অন্য অনুযোগ এই যে কবিরা নাকি পাঠকদের নিয়ে মাথা ঘামান না। কিন্তু কবি নিরুৎসুক দর্শক নন তাঁরা পাঠকের শত্রু নন বা তাদের বিদ্রূপ করে লেখা তাঁদের উদ্দেশ্য নয়। তাঁর কাজ "তাঁদের জীবনের একটি মুহূর্তের" কথা পাঠককে শোনান, ভাই ভাইকে যেমন তার অন্তরের কথা শোনায়। যে মুহূর্ত আধুনিক কর্মব্যস্ত জগতের ধুলার তলায় চাপা পড়ে ছিল কবি তাকেই উদ্ধার করে পাঠকের কাছে উপস্থিত করেন। অবসন্ন মানুষকে, প্রতিবেশী পাঠককে তাঁরা উৎসাহ দিতে চান। রাত্রির আগমনে সেক্সপিয়ারের এন্‌টনি ক্লিয়োপেট্রাকে যেমন বলেছিল

তেমনিভাবে কবি বলতে চান, "এস রানী, এখনও জীবনের রস কিছু বাকি আছে।" মানুষের হৃদয়ের রস, ঘটনার রস।

সব বড় কাব্য অন্তরের রসে রঞ্জিত এবং এমারসনের ভাষায় তাতে "সাধারণের চিত্তের একটা গভীরতর আস্বাদ আছে।"

কবি পরিপূর্ণ মানব-প্রেমিক। ওয়াল্ট হুইটম্যান বলেছেন, "এই পথে কবি গেছেন, তাঁর অনুসরণ কর দেখবে নৈরাশ্যের লেশমাত্র নেই, মানুষের প্রতি বিদ্বেষ নেই, ধূর্ততা নেই, আত্মকেন্দ্রিকতা নেই; দেখবে জন্মগত অমর্যাদা নেই, নরকের রঙ ও প্রতারণা নেই, এমনকি নরকের প্রয়োজনই নেই। এর পর কোনও মানুষকে তার অজ্ঞতা, দৌর্বল্য বা পাপের জন্য হীনতা বরণ করতে হয় না।"

সেক্সপিয়ারের মতে খারাপ বলব শুধু তাকে যা নরকের চেয়ে ঠাণ্ডা, নরকের চেয়ে নিষ্ঠুর। কঠিন চিত্তই শুধু আঘাত করতে পারে। সেক্সপিয়ার মানুষের মূলগত ঐশ্বর্যটা দেখতে পেয়েছিলেন।

চিত্রশিল্পীরও সেই একই কথা। চিত্রকর হেন্‌রি ফ্রুসেলি বলেছেন, "মাইকেল এঞ্জেলোর প্রত্যেক রেখার মধ্যে একটা ব্যতিক্রমহীন বিরাটত্ব আছে। শিশু, নারী, হীনতা, বিকলাঙ্গতা সবের মধ্যেই একটা নির্বিচার ঐশ্বর্যের, মহত্ত্বের, ছবি ফুটে উঠেছে। তার হাতে ভিক্ষুক হয়েছে দারিদ্র্যে সম্রাট ও বামনের কুঁজ সম্ভ্রান্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর আঁকা নারী একটা যুগের ছাঁচে তৈরি, তাঁর শিশুর মধ্যে মানুষের পরিপূর্ণতার ইঙ্গিত আছে, তাঁর পুরুষ অশেষ শক্তিশালী মানব-পরিবারের সভ্য।

কবি-হৃদয়ে যে প্রেম আছে তার ছাপ প্রত্যেকের মনে এসে পড়ে, প্রত্যেকের মনকে ঐশ্বর্যশালী করে। প্রতিবেশী পাঠকের কাছে কবির বাণী হল, "শিশুরা নিজেদের ভালবাসে।" কবির কাছে প্রত্যেকটি দিনই পবিত্র।

কবির জীবনের একটি কাজ হল বিশ্বের সেই আলোর সন্ধান যা বাস্তব ও কল্পলোকের মধ্যে যোগসৃষ্টি করে। এমারসনের মতে, "অতীন্দ্রিয় জগতের ভৌগোলিক ও প্রকৃতি-বিজ্ঞানীরই আর এক নাম প্রতিভা। প্রতিভার কাজ হল ওই জগতের মানচিত্র তৈরি করে নূতন কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে পরিচয় সৃষ্টি করা।"

উইলিয়াম জেম্‌স বলেছেন, "শিশুর ইন্দ্রিয়গত প্রথম চেতনাটাই তার বিশ্ব। শিশুর বস্তুর অভিজ্ঞতার মধ্যে বুদ্ধির বিভিন্ন বিভাগ এসে ধরা পড়ে। প্রথম

যখন আমরা আলো দেখি তখন দেখা হয় না, আলোর সঙ্গে এক হই। কিন্তু পরের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভিত্তি ওই প্রথম অভিজ্ঞতা।”

বিভিন্ন শিল্পের নামী শিল্পী, মিল্‌টনের মত অন্ধ বা বিথোফেনের মত কালা হলেও, নিজের অন্তরে শিশুর বিস্মিত দৃষ্টিতে জগতের যে ঐশ্বর্যের ছবি ফুটে ওঠে তাকে বহন করেন। তাঁর দেখা ও শোনা তাকে বাস্তব সত্তার কাছাকাছি নিয়ে যায়। তাঁর দৃষ্টিতে মোজেজের ( Moses ) মত প্রজ্জ্বলিত ঝোপে-ঝাড়ে ঈশ্বরের ছবি ধরা পড়ে যখন আমাদের আধ-খোলা চর্মচক্ষে আমরা শুধু মালির দৈনন্দিন কাজটা দেখতে পাই।

ব্লেক তাঁর “শেষ বিচারের দৃশ্যে” লিখেছেন, “প্রশ্ন করা হবে যখন সূর্য ওঠে তখন কি তুমি গিনির মত গোল একটা আগুনের গোলক দেখতে পাও না? না না, আমি দেখি অসংখ্য দেবদূতের দল উচ্চকণ্ঠে বলছে, ‘পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র ওই সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর।’ আমি আমার দৈহিক বা পার্থিব চোখকে অবিশ্বাস করি না। যেমন একটা দৃশ্য সম্বন্ধে জানালাকে প্রশ্ন করি না। আমি জানালার ভিতর দিয়ে দেখি, জানালার দৃষ্টিতে দেখি না।”

কবির একটি কাজ প্রতি মানুষকে তার নিজের দৃষ্টিতে জগতকে দেখান, তাকে সেই জিনিস দেখান যা সে দেখেও জানে না কি দেখছে। চিত্রকরের মত কবির কাজ চর্মচক্ষে পৃথিবীর যে দৃশ্যকে সঙ্গতিহীন বলে মনে হয় তার মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করে একটা বিরাট নক্‌সা তৈরি করা, একটা বিরাট সাম্যের পরিচয় ফোটান। দৃষ্ট বস্তুর সার সত্তা দেখান তাঁর কাজ। তাঁর কল্পনা সুখকর চিন্তা নয়, বাস্তবেরই সারবস্তু। কার্ল ইউং-এর ভাষায়, “জীবনের সকল শক্তির ঘনীভূত নির্যাস হল কল্পনা।”

অবশ্য কবি ও পাঠকের মধ্যে কখন কখন ব্যাঘাত যে না দেখা যায় তা নয়। এর নানা কারণ থাকতে পারে। এক কারণ কবির কল্পনার অসম্পূর্ণতা। যে অবচেতন মনে সব কাব্যের জন্ম হয়, কবি সেখানে থেকে তাকে সম্পূর্ণ উদ্ধার করে বাইরের জগতে প্রকাশ করতে পারেন না।

কিন্তু যা আমাদের সামনে নূতন জগতের পরিচয় খুলে দেয় তা প্রথমে কিছুটা অদ্ভুত বলে মনে হতে বাধ্য। যে অস্পষ্টতা অভাবজনিত, যা শূন্যতা থেকে আসে তার সঙ্গে যে বিভ্রান্তি জীবনের জটিলতা, তার বিভিন্ন শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার জন্য জাগে, তাদের মিলিয়ে ফেললে চলবে না। কবিতা অবশ্য যতদূর সম্ভব স্পষ্ট হওয়া উচিত। কিন্তু যাকে প্রথমে অদ্ভুত বলে মনে হয়, তাই পরে আমাদের মনকে জাগিয়ে তুলতে পারে। ওয়াল্‌টার

ন্থ লা মেয়ার বলেছেন, "সাইরাস তারা ও তার সহচর সূর্যের কল্পনাতীত শক্তি ও দূরত্ব আমাদের সবচেয়ে বড় কৌতূহলের জিনিস।" তাদের বোঝবার আগেই "তাদের সৌন্দর্য ও গরিমা আমাদের মনকে স্বস্তি দেয়, একাকী মানুষের শীতল চিত্তে উত্তাপ জোগায়।"

আরও মনে রাখা উচিত যে এক বাক্যের দুই অর্থ থাকার জন্য কবিতাকে জটিল মনে হতে পারে। সেক্সপিয়ারের এই লাইনটির অর্থ কি, "মানুষ মরে ও পোকামাকড়ে তাকে খায়, কিন্তু প্রেমের জন্য নয়।" এর অর্থ কি মানুষ প্রেমের জন্য মরে, না পোকা-মাকড় তাকে খায় কিন্তু প্রেম করে নয়? হয়ত দুটো অর্থই কবির মনে ছিল। কবি পাঠকের সহযোগিতা কামনা করেন। পাঠক চুপ করে বসে থাকবেন ও কবি একাধারে সব কাজ করবেন এ আশা করা ভুল। কাব্যের রসভোগ করতে হলে পাঠককে সম্পূর্ণভাবে কবিতায় মনঃসংযোগ করতে হবে, সমস্ত চিত্ত ও সহানুভূতি দিয়ে কবিতাটিকে বুঝতে হবে। কবিতাকে অনেক সময় কঠিন বলে মনে হয় কারণ পাঠক তাকে কঠিন করে তুলতে চান।

অনেকে বলেন আধুনিক কবিতার কতকগুলি প্রতিমা সৃষ্টিছাড়া। এর কারণ হয়তো ভাষার সঙ্কোচন। কিন্তু এও হতে পারে যে, যে কবি যখন তাঁর বক্তব্য, তাঁর অনুভূতিটাকে এক ভাষায় সম্পূর্ণভাবে না বোঝাতে পারেন তখন তিনি অন্য ভাষার আশ্রয় নেন। কবির অনুভূতি আদিম মানুষের মত একাধারে তীক্ষ্ণ ও উন্মুক্ত।

উইলিয়াম জেম্‌স তাঁর 'Principles of Psychology' গ্রন্থে লিখেছেন, "কিছু দিন আগে ব্লয়লার ( Bleuler ) ও লেহ্‌ম্যান ( Lehman ) কতকগুলি মানুষের মধ্যে অদ্ভুত একটি বৈশিষ্ট লক্ষ্য করেছিলেন। চোখে দেখা ও ত্বক দিয়ে স্পর্শ করার সঙ্গে তারা কয়েকটি নির্দিষ্ট ও স্পষ্ট শব্দ শুনতে পেত। এই যে শোনা তাকে বলা হয়েছে রঙিন শ্রবণ শক্তি। এমন ঘটনার বর্ণনা অনেক জায়াগায় পাওয়া গেছে।...ভিয়েনার চর্মরোগের ডাক্তার উরবানসিস্ ( Urbantschitsch ) প্রমাণ করেছেন এই লক্ষণগুলি একটা সাধারণ নিয়মেরই চূড়ান্ত প্রকাশ; আমাদের প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয় অন্য ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে প্রভাবান্বিত করে। তিনি রোগীদের পরীক্ষা করে দেখেছেন যে তাদের কানের কাছে টিউনিং ফর্কের আওয়াজ করলে দূরে রাখা জিনিসের রঙ চিনতে পারে, যা সাধারণ অবস্থায় চেনা যায় না। অনেক সময় আবার এই শব্দ দৃশ্যটাকে অন্ধকার করে তোলে। টিউনিং ফর্কের আওয়াজে মানুষের দৃষ্টিশক্তি

বেড়ে যেতে দেখা গেছে। উরবানসিস দেখলেন আলো ও শব্দের এই যে একের উপর অপরের প্রভাব তার অদল-বদল করা সম্ভব। যে শব্দ প্রায় কানে শোনা যায় না, চোখে নানা রঙের আলো ফেললে তাকে জোরাল করে তোলা যায়। স্বাদ, গন্ধ, স্পর্শ, অনুভূতি ও উত্তাপবোধ ইত্যাদিতে আলো ও শব্দ তারতম্য ঘটায়।"

কবিতায় এই ইন্দ্রিয়গত অনুভূতির একের উপর অপরের আরোপ নূতন নয়। "ইনফারনো"র ( Inferno ) পঞ্চম স্কন্ধে দাঁতে এক জায়গায় লিখেছেন, "আমি বোবা আলোর দেশে এসে পৌছলাম।"

লাফকাদিও হার্ন ( Lafcadio Hearn ) তাঁর এক লেখক বন্ধুকে চিঠিতে লিখেছিলেন, "তুমি যখন আমাকে সবুজ পাতার গাঢ় উদারার স্বরের কথা লেখ তখন আমি এই পাতাকে যেন দেখতে পেলাম, স্পর্শ করলাম, তার স্বাদ গ্রহণ করলাম, পাতা চিবিয়ে খেলাম। ঘন, তিক্ত আস্বাদ পেলাম, কিছু গন্ধও নাকে এসে লাগল।"

যখন আমার বয়স অল্প তখন আমার কয়েক ছত্র কবিতা প্রশংসা ও অপবাদ দুইই পায়, অবশ্য অপবাদটাই বেশী। আমি এক জায়গায় লিখেছিলাম, "সকালের আলো ভাঙা শব্দ তুলে এল।" এটা কি সত্যই অদ্ভুত ভাষা ?

তাঁর "হাডসন বে থেকে উত্তরসাগর ভ্রমণ" বইএ স্যামুয়েল হার্ন লিখেছেন, "উত্তরের সুউচ্চ প্রদেশে এমন কোন পর্যটক দেখেছি বলে মনে নেই যে উত্তরের আলোর রঙ ও অবস্থান বদলের সঙ্গে কোন আওয়াজ শুনতে পাওয়ার কথা বলেছে। এর কারণ বোধ হয় এই তাঁরা সেই জায়গায় সম্পূর্ণ নীরবতা পান নি। আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি সেখানে নিস্তব্ধ রাত্রে আলোর বর্ণ পরিবর্তনের সঙ্গে হাওয়ায় ওড়ান পতাকার পতপত আওয়াজ শুনেছি।" "সকালের আলো ভাঙা শব্দ তুলে আসে" যে বলেছিলাম তার কারণ এই : বৃষ্টির পরে ভোরের আলো যেন স্বচ্ছন্দ গতিতে আসতে পারে না। তাছাড়া ওই আলোর মধ্যে একটা কঠিনতার পরিচয় পাওয়া যায় যা ছায়ার বিস্তারকে যেন প্রত্যক্ষভাবে বাধা দেয়। এইজন্যই ওই কঠিন ও অস্পষ্ট আলোর মধ্যে আমি ভাঙা আওয়াজ শুনি।

কবিতাকে প্রথম প্রথম অস্বাভাবিক মনে হবার আর এক কারণ কবি দৃষ্ট বস্তুর ভিতর পর্যন্ত দেখতে চান, তার মধ্যে এমন সব সত্তা আবিষ্কার করেন যাতে সেই বস্তুর সার্থকতা নিগূঢ় হয়ে দেখা দেয়। যাকে প্রথম দৃষ্টিতে

অবান্তর বলে মনে হয় তার অনাবশ্যক অঙ্গগুলি বাদ দেবার পর তারই মধ্যে সার সত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

এই তীক্ষ্ণ, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি ও সার বস্তুতে সম্পূর্ণ আত্ম-নিবেশ করার চেষ্টায় একটা পুরাণো সুন্দর উপমা পাওয়া যায় জেরার্ড ম্যানলি হপকিন্‌সের "The May Magnificient" কাব্যে :

Star-eyed strawberry breasted
Throstle above her nested
Cluster of bugle-blue eggs thin.

এই যে সুস্পষ্ট ছবি তাতে হপকিন্‌স বলছেন "জামরঙা বুক" কারণ গায়ক পাখির বুকে হল্‌দে রঙের ছিটে থাকে। বনফুল Bugloss-এর গাঢ় নীল, যার 'উ', ব্লুর 'উ' মধ্যে এসে মিশছে, একের উপর অন্যের ছায়া ফেলছে। আকাশের নীল, ফুল ও রেণুর নীল স্বচ্ছ আলোতে একের সঙ্গে অপরে মেশামেশি করছে।

কয়েক বছর আগে একটি নোটবইতে আমি একজন চিত্রকরের কথা লিখেছিলাম যিনি গাছ আঁকতে গিয়ে নিজে গাছে পরিণত হয়েছিলেন। এই যে বিষয়ের সঙ্গে একাত্মতা তারই জন্য ডিল্যান টমাস একজন বড় কবি। কিন্তু এইজন্য তাঁর কবিতা বোঝা শক্ত। কিন্তু গাছকে তার নিজের ভাষায় কথা বলতে শুনলে তা বোঝা শক্ত হওয়াই তো স্বাভাবিক।

সব কবিতাই ভাষা-নির্ভর ও ভাষায় মূলীভূত হওয়া দরকার। অন্য ভাষায় তার অনুবাদ সম্ভব হলে, একই ভাষায় অন্য শব্দ প্রয়োগে তা লেখা অসম্ভব। কবি যদি নিজের ভাব প্রকাশের জন্য সঠিক শব্দ চয়ন না করে থাকেন, তবে তিনি কবিই নন।

ডিল্যাণ্ড টমাসের কবিতা ভাষায় মূলীভূত। তাকে অন্য ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। কিন্তু তার বিষয়-বস্তুর আলোচনা করা যেতে পারে। তাঁর উৎকৃষ্ট কবিতা "A Refusal to Mourn the Death, by fire, of a Child in London" কথা ধরা যাক।

Never until the mankind making
Bird beast and flower
Fathernig and all humbling darkness
Tells with silence the last light breaking
And the still hour

Is come of the sea tumbling in harness
And I must enter again the round
Zion of the water bead
And the synagogue of the ear of corn
Shall I let pray the shadow of a sound
Or show my salt seed
In the least valley of sackcloth to mourn
The majesty and burning of the child's death
I shall not murder
The mankind of her gonig with a grave truth
Nor blaspheme down the stations of the breath
With any further
Elegy of innocence and youth
Deep with the first dead ties London's daughter
Robed in the long friends,
The grains beyond age, the dark veins of her mother,
Secret by the unmourning water
Of the riding thanks.
After the first death, there is no other.

এই কবিতার অন্ধ অথচ সুন্দর গতির মধ্যে মৃত্যুর বাস্তবতাটা দেখতে পাওয়া যায়। এই মৃত্যু জগতের প্রথম অবস্থায় আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যায়, সময়ের সুরুতে যারা আমাদের বন্ধু ছিল তাদের মধ্যে নিয়ে গিয়ে অভিষেকের পোষাকে দাঁড় করিয়ে দেয়।

প্রথম কয়েকটি ছত্রে কবি বলেছেন, পাখি, পশু ও ফুলের প্রকৃতি মানুষের সৃষ্টির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে এবং মানুষের মত এরাও "fathering and all humbling darkness" (স্নেহার্দ্র ও শান্ত আঁধার যেখানে সবাই বিভেদশূন্য) থেকে আসে ও সেখানেই ফিরে যায়।

"Tells with silence the last light breaking" এই লাইনের অর্থ দিনের কোলাহল ও কাজ শেষ হল। "And the still hour is come of the sea tnmbling in harness" এ কথার অর্থ মনে হয় এই যে দেহাবৃত যে অভিযানরত, রহস্য অনুসন্ধানী আত্মা সে শান্তিলাভ করেছে।

কিন্তু 'of' শব্দটির ব্যবহারের কারণ কি? হয়তো এই যে ওই চরম শান্তি আমাদের মধ্যে সর্ব সময়েই রয়েছে।

আমাদের প্রথম জীবনের যারা বন্ধু তাদের মধ্যেই যে আমাদের চরম নিরাপত্তা সেই বিশ্বাসের কথা এই কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। যতদিন না জগতের অস্তিত্ব কবি ও শিশুর কাছে লুপ্ত হচ্ছে ততদিন তাকে জলকণার স্বর্গে আবার প্রবেশ করতেই হবে না "...enter again the round zion of the water bead and the synagogue of the ear of corn।" শস্যকণা দিয়ে তৈরি গির্জা ক্রন্দনবত ( my salt bead ) শিশুর যাত্রার পথ অন্ধকার করবে। এখানে চোখের জল ( water bead ) পবিত্র, শস্যকণা ( ear of corn ) প্রার্থনার স্থান ও "station of the breath" ক্রশ চিহ্নের জায়গা।

W. H. Auden-এর কবিতা জটিল, কিন্তু তাঁকে বুঝতে পাঠকের খুব কষ্ট হওয়ার কথা নয়।

He is the way
Follw him through the land the likeness,
You will see rare beasts, and have
Unique adventures.
He is the truth.
Seek him in the kingdom of Anxiety,
You will come to a great city that has
expected your return for tears.
He is the Life.
Love him in the world of the flesh ;
And at your marriage all its
Occasions shall dance for joy.

( Chorus from The Time Being )

অওডেনের কাব্য প্রচেষ্টার সার কথা ঈশ্বরত্বকে মানবিক করা। এমারসন যেমন প্লেটো সম্বন্ধে বলেছিলেন, "একটা তৃপ্তিকর তেজের বিকিরণ যা শক্তিকে আকৃতি থেকে, স্বভাবকে উপাধি থেকে প্রভেদ করে ও তার পরিভাষা ও সংজ্ঞার মধ্য দিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে যোগটাকে সহজ করে তোলে।"

আমি ও আমার সমসাময়িক কবিরা যখন কবিতা লিখতে স্বরু করি তখন কবিতার গতি, রূপক, অলঙ্কার ও ছন্দের পরিবর্তন প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। কারণ আমাদের ঠিক পূর্ববর্তী কবিদের কাব্যে বীর্যহীন ছন্দ, প্রাণহীন শব্দসম্ভার, ও নির্দিষ্ট গঠন তার সজীবতা নষ্ট করে দিয়েছিল।

কাব্যের জগতে পরিবর্তনের রীতিটা একই রকম। প্রধান ও মহান কবিদের অনুগমন করে এক জাতের নিকৃষ্ট দরের কবি। এরই মধ্যে নূতন কবির জন্ম হয়। সাপের খোলস বদলাবার মত কবিতারও রূপ বদলেব দরকার হয় ও এই কবিরা যা যা সৃষ্টি করে তাকে নূতন উদ্ভাবন বলে মনে হয়। কিন্তু ওই রূপটি দুশ' বছর আগেকার কাব্যের ধার করা রূপ হওয়া অসম্ভব নয়।

ভিক্টোরিয়ান যুগের ইংল্যাণ্ডে পথরোধী দল ইংরাজী ভাষার একজন শ্রেষ্ঠ কবি ওয়াল্ট হুইটম্যানকে অপদস্থ করতে তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। আব একজন বড় কবি সুইন্‌বার্ণও তাদের কাছে রেহাই পান নি। অন্যদিকে এঁরাই অষ্টিন ডবসনের মত রূপোর চামচ মুখে জন্ম ভিক্টোরিয়ান বুড়ি কবিদের চায়ের টেবিলের ঠুন-ঠুন শব্দে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছিলেন। এই সময়েই ছোট কবিদের মধ্যে সাধারণ ক্লান্তিকর ঘটনার অনুরূপ কাব্য রচনা করার চলন হয়েছিল—তাঁরা ঘটনার নকল করতেন, রূপান্তের মধ্য দিয়ে তাকে অন্য স্তরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতেন না। সকলকেই রাস্তার লোকের দৃষ্টিভঙ্গির মাপে কবিতা রচনা করায় ব্যস্ত হয়ে পড়তে দেখা গিয়েছিল, সাধারণ চিন্তাকে সাজাবার সাধারণ পোষাক এঁরা সৃষ্টি করতেন, বাস্তবের স্পর্শ থেকে এঁদের হাত দুটি বাঁচাবার জন্য সুলভ স্তুতির দস্তানা পরাবার রীতি হয়েছিল। আজকের নিকৃষ্ট ইংরেজ কবি এই অবস্থাতেই ফিরে চলেছেন।

উনিশ শতকের শেষভাগের নামকরা কবিরা এমনই একটা ভাবপ্রবণতার সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন যে বলিষ্ঠ চরিত্রের লোকও পুকুরে হাঁস ভাসতে দেখলে উৎসাহে চীৎকার করে উঠত। এই উৎসাহ আবার ক্ষণিকের নয়, ওই উৎসাহের চিৎকার বহুদিন চলত।

Four ducks on a pond.
A grass bank behind.
A blue sky of spring
White clouds on the wing.

What a little thing.
To remember for years
To remember, with tears.

পাঠকরা নিশ্চয় স্বীকার করবেন যে ঘটনাটা সত্যই নগণ্য ও তা নিয়ে হৈ হৈ করাটা প্রাপ্তবয়স্ক লোকের শোভা পায় না।

বর্তমান ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার যখন একদল কবি ভাষাকে পুনরুজ্জীবিত করতে ও ছন্দে প্রাণ সঞ্চার করতে চেষ্টা করেছেন, আর একদল গদ্য লেখক কাব্যকে ভিক্টোরিয়ান যুগের বীর্যহীন অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন।

এই আধুনিক মিল করা পদ্য লেখকদের অন্যতম রবার্ট কংকোয়েস্ট ( Robert Conquest ) যিনি একটা কবিতা সঙ্কলনের সম্পাদনা করেছেন, তাঁর সঙ্কলনের রীতি সম্বন্ধে বলেছেন, "সেইসব কবিকে বাছা হয়েছে যারা বিভিন্নভাবে ভাষা, বুদ্ধি ও অনুভূতির পূর্ণাঙ্গ সম্পদকে ব্যবহার করতে পেরেছেন।" কবি কংকোয়েস্টের কবিতার দুটি লাইন হল—

Is it, when paper roses make us gaze,
A mental or a physical event ?

এখানে নিশ্চয়ই "ভাষার, বুদ্ধির ও অনুভূতির পূর্ণাঙ্গ সম্পদের" পরিচয় ফুটে উঠেছে !

আর এক কবি তাঁর নাইবার টবে মাকড়সা দেখে যে কবিতা লিখে ফেলেছেন তাতেও ওই পূর্ণাঙ্গ সম্পদের পরিচয় নিশ্চয়ই পাওয়া উচিত।

যুবক ছোট কবির এই যে কবিতা তার মধ্যে যে সমস্যা লুকিয়ে আছে তার কেন্দ্র হল কাব্যের ধ্যান সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা। কাব্য মূল্য ও গুণের পক্ষে ওই ধ্যানের যথোপযুক্ত ব্যবহারের বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু প্রথমত ধ্যানের একটি বিষয়-বস্তু চাই। যখন গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা ও আবেগের অভাব ঘটে তখন শুধু সঙ্কীর্ণতার সৃষ্টি হয়।

নিম্নশ্রেণীর কবিদের আর এক ত্রুটি তাদের রচনা-শৈলীর দারিদ্র্য। তারা হয় প্রাণহীন চতুষ্পদীতে নয় জ্যামিতির ছকে বাঁকা ছন্দে লেখবার চেষ্টা করেন যা স্কুলের ছাত্ররাও করতে পারেন।

অথচ টি, এস, ইলিয়টের মত একজন বড় কবির হাতে এই চতুষ্পদী

কি ভাবের বাহন হতে পারে তাও দেখা যাক। "Nightingales"-এর "Sweency" থেকে এই লাইনগুলি তোলা হয়েছে।

Apeneck sweency spreads his knees
Letting his arms hangs down to laugh,
The Zebra stripes along his jaw
Swelling to maculate giraffe.

এই কবিতায় একটা সমাজের, যে সমাজেব আদর্শ Apeneck Sweency ও যে সমাজের মানুষ আধা বনমানুষ ও আধা গর্ধভ, তার আত্মার ও দেহের বিভীষিকা ফুটে উঠেছে। কাব্যেব ছন্দ ওই বিভীষিকাকে প্রকাশ কবছে।

প্রথম লাইনের পরেই একটা শূন্যতা, দৃষ্টিহীনতা, রিক্ততার অতল গহ্বব, দিগন্তবিস্তৃত অভাব, একটা নিঃস্ব সঙ্কুচিত ভাবেব পরিচয় পাওয়া যায়। "The Zebra stripes along his jaw" লেখায় "Jaw"এর A শব্দেব কর্কশ পশু রব যেন শোনা যায়।

"Apeneck sweency spreads his knees" এই লাইনে কবিব প্রতিভা ও প্রেরণার লক্ষণ দেখতে পাই তাঁর তীক্ষ্ণ-ফলা স্বরবর্ণের ব্যবহারে। "Letting his arms hangs down to laugh" এই ছত্রেও তীক্ষ্ণ স্বরবর্ণের বিপরীত ভারাক্রান্ত স্বরবর্ণের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে একটা স্থূল স্খলিত ইন্দ্রিয়ানুভূতির সৃষ্টি করা হয়েছে।

কিন্তু এখন অপটু চতুষ্পদী ছন্দ ও জ্যামিতির ছকে বাঁধা ছন্দের কথায় ফিরে আসা যাক। স্থূল তথাকথিত মুক্তছন্দের এই ছন্দগুলির ব্যবহার স্রুরু হয়েছে। এই মুক্তছন্দ বস্তুত অসমানভাবে কাটা নিকৃষ্ট গদ্য। যেমন—

For time is up, you have upset the table
Time is up, your red trousers are burnt.
Time is up, the wireless is smashed.
Oh, helpness now, I see
This is reality.

যদি এই বাস্তব হয়, তবে আমাদের অবস্থা খুবই শোচনীয় বলতে হবে।

এই কবিরা ভাবেন মুক্ত ছন্দে লেখা খুব সহজ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মুক্ত ছন্দ অত্যন্ত কঠিন। এই মুক্ত ছন্দেই সুন্দর স্বরধ্বনি কি ভাবে ফোটান যায় তা এই ছন্দে দক্ষ এক কবির লেখায় দেখা যাবে। এই কবির নাম

স্যাচেভরেল সিট্ওয়েল। (ইনি যে আমার ভ্রাতা তা আমার অজানা নয়, কিন্তু সেই কারণে তাঁর উৎকৃষ্ট কবি হতে বাধা নেই।)

Such are the clouds—
They float with white coolness and sunny shade,
Sometimes preening their flightless feathers.
Float, proud swans, on the calm lake
And wave your clipped wings in the azure air,
Then arch your neck, and look into the
deep for pearls,
Now can you drink dew from tall trees and
sloping fields of Heaven,
Gather new coolness for tomorrow's heat
And sleep through the soft night
with folded wing!

এর ছন্দময়তা কি মিল করা ছন্দের ছন্দময়তার চেয়ে কিছু কম? এর সুন্দর প্রবাহ লাইনগুলি ছোট বড করে, আগে পিছে করে, গতির তারতম্য করে শুধু সৃষ্টি করা হয়নি। কতকগুলি শব্দের মধ্যে, কখনও নিচে, কখনও উপরে সত্যই মনে হয় যেন একটা মৃদু হাওয়ার দোলা লাগছে। মনোরম ও অতি সূক্ষ্ম বিরতি, স্বরবর্ণের বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ ও কোমল ধ্বনি বিশিষ্ট ব্যঞ্জনবর্ণ প্রয়োগের মধ্য দিয়ে কবিতার ওই ভাব সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে।

কবিতার নানা দিক, নানা বিকাশ, নানা রূপ। সেখানে প্রজাপতি ও সিংহের দুয়েরই স্থান আছে। ট্র্যাজেডি সব সময় সেখানে দুঃখের সাজে আসে না। ওয়াল্টার ডু লা মেয়ার দেখিয়েছেন, "ডাঃ ফাউস্ট ট্র্যাজেডির একদিকের রূপ, অন্যদিকে আছে মিঃ পাঞ্চ ও তার টবি নামে কুকুরের ট্র্যাজেডি।" কিম্বা কবির মন হতে পারে "উজ্জ্বল গ্রীষ্মের প্রফুল্ল ও ভাবনাশূন্য মনের মত, যে মন সমস্ত চিন্তার উপরে, যেখানে জীবনের নিগূঢ় অনুভূতি জেগে রয়েছে, আলো ও রঙের খেলা চলেছে।"

চিত্রকর ব্রাক বলেছেন, "শিল্পের উৎকর্ষ বিস্তারের মধ্যে নেই, আছে সীমানার জ্ঞানের মধ্যে। সরঞ্জামের সীমা রচনাশৈলী নিরূপণ করে, নূতন রূপ সৃষ্টি করে ও সৃষ্টির প্রেরণা যোগায়।"

এ সূত্রে মেরিয়ান মুরের কবিতার দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। তিনি যা করতে

চান জানেন ও তাই করেন। আমাদের দিনে তাঁর মত নিখুঁত দর্শক ও সুন্দরের দর্শক অল্পই আছেন।

কোল্‌রিজ বলেছেন, "স্যার জর্জ বোমণ্ট স্বচ্ছ কাঁচের চশমা পরে আঁকায় তাঁর সুবিধা হয়েছিল।" এমেচারের এইটাই প্রকৃত লক্ষণ, তারা সব সময়ে তুলি বোলান হাল্‌কা করে, আলতো ভাবে। কুমারী মুর এমেচারের ঠিক বিপরীত। ফুলের রস-গ্রহণে মৌমাছির চেয়ে তিনি বেশী পারদর্শী।

তিনি এক ঝলকে দেখে বিদ্যুৎ চমকেই তা প্রকাশ করেন যাতে একটা প্রেমপূর্ণ জ্ঞানের পরিচয় আনন্দের মধ্যে ফুটে ওঠে। প্রেমের কাছে কোন কিছুই ছোট নয়, ছোট নয় যেমন যে কোন প্রাণীর জীবনের উৎস সন্ধানের আনন্দ। "মরুভূমির ছোট ইঁদুর' তার একটা "রুপোর মত উজ্জ্বল ঘর" আছে। যাকে সাধারণ লোক বালি ছাড়া আর কিছু বলে না। কিন্তু কুমারী মুরের কাছে "হাতির তামাটে রঙের" চামড়ার মতই এই বালির স্তূপটা আনন্দদায়ক।

তাঁর রচনাশৈলীর উৎকর্ষতা দেখাবার জন্য হাতির শুঁড় সম্বন্ধে লেখা এই কয়েক ছত্র কবিতার কথা ধরা যেতে পারে।

that tree-trunk without
roots, accustomed to shout
its own thoughts to itself like a shell, maintained
intact
by who knows what strange pressure of the
atmosphere , that
spiritual
brother to the coral—
plant, absorbed into which, the equable
sapphire light
becomes a nebulous green. The I of each is to
the I of each
a kind of fretful speech
which sets a limit on itself , the elephant is
black earth preceded by a tendril ?…

এই কবিতার দৃশ্যগত বিস্ময় ও সৌন্দর্যের কথা বাদ দিলেও, রচনাশৈলীর দিক থেকে এ যে অদ্ভুত তাতে সন্দেহ নেই—এতে বিষয় ও রূপ একেবারে মিশে গেছে। স্পেনীয় কবি লোরসার কথা মত কুমারী মুর এখানে "শুধু রূপ নয়, রূপের মজ্জা আবিষ্কার করেছেন।"

হাতির ধীর চলন ভঙ্গি, চিন্তাযুক্ত পদক্ষেপ প্রকাশ পেয়েছে ছন্দের গোড়ার ছোট ছোট লাইনের ও কবিতার প্রথম স্তবকের প্রতি ছত্রের শেষে 'T' অক্ষরটির ব্যবহারে, যাতে প্রত্যেক লাইনের শেষে পূর্ণচ্ছেদ বলে মনে হয়, হাতির দুটি বড় বড় পায়ের পদক্ষেপের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। ছোট ছোট লাইনের পর দীর্ঘতর লাইন এসেছে, যাতে মনে হয় ওই অতিকায় জীবটি দূরে চলে গেল।

স্যার কেনেথ ক্লার্ক লিওনার্দো দা ভিনচির উপর বিখ্যাত বই লিখেছেন, "তাঁর জীবনের শেষ পর্যন্ত দা ভিনচি চতুষ্কোণ, বৃত্ত, অর্ধবৃত্ত নিয়ে, তাদের নানা রকম সংযোগে নক্সা এঁকেছেন। ঠিক এইভাবেই একজন অপরাসায়নিক জীবনের সার বস্তু বার করবার জন্য বিভিন্ন রসায়ন দ্রব্যের নানা সংযোগের পরীক্ষা করেন।"

বেন জনসনের মতে কবিতার ভাষার "সাধারণ মৌখিক ভাষার উপরে ওঠা চাই।" বাইরনের কবিতার ওই দুটি সুন্দর লাইনের স্কটল্যাণ্ডের রাজা পঞ্চম জেম্‌সের "The Jolly beggar"এর পার্থক্যটা দেখা যাক : বাইরণ লিখেছেন :

So we 'll go no more a-roving
By the light of the moon.

পঞ্চম জেম্‌স লিখছেন :

And we'll gang nae mair a-roving
A rovin in the nicht.

মামুলি কথা ও কবিতার মধ্যে এই পার্থক্য। সজীব শব্দ না হলে সজীব কাব্য হয় না, দেবতার দূতের মুখের আগুনের ভাষা হয় না। ডি কুইনসি বলেছেন, "কোলরিজের পিতা প্রতি রবিবার তাঁর শ্রোতাদের হিব্রু টেস্টামেণ্ট থেকে পড়ে শোনাতেন, বলতেন এগুলিই হল পবিত্র আত্মার নিজস্ব ভাষা।"

আমাদের হিব্রুর প্রয়োজন নেই, ইংরাজী ভাষাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু ওই ভাষাকে অগ্নিবর্ষী হয়ে উঠতে হবে।

# সাম্রাজ্যের অবসান

## ডি, ডবলু, ব্রোগান

ডেনিস উইলিয়াম ব্রোগান একজন আইরিশ। এই শতকের গোড়ায় স্কটল্যাণ্ডে তাঁর জন্ম হয়। গ্লাসগো, অক্সফোর্ড ও হাবার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি পড়া-শোনা করেন এবং এখন কেমব্রীজ বিশ্ব বিদ্যালয়ের পিটার হাউসে তিনি রাজনীতির অধ্যাপক। রাজনীতি ও ইতিহাসের উপর প্রফেসর ব্রোগানের সতেরোটি বই আছে। এর মধ্যে কয়েকটিতে সহৃদয়তা ও সহানুভূতির সঙ্গে তিনি আমেরিকার কথা লিখেছেন। রেইনহোল্ড নিব্যুর ( Reinhold Niebuhr ) প্রফেসর ব্রোগানের "একদিকে সংবিধান নীতি বোঝা ও সমৃদ্ধ করার ও অন্যদিকে গণতন্ত্রের পটভূমিকায় রাজনৈতিক আচার-ব্যবহার ব্যাখ্যা করার অসাধারণ ক্ষমতার" প্রশংসা করেছেন। প্রফেসর ব্রোগানের স্ত্রী নৃতত্ত্ববিদ ওলওয়েন কেনডেল। এঁদের চারটি ছেলে ও একটি মেয়ে। এঁরা ইংল্যাণ্ডের কেমব্রীজে বাস করেন।

আমেরিকার রাজনৈতিক ঐতিহ্যের প্রতি সাধারণ মার্কিনবাসীর যে অকুণ্ঠ আনুগত্য তা দেখে বিদেশী বহু পর্যবেক্ষক সাধুবাদ করেছেন ও নিজেরা কিছুটা ঈর্ষান্বিতও হয়েছেন। এই আনুগত্যই ওই দেশের ভিতরের ও বাইরের শক্তি। এই আনুগত্য যা মার্কিন ছেলে-মেয়েদের জাতীয় রক্ষণাগারে রক্ষিত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ও সংবিধানের প্রতি সম্মান দেখাতে প্রেরণা যোগায়, তা প্রসংশনীয় সন্দেহ নেই। কিন্তু সাধু আমেরিকান যখন বাইরের জগতের দিকে দৃষ্টি ফেলেন, যখন নিজের দেশের অনুষ্ঠানগুলির বিকাশ পৃথিবীর অন্যান্য সৌভাগ্যহীন দেশগুলিতে দেখাতে চান, যখন আমেরিকার অর্থে বাইরের জগতে "স্বাধীনতা", "সার্থক শাসন", "প্রগতি", ইত্যাদি সাধারণ কথার প্রয়োগ খুঁজতে চান, তখনই তাঁকে মুশকিলে পড়তে হয়। ওই কথাগুলির অর্থ তাঁর কাছে অবিলম্বে স্পষ্টভাবে উপস্থিত করা হয়। ফলে সাধু মার্কিন-বাসীর পত্রটি সমস্যায় ভরে ওঠে, তিনি বুঝতে পারেন প্রাচীন চৈনিক অভিশাপ তাঁর উপর এসে পড়েছে, তাঁকে ঘটনাপূর্ণ জগতে বাস করতে হচ্ছে।

সাধু মার্কিনবাসীকে জগতের সর্বত্র দুটি সংশ্লিষ্ট ব্যাপারের সম্মুখীন হতে হয়েছে, এক সাম্রাজ্যের অবসান ও দ্বিতীয় স্বাধীন জাতির অভ্যুত্থান। এই

দুটি ঘটনার সংবাদে সাধু মার্কিনবাসীর মন যে খুশী হবে তাতে সন্দেহ নেই। সাম্রাজ্যের পতন ও নূতন স্বাধীন জাতের অভ্যুত্থান তাঁর দেশেই ১৭৭৬ সালে প্রথম সুরু হয়। অতএব আজ পৃথিবীতে সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি মার্কিন-বাসীকে খুশী করবেই।

কিন্তু জাতীয় ঐতিহ্যের এই দিকটির প্রতি সম্মান দেখান শেষ হলে পর, মার্কিনবাসী দেখে হতবুদ্ধি হন, রীতিমত ক্রুদ্ধ হন যে এই জগতে পুরাণো দিনের চেয়ে বেশী শান্তি, বেশী প্রগতি, শুভেচ্ছা, শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না। এমন কথাও শুনতে হয় যে ইন্দোনেসিয়া ও বর্মার মত নূতন স্বাধীন দেশের এখনকার অবস্থার চেয়ে নাকি পরাধীন সাম্রাজ্যবাদ শোষিত অবস্থা ভাল ছিল। যে ভারতবর্ষ ব্রিটিশের অধীনে এক ছিল, সেখানে আজ দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে চরম অসদ্ভাব। ওই দুটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি নির্বিচার হত্যা, ধর্ষণ ও নির্বাসনের সূচনা করেছিল। মার্কিনবাসী সংবাদপত্রে খবর পান যে তাঁদের সমস্ত ধর্ম বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা সিংহলে রক্তাক্ত দাঙ্গার নেতৃত্ব করেছেন। আফ্রিকার নূতন দেশ ঘানায় আভ্যন্তরিক বিরোধী দলকে যে উপায়ে দমন করার ভয় দেখান হয়েছে তাতে পুরাণো দিনের অত্যাচারের কথাই মনে আসে। ডাক্তার সুকার্ণো আমেরিকায় ওয়াংশিটন, জেফারসন ও লিনকনের প্রতি সম্মান দেখিয়ে মস্কোর পথে দেশে ফেরেন ও আমেরিকাব চেয়ে সোভিয়েট পরীক্ষা তাঁকে বেশী মুগ্ধ করে। ইজিপ্টের মত নূতন স্বাধীন জাতি রাশিয়ার কাছ থেকে অস্ত্র গ্রহণে পরিপূর্ণ আগ্রহ দেখা যায়। ভারতের একটি রাজ্য সাম্যবাদীদের নির্বাচন করে শাসনভার দেয়। এইভাবে সাম্রাজ্যবাদের দাসত্বমুক্ত নানা দেশে ১৭৭৬ সালে ঘোষিত অচ্ছেদ্য অধিকারগুলি লাভ করার জন্য এক অদ্ভুত ধরণের প্রচেষ্টা চলেছে। সত্য বলতে কি নূতন "স্বাধীনতার" চাপে অনেক অধিকারই হাতছাড়া হচ্ছে।

এমন কোন সহজ ও স্বয়ংক্রিয় উপায় নেই যাতে জগতে গণতন্ত্রকে নিরাপদ করে তোলা যায় ( ১৯১৮ সালে চেস্টারটন বলেছিলেন, "জগতে গণতন্ত্রকে কোনদিনই নিরাপদ করে তোলা যাবে না, গণতন্ত্রের ব্যবসাটা বিপদ-সংকুল ) মার্কিনবাসীকে তার নীতির অনুকরণের প্রহসন ও বক্র প্রকাশ দেখা অভ্যাস করতে হবে। কিন্তু তিনি যদি বুঝতে পারেন যে সাম্রাজ্যের অবসানটা যদি একটু আস্তে হত, তাহলে হয়তো ভাল ছিল, যদি বুঝতে পারেন বিদেশী শাসন মুক্তিতে ওই "মুক্তির" লাভ ছাড়া আর কিছু লাভ হয়নি, তাহলে বর্তমান ঘটনা দেখে তার মানসিক কষ্টটা কম হবে, তার

প্রতিক্রিয়াগুলি অবুঝের মত হবে না। স্বাধীনতালাভের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার কোনও সম্পর্ক নেই। যদি ধরা হয় ওই লাভের দাম দেওয়া দরকার তবে বলতে হবে দাম দিতে হচ্ছে অত্যন্ত বেশী। এই দামের অর্থ যদি হয় দারিদ্র্য, বিশৃঙ্খলা ও বিভেদ তবে যুক্তরাষ্ট্রকে নিজের গরজেই এসব ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে হবে।

সাম্রাজ্যশক্তির অপসারণের ফলে যে ফাঁক সৃষ্টি হয়েছে সকলের রক্ষার জন্য সেই ফাঁক ভরিয়ে দিতে যুক্তরাষ্ট্রকে এগিযে আসতে হবে। এর জন্য বিশীর্ণ শাসন-ব্যবস্থাকে দাঁড করিয়ে রাখতে তাকে অর্থ ও সৈন্যবল ক্ষয় করতে হবে ও ধৈর্য ধরতে হবে (এই শেষের কাজটাই শক্ত)। এব উপর তাকে হযতো সাম্রাজ্যবাদ ও শোষণের অপবাদ শুনতে হবে। শুনতে হবে তাদেরই কাছে যারা নিজেবাই নিজেদেব নিযতির নিযন্ত্রা। কিন্তু এই কথাটা তাদের বুঝতে হবে যে সাম্রাজ্যবাদের পতনে একটা যুগের শেষ হযেছে যুক্তরাষ্ট্র যা চেয়েছিল, বুঝতে হবে যে দুর্বৃত্ত, ক্ষমতালোভী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বোধকরি অত্যন্ত অসৎ উদ্দেশ্যে যে কাজগুলি করতো এখন সেই কাজ অন্য কাউকে করতে হবে। ফেল করা ব্যবসায প্রতিষ্ঠানেব অনিচ্ছুক প্রতিনিধি হিসাবে যুক্তবাষ্ট্রকেই এই কাজগুলি কবতে হবে।

সাম্রাজ্যবাদীর পতনের অর্থ একটা স্থূল সমাধানেব পরিবর্তে প্রকৃত সমস্যার সম্মুখীন হওয়া। "সব জাতিই সমান কিন্তু তাদেব মধ্যে কেউ কেউ উঁচু স্তরে সমান" সন্দেহপ্রবণ নিন্দুকের এই কথাগুলি কিন্তু সত্য। এর অর্থ বিভিন্ন জাতিবর্গের মধ্যে সম্পদের তারতম্য আছে, দক্ষতার কমবেশি আছে। ইতিহাসের গতিপথে একে অন্যের আগে কিম্বা পিছনে পডে আছে যদিও সকলেই এক স্তবেব মানুষ হতে চায়। বাস্তবকে অগ্রাহ্য করে অনেকে বলেন সকলেই সাম্যেব অবস্থায় পৌছে গেছি—যুক্তরাষ্ট্র যে হিসাবে একটি প্রজাতন্ত্র, লাইবেরিয়াও তেমনই সমগোত্রীয় প্রজাতন্ত্র, সিংহল হল্যাণ্ডের মতই একটি রাষ্ট্র। পুবাতন সাম্রাজ্যবাদীর এ মত নয়। তাদের মতে বিভিন্ন জাতি উন্নতির বিভিন্ন স্তরে রয়েছে ও উন্নত জাতির দায়িত্ব এমনকি বল প্রয়োগ করেও অনুন্নতদের সমান করা। এ কাজটা সহজ নয়, এ কাজের জন্য অর্থ ব্যয় আছে, অতএব সে কাজের দাম নেওয়াটা অন্যায নয।

স্বাধীনতা ঘোষণার যে নীতি তার সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদীর মতের বিরোধ আছে জানি ও ওই মত যদি যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে প্রচার করা হয় তবে তা লোককে যৎপরোনাস্তি আঘাত দেবে। কালিফোর্নিয়া ও মিসিসিপি

সর্বতোভাবে সমান ও উন্নতির সমান স্তরে রয়েছে। সেখানের মানুষ এক না হলেও একে অন্যের সমান। আইন ও আচার এক রাজ্যের লোকের সঙ্গে অন্য রাজ্যের লোককে সমান করে দেখে। এই হল তত্ত্বকথা। আমি যেটা প্রকৃত সত্য তার উপর কোন মন্তব্য করতে চাই না। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে অল্প কিছুদিন আগে পর্যন্ত ওই তত্ত্ব ও সত্য কোনটারই প্রচলন ছিল না। কেউ এ কথা স্বীকার করত না যে সুয়েজখাল ইজিপ্টের অধিকারে বলে ওই খালের মধ্য দিয়ে যাতায়াত নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা তার হাতে থাকবে। (সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যুক্তরাষ্ট্রও পানামাখালের উপর কলম্বিয়ার দাবি সম্বন্ধে একই মনোভাব পোষণ করতেন।)

এই উদ্ধত শক্তিমত্ত মনোভাবের একটা বাস্তব সমর্থন কিন্তু ছিল। গত ১৫০ বছরে যে প্রয়োগ-শিল্প জগতের রূপান্তর ঘটিয়েছে তার উদ্ভাবন হয়েছে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায়। নূতন যন্ত্র ও অস্ত্রের মালিক তাঁদের সামনে একটা ঘুমন্ত পৃথিবীকে দেখতে পেয়েছিলেন। সময় নষ্ট না করে ওই সাদা চামড়ার মানুষ ঘুমন্ত লোকগুলিকে জোর করে জাগাতে সুরু করলেন। এর জন্য কোথাও সরাসরি শাসনভার নিতে হল, যেমন ভারতবর্ষে; কোথাও (চীনদেশে) এঁরা অনেক সুবিধা দাবি করে বসলেন। অন্যদিকে জাপানের মত অপেক্ষাকৃত সজাগ জাতকে তাঁদের রীতি-নীতি গ্রহণে অপরোক্ষভাবে বাধ্য করালেন। দেশ জয় ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা মানব সমাজের মতই পুরাণো। এই নূতন সাম্রাজ্যবাদে যা নূতন ছিল তাহল বিজয়ীর হাতের উন্নত যন্ত্রপাতি, তাদের উন্নত প্রয়োগ কৌশল। এই পদ্ধতি জাতিগত আচার-ব্যবহারকে নষ্ট করে প্রত্যেককে জাগিয়ে তুলেছিল। এরই প্রতিক্রিয়ার ফলে জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হল যা আজ সাম্রাজ্যবাদের পতন ঘটিয়েছে।

এখানে স্বীকার করে রাখা ভাল যে যা অবশ্যম্ভাবী তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার ইচ্ছা আমার নেই। বিশপ বাটলার বলেছিলেন, "বস্তু ও ঘটনা যা আছে তা আছে, তাদের পরিণামও যা হবার তাই হবে, অতএব তা নিয়ে আমাদের আত্মপ্রতারণার কি প্রয়োজন?" ঠিক কথা। কিন্তু "বস্তু ও ঘটনা যা আছে" তার ফলটি কি তার বিচার না করাও আর একরকম প্রবঞ্চনা। এই প্রবঞ্চনার ভুল করাটাও সহজ।

একটা ভুল ধারণা এই যে সাম্রাজ্যবাদের পতন ও জাতীয়তাবাদের অভ্যুত্থানের সঙ্গে মানুষের পার্থিব ও নৈতিক উন্নতি ঘটবে। কিন্তু

জাতীয়তাবাদের মূল বিশ্বাসটাই আলাদা। তারা বলে জাতীয়তাবাদের বাইরে প্রগতি, সমর্থ শাসন, স্বাধীনতা ও সভ্যতার কোনও অর্থ নেই। একথা সত্য জাতীয়তাবাদী প্রচার স্বাধীনতা ছাড়াও, আরও অনেক পার্থিব সুখের অঙ্গীকার করে। কিন্তু জাতীয়তাবাদের সেটা মূল কথা নয় ও সে অঙ্গীকারও সে পালন করে না। যেমন একটা রাষ্ট্রের আয়তন বড় হলে তার অর্থনৈতিক উন্নতি তাড়াতাড়ি ঘটে। কিন্তু জাতীয়বাদের ফলে একটি রাষ্ট্র ভেঙে ছোট ছোট রাষ্ট্রে পরিণত হয়। বহু জাতি সংমিশ্রিত একটা রাষ্ট্রে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল হতে পারে কিন্তু এক জাতির একটি রাষ্ট্রে তার মনের অবস্থাটা ভাল থাকে।

পুরাণো আস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যের অবস্থা পরবর্তী ছোট ছোট রাষ্ট্রের অবস্থার চেয়ে ভাল ছিল। কিন্তু একথা আজ ও ১৯১৮ সালে নূতন জাতীয়তাবাদীদের বোঝান অসম্ভব ছিল। তারা শুধু কল্যাণ চায়নি, চেয়েছিল জাতিগত কল্যাণ। প্রথম মহাযুদ্ধে মিত্র পক্ষ জয়ী হবার পর আস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যের লোকেরা তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের সুযোগ পেয়েছিল। সেই সুযোগ তারা গ্রহণ করে। উপর থেকে উড্রো উইলসন কিম্বা হার্বার্ট হুভারের ক্ষমতা ছিল না তাদের সে মত পরিবর্তন করেন।

এই সিদ্ধান্ত অবশ্য আমাদের যুদ্ধে নাবার সঙ্কল্পের চেয়ে কম অযৌক্তিক নয়। "মুক্তি দাও কিম্বা মৃত্যু দাও" এ ধুয়ো শুধু প্যাট্রিক হেনরির একার নয়। যুক্তরাষ্ট্রের কাছাকাছিই অযৌক্তিক জাতীয়তাবাদের পরিচয় নেই কি? মধ্য আমেরিকায় অতগুলি সীমান্তের কি প্রয়োজন? আমেরিকার কটিদেশ বেষ্টন করে যে ছোট ছোট প্রজাতন্ত্রগুলি রয়েছে সেগুলিকে যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে, কিম্বা অন্তত মেক্সিকোর অধীনে এক করা উচিত। কিন্তু এ প্রস্তাব করবে কে? পানামার মত ছোট রাজ্য যা যুক্তরাষ্ট্রের সুবিধার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল, গত পঞ্চাশ বছরে একটা জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে এবং অন্তত প্রচারের দিক থেকেও ওই পানামা আজ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে অসুবিধাকর হয়ে দাঁড়াতে পারে। পানামা ইজিপ্টের অনুকরণ করবে না কেন? জাতীয়তাবাদের দিক দিয়ে দেখলে এর জবাব দেওয়া সহজ হবে না।

ভারতের দিক থেকে ব্রিটিশ শাসনের বোধ হয় একটি মাত্র সুফল হল ভারতের সৃষ্টি। কারণ ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানির আগে ভারতের অস্তিত্ব ছিল না। পরে যুদ্ধের মধ্যে রাস্তা তৈরি করে ও রেলের লাইন বসিয়ে, আইন

প্রচলন করে ভারতের ব্রিটিশ সরকার একটা সংযুক্ত শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। একটা আধা মহাদেশে, যা এর আগে কখনও এক ছিল না, একটা অর্থনৈতিক ঐক্য তাঁরা সৃষ্টি করেন। এই ভারতের স্বাধীনতা লাভের প্রথম ফল হল তার আত্মহত্যা, তার দ্বিভাগ। ওই দেশে দেখা দিল দুটি রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তান। পঞ্চাশ বছর আগে পাকিস্তান নামটাও জানা ছিল না। সাম্রাজ্যবাদের একটি মাত্র সুফলও বিনষ্ট হল। ফরাসী আরোপিত ইন্দো-চীনের একতা ফরাসীদের পরাজয়ের পরে টেঁকেনি ও ইন্দোনেশিয়ার (আমদানি করা নাম) ঐক্য ওলন্দাজ শাসনের অবসানের পর কতদিন টিঁকবে তাতে সন্দেহ আছে। এই বিভক্তির হয়তো প্রয়োজন ছিল, ওই বিভক্তির হয়তো অবশ্যম্ভাবী ছিল, কিন্তু এর জন্য অনেক দাম দিতে হয়েছে।

শুধু এই সব নয়। সাম্রাজ্যের ভাঙন আর একটা সত্যের ইঙ্গিত করে। জাতীয়তাবাদের মধ্যে নূতনত্ব আছে ও সেই সঙ্গে অশুভ লক্ষণ আছে। জাতীয়তাবাদ ক্ষুদ্রতর জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি করে। বিদেশী শাসনের অধীনে যারা মিলে-মিশে থেকেছে তারাই সেই শাসনের অবসানে নিজেদের মধ্যে কাটাকাটি করে। কারণ বিদেশী শাসক এক রকম নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারত। শাসক যখন বিদেশী তখন প্রতিবেশীর শাসনের কথা ভাবতে হয় না। কিন্তু প্রতিবেশী শাসক হয়ে উঠতে চাইলেই স্বদেশে সেই বিদেশী শাসন অসহনীয় হয়ে ওঠে। এইজন্য ভারতীয় মুসলমান হিন্দু আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল, তুর্কীরা সাইপ্রাসের গ্রীকদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। একদা শান্তিপূর্ণ সিংহলে স্বায়ত্তশাসন সম্পূর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে সিংহলীরা তামিলদের শত্রু হিসাবে দেখতে লাগল। এর থেকে বোঝা যায় জাতীয়তাবাদ এক রকম প্রতিক্রিয়া। যদি কোন শাসন-ব্যবস্থা দাবি করে যে তার জাতীয় ঐতিহ্য, জীবনের ধারা, তার ভাষা, ধর্ম ইত্যাদি সব কিছুর মধ্যে ঐক্য আছে, তাহলেও কতকগুলি লোক প্রশ্ন করবে সত্যই কি তাই। উত্তরে প্রায়ই শোনা যায়, না একশ বার না। ও রক্তাক্ষরে লেখা হয় এই অস্বীকৃতি। ওই অবস্থায় শান্তি আনে না, আনে হিংসা, আনে খড়্গ।

এই ভাবেই নানা জাতির সৃষ্টি হয়, নূতন নূতন খণ্ডিত মানব-গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয় যাদের মধ্যে কলহ ও বিভেদটা বড় হয়ে ওঠে। নূতন জাতি যে ইতিহাস তৈরি করে কিম্বা পুরাণো জাতি তার নূতন দাবির সমর্থনে যে ইতিহাস বানায় তাকে অবিশ্বাস করা বা তার বিরুদ্ধ সমালোচনা করাটা

সোজা। জনপ্রিয় ইতিহাস সব দেশেই রূপকথায় ভরা। ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা জাতীয়তাবাদের কষ্টটাকে বহু পিছনে ফেলে এসেছে বলেই তারা ওই রূপকথার সমালোচনা করতে পারে। জাতীয় নেতার লম্বা-চওড়া কথা তারা অগ্রাহ্য করতে পারে, ওয়াশিংটনও যে দিব্যি দিতেন তা তারা বিশ্বাস করতে পারে ও কল্পতরু সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করতে পারে। ১৮৬১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিজের দেশের অনুগত হয়ে ভাল করেছিলেন কিনা তাতে দক্ষিণ আমেরিকার লোকও সন্দেহ প্রকাশ করতে পারে। কয়েকজন জার্মান বিশ্বাস করতে পারে যে বিসমার্কের সাময়িক সাফল্য জার্মানি ও ইউরোপের অশেষ দুর্ভাগ্যের কারণ হয়েছিল।

নূতন জাতির কাছে ঐতিহাসিক ঘটনার এ ধরণের সমালোচনা আমরা আশা করতে পারি না। ভারতীয় শিক্ষিত সমাজে আত্ম-সমালোচনার এই চেষ্টাকে আমাদের প্রশংসা করা উচিত। যে ড্যুর ( Dvur ) ও হোরা ( Hora ) কাব্যকে নিয়ে চেকদের জাতীয় অভিমান আছে তা যে সাহিত্যের জাল তা প্রকাশ করে টমাস মাসারিকও ( Thomas Masaryk ) আমাদের সুখ্যাতির যোগ্য। কিন্তু সব কিম্বা প্রায় সব জাতীয়তাবাদী প্রচার যে মিথ্যা তা আমাদের বোঝা দরকার। বিশ্বাসপ্রবণ ও দয়ালু মার্কিনবাসী যখন কোন নূতন রাষ্ট্রের নূতন নেতাকে মিথ্যার আশ্রয় নিতে দেখেন তখন তার মর্মাহত হওয়া উচিত নয়।

যে পরাধীন জাতি নূতন করে জাগছে তার দুর্দশা যে অনেকটা তার নিজেরই কর্মফল ঐতিহাসিক রূপকথা তাকে সে কথা বুঝতে দেয় না। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যেখানে অত্যন্ত প্রবল সেখানে ছাড়া পরাধীনতা পরাধীন জাতির অবস্থারই একটি বিশেষ লক্ষণ। দুর্বলতার লক্ষণ পরাধীনতা ও পরাধীনতা-মুক্তিতেই সেই দুর্বলতা কেটে যায় না। দুর্বলতা কাটাবার প্রথম ধাপ হয়তো, ও আজকের দিনে নিশ্চয়, স্বাধীনতালাভ। কিন্তু সম্পদ, ঐতিহ্য, সামাজিক আচার-ব্যবহার ইত্যাদির দুর্বলতার উপরে একদিনে ওঠা যায় না। নূতন পতাকা ওড়ানোতে মনের তৃপ্তি আছে, কিন্তু তার বেশী আর কিছু নেই।

জগতের বেশীর ভাগ অংশে যে কবি, দার্শনিক, বক্তা ও গল্পকারের মতের দাম ব্যবসায়ী, বৈজ্ঞানিক ও অর্থনীতিজ্ঞের মতের দামের চেয়ে বড় একথা মাকিনবাসীর পক্ষে বোঝা মুশকিল। আরবরা তাদের নিজেদের

অতীতকে সোনালি কাঁচের মধ্য দিয়ে দেখে সম্পূর্ণ মুগ্ধ। দুই দশক ধরে তারা প্রশ্ন করছে, তারা যারা একদিন ভূমধ্যসাগরের শাসনকর্তা ছিল ও অসভ্য খৃস্টানকে সভ্যতার আলো দেখিয়েছিল, তারা আজ নিজেদের দেশে পরাধীন কেন, কেন তারা অপরের অবজ্ঞা আজ সহ্য করছে? জবাবটা তাদের প্রীতিকর হওয়া চাই, তাদের উৎসাহ যোগান চাই। তাতে আরব ঐক্যের একটা বিরাট চিত্র আঁকা চাই, উত্তরে বলা চাই শুধু পশ্চিমী অত্যাচার ও স্থানীয় দুর্নীতি অতলান্তিক থেকে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত একটা বিরাট জাতির সৃষ্টি বাধা দিচ্ছে। ইজিপ্টও আলজেরিয়ার সম্বলহীনতার যে স্থায়ী ও প্রায় অনতিক্রম্য সমস্যা তার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয় না, এমেন ও সাউদি আরবেরা সুনিশ্চিতভাবে আরবীয় কিন্তু আদিম সমাজ-ব্যবস্থার বিচার করা হয় না। ইজরেলের সঙ্গে বিরোধিতার মধ্যে নিজেদের সামাজিক ও ধর্ম সম্বন্ধীয় কঠিন সমস্যাগুলির কথা তারা ভুলতে চায়। ইসলামের যে সামাজিক পরিণতি তার দোষটা তাদের চোখে পড়ে না। দেশদ্রোহিতার প্রশ্নকে এরা অত্যন্ত বড় করে দেখে। পরাধীন জাতির এটা একটা লক্ষণ।

Let Erin remember the days of old
Ere her faithless sons betrayed her,
When Malachi wore the collar of gold
That he won from the proud invader.

এই আইরিশ গান নূতন জাতিগুলি এখনও গায়। এই জন্যই প্রত্যেক স্বদেশী নেতাকে দেশের আততায়ীদের উপর লক্ষ্য রাখতে হয়। কারণ তারা নেতাদের স্বাভাবিক অবশ্যম্ভাবী বিফলতার মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দেখতে পারে। এই জন্যই ন্যুবি-এস-স্যেদকে জঘন্যভাবে হত্যা করা হয়েছিল, এই জন্যই গান্ধীকে আততায়ীর হাতে মারা পড়তে হয়েছিল।

এই জন্যই নেতারা নিজেদের আত্মরক্ষার্থে বিরোধিতা করার নেতা হয়ে ওঠেন। তাঁরা বিদেশী শাসনের বিরোধী। যে দুর্বলতা ও সামাজিক গঠন পরাধীনতার কারণ তার সমাধানের চেষ্টা তাঁরা করতে চান না। অবশ্য সর্বত্র একথা খাটে না। গান্ধী আত্ম-সংস্কারক ও বিদেশী শাসনের অবসান দুই চেয়েছিলেন। আধুনিক আয়ারল্যাণ্ডের স্রষ্টা গেলিক লীগের একটি বুলি ছিল, "আমরা যেমন বানবা (আয়ারল্যাণ্ড) তেমনই হবে।" কিন্তু আত্ম-সমালোচনার চেয়ে সাম্রাজ্যবাদীকে গালাগালি দেওয়া সহজ। এইজন্য সাম্রাজ্যবাদী যখন দূর হয় তখন দেশের মূল সমস্যাগুলি থেকেই যায়।

ফলে কতকগুলি নূতন রাজ্যের সৃষ্টি হয় যার সম্পদ অল্প, যার সীমান্ত অনির্দিষ্ট, যেখানে অসন্তুষ্ট সংখ্যালঘুর দলের সমস্যা রয়েছে, আরও রয়েছে নিজেদের সম্বন্ধে একটা অকারণ ভাল ধারণা ও ঐশ্বর্যের স্বপ্ন। সেই সঙ্গে এই রাষ্ট্রগুলি পৃথিবীর যেটা অনুন্নত অংশ সেইখানে গড়ে উঠছে। ফলে সমর্থ শাসন ব্যবস্থাতেও যে সব সমস্যা দেখা দেবে তা সমাধান করা প্রায় অসম্ভব। সেখানে জন্মহারের পাল্লা দিয়ে এগোন ও উন্নতির বদলে পিছিয়ে না পড়ার ভয়টাই নেতাদের যথেষ্ট চিন্তার কারণ হতে পারে। একথা বললে অন্যায় হবে না যে জাতিসঙ্ঘের যত সভ্যরা নিউইয়র্কে ভোজ দেন তাদের মধ্যে অর্ধেক জাতি এত দরিদ্র ও অনুন্নত যে তাদের সঙ্গে ইউরোপ ও আমেরিকার যে দেশগুলি সবচেয়ে অনুন্নত, যেমন পর্তুগাল ও মিসিসিপি তাদের সঙ্গে তুলনা হয় না।

কয়েকটি দেশ আছে যাদের কাছে স্বাধীনতাটাও একটা বিলাস। সঙ্কুচিত ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যের কয়েকটি অংশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছে নিতান্তই লোকসানের ব্যাপার। কিন্তু এইসব অঞ্চল স্বাধীনতার বিলাসে নাবতে পারে না, যদিও তাদের সবচেয়ে বুদ্ধিমান নেতারাও একথা স্বীকার করবে না। প্রকৃতির এমন কোন বিধান নেই যে একটি অঞ্চলে, এক ভাষা ও সংস্কৃতির ঐক্য থাকলেই অর্থাৎ সেই অঞ্চলের লোকেদের একটা জাতি হবার গুণ থাকলেই, সেখানে জীবনের অন্যান্য সামগ্রী মজুত থাকবে।

একটা ছোট এলাকায় জগতের প্রায় সমস্ত সম্পদ ও বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ ক্ষমতা জড়ো হওয়ায় যে সমস্যা দেখা গেছে তার অনেক অরাজনৈতিক দিক আছে। একটা জিনিস লক্ষ্য করার বিষয় এই যে পৃথিবীর সমস্ত প্রথম শ্রেণীর শিল্প প্রধান দেশ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের ভিতরে রয়েছে। এর ফলে যে গভীর ও বিপজ্জনক বিভেদের সৃষ্টি হয়েছে তার সমাধানের চেষ্টাকে নিয়ন্ত্রণ করছে সাম্রাজ্যের পরিবর্তে বিভিন্ন জাতির প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক সমস্যা। এইটাই মার্কিনবাসীর জ্ঞানোদয়ের প্রথম কথা। তাদের বোঝা উচিত যে জাতীয় স্বাধীনতা অসাম্য দূর করার পক্ষে একটা বাধা। এই স্বাধীনতা ছোট ছোট প্রতিযোগী রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে ও ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটায় তাদের হাতে যাদের একমাত্র গুণ হল জাতীয় অন্যায়বোধকে কাজে লাগান।

কিন্তু এইটাই শেষ কথা নয়। কারণ এটা অবশ্যম্ভাবী সত্য যে সাম্রাজ্যের দিন শেষ হয়েছে। স্বাধীন জাতীয়তাবাদী রাজ্য এমন কতকগুলি সম্ভাবনার

স্থচনা করেছে ( আমি এ কথায় বিশ্বাস করি না ) যা সাম্রাজ্যবাদীর পক্ষে অসম্ভব ছিল। আর একটা কথা। একবার কোন মানব-গোষ্ঠীকে জাতীয়তাবাদের রোগে ধরলে যতক্ষণ না তারা জাতীয় স্বাধীনতা পায় ততক্ষণ সে রোগ তাদের সারে না। এর ফলে যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অস্থবিধায় তাদের পড়তে হয় তাতে এই নিয়মের হেরফের হয় না। একবার যদি আলজিরিয়ার কোন অধিবাসী মনে করে বসে যে সে ফরাসী নয় কিম্বা হতে চায় না, অর্থনৈতিক স্বযুক্তিতে কোন ফল হয় না। রাজনীতির সম্বন্ধে বার্ণাড শ সাধারণত যে কথা বলতেন তা অর্থহীন, কিন্তু কখনও কখনও কাজের কথাও তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়েছে। তাঁর জন্মস্থান সম্বন্ধে তাঁর একমাত্র নাটক, John bull's other Islandএর ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, "পরাধীন জাতি অনেকটা ক্যানসার রুগীর মত। সে তার রোগ ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পাবে না ও সৎসঙ্গ ত্যাগ করে যে কোনও হাতুড়ে তাকে ভাল করতে বা তার চিকিৎসা করতে চায়, তার হাতে নিজেকে ছেড়ে দেয়।" একথা সত্য ও স্বাধীনতার একটা লাভ তখন অন্য লাভবান চিন্তায় আমরা নিজেদের লাগাতে পারি।

অবশ্য এমন যে হবেই তার কোন কথা নেই। ভাবাবেগের দিক থেকে দেখলে অন্যায় বোধের একটা বিশেষ দাম আছে কারণ এতে অন্যের দোষের বিচারে নিজেদের দুরবস্থার কারণ ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়। যে কোনও পরিবারের মাথা এর স্বপক্ষে সাক্ষ্য দেবেন। স্বাধীনতা পাওয়া মানে অভিযোগ হারান। কয়েকটি দেশ এই ওজর ছাড়তে কিছুতেই রাজী নন। আর্জেন্টিনার লোক ইয়াংকি সাম্রাজ্যবাদের অকারণ গালাগালিতে যতটা শক্তির অপব্যয় করেছেন তার দশভাগের একভাগ শক্তিও যদি তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু প্রতিকারযোগ্য সমস্যার সমাধানে নিয়োগ করতেন তাদের অবস্থা অনেক ভাল হত। যদি কোন স্বদেশানুরাগী কিউবান নিজেকে প্রশ্ন করত, "আমাদের দেশে যদি আর একটু বেশী ইয়াংকি সাম্রাজ্যবাদ থাকত তবে আমরা কি পার্থিব দিক দিয়ে আরও সুখী হতে পারতাম না?" যদি সে স্বীকার করত কিউবার আজকের যে সমস্যা তা তাদের নিজেদেরই তৈরি, তবে তার স্বাধীনতা সতর্কভাবে শুভ হত। হাইতি ও ডমিনিকান প্রজাতন্ত্রের দিকে চেয়ে কোন অকপট দ্রষ্টা কি সত্যই বলতে পারেন যে স্বাধীনতা সব অবস্থায় নিষ্কলুষভাবে কল্যাণকর?

স্বাধীনতার সুফল দেখা যায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দুটি রত্ন, ভারত ও

আয়ারল্যাণ্ডে। এক পুরুষের স্বাধীনতায় আইরিশ প্রজাতন্ত্রের জনসাধারণ বুঝতে পেরেছে যে তাদের দুঃখ কষ্টের জন্য আর ইংল্যাণ্ড দায়ী নয়, একটা ক্ষয়িষ্ণু জাতেব হিসেবের খাতায় সীমান্তের কোন নির্দেশ দেওয়া থাকে না। তারা বুঝেছে গ্যালিক লীগের কথাই ঠিক, "আমরা যেমন বানবা তেমন হবে।" ১৯৪৮ সালে আয়ারল্যাণ্ডে কমনওয়েলথের সঙ্গ ত্যাগ করার সিদ্ধান্তটা যে কোন বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেব কাছে মূর্খের কাজ বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ওই সিদ্ধান্তের ফলে তারা বুঝতে পেরেছে প্রজাতন্ত্র তাদের অবস্থাব কোনও উন্নতি করতে পারে নি, তাদের মূল সমস্যা সম্ভব হলে দেশের লোক দেশ ছেড়ে চলে যাওয়াব সমস্যাটা রয়েই গেছে।

ভারতের সমস্যাগুলি এত বিবাট যে বাইবের লোকও হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে (ভারতীযদের কিন্ত কোন ভয নেই)। কিন্তু একটা সুবিধা এই হয়েছে যে এ দেশেব নূতন শাসন-ব্যবস্থা ভারতেব নিজেব যা দোষ-ক্রটি যেমন জাতিভেদ, তার সামনাসামনি দাঁড়াতে পেবেছে। নেহেরুব শাসনে অনেক ভুল ক্রটি আছে কিন্তু নেহেরু ভাবতবাসীকে বলতে পেবেছেন যে তাদেব ভাগ্য তাদের নিজেদেব হাতে। কোন ব্রিটিশ সবকার একথা বলতে পারে না। নূতন ভারত সরকার আপাতদৃষ্টিতে ধর্ম বিবোধী কাজও করতে পারেন যা ব্রিটিশদের পক্ষে কবা অসম্ভব ছিল। নূতন সরকার এখনও অস্পৃশ্যতা দূর করতে পাবেন নি, সমস্ত আদিবাসীদের মনে ভারতের সঙ্গে যোগ সৃষ্টি করতে পারেন নি, স্ত্রীলোকদের বহুদিনের বাধা-বন্ধন থেকে মুক্তি দিতে পারেন নি। ভারতের যেটা এখন একটা প্রধান প্রয়োজন, আলোকপ্রাপ্ত ও সুদক্ষ একটি ব্যবসায়ী সমাজ তারও সৃষ্টি হয নি। কিন্তু সব দিকেই কাজ সুরু হয়েছে। ভারত শুধুমাত্র "হিন্দুস্থান" হযে না ওঠে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। ভারতবাসী পশ্চিমেব কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারছে নিজেদের অপমানিত বোধ না করে।

ভারতের নূতন শাসকেরা এমন কোন কাজে নাবেন নি যা পুরাণো উদার ব্রিটিশ শাসকের কাছে অবাঞ্ছনীয় বলে বোধ হতে পারত। কিন্তু বর্তমান শতকে ভাবতের ব্রিটিশ সরকার নূতন পথে চলবার ক্ষমতা হারিয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদা শক্তি যখন তার কতব্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে পড়ে তখন তার পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে। অতীতের আত্মবিশ্বাসী প্রভুত্বসম্পন্ন ব্রিটিশ শাসকেরা সতীদাহ বন্ধ করেছিলেন, আযুধ্যের মত অনুন্নত রাজ্যকে মানচিত্র থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন, ভারতের স্থানীয় সংস্কৃতি অগ্রাহ্য করে

ইংরেজী ভাষাকে ভারতের সার্বভৌম ভাষা করে তুলেছিলেন। এইসব অবদান ইংরেজের ছিল। এর উপর তারা দিয়ে গিয়েছিল বিশ্বস্ত ও অসামরিক শাসন-ব্যবস্থার অনুগত সেনাবাহিনী ও অত্যন্ত সৎ ও সুদক্ষ অসামরিক শাসকের দল। কিন্তু ব্রিটিশদের যাবার সময় হয়েছিল। সর্ব সময় জাতীয় স্বাধীনতার চিন্তামুক্ত একজন ভারতীয়ের সঙ্গে এখন কথা বললে তাদের পরিবর্তনটা বোঝা যায়। যখন সে ভাষাভিত্তিক দাঙ্গার ছবি দেখে ও হিন্দিকে সর্বভারতীয় ভাষা বলে ঘোষণা করার ফলে দক্ষিণে আর একটি পাকিস্তানের উদ্ভব হবার সম্ভাবনা দেখে তখন সে ম্যাকলেকে ভারতে ইংরাজী প্রচলনের জন্য সাধুবাদও করতে পারে।

ভারতের পক্ষে এই একমাত্র লাভ নয়। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ হয়তো ব্রিটিশ-বিদ্বেষরই ফল কিন্তু এই স্বাজাত্য বোধ ভাষা, বংশ জাত ইত্যাদির বিভেদ সত্ত্বেও তাকে এক করতে পেরেছে। এই ঐক্য যে বাইরের জগতে সে এসে পড়েছে সেখানে তাকে সম্মানের যোগ্য করে তোলে, তার মধ্যে এক নূতন মনোভাবের সৃষ্টি করে। একথা অবশ্য ঠিক যে, যে সম্ভ্রম জাতীয়তাবোধের সঙ্গে জড়িত তা স্পর্শকাতর, অসজ্জন ও অবাস্তব হবে, কিন্তু এর আর অন্য উপায় নেই। আমেরিকার নিগ্রোরা যেমন কর্তাদের অনুগ্রহে আব সন্তুষ্ট নয়, তেমনই শত-সহস্র মানুষ আজ জীবনের নূতন অর্থ খুঁজে পাচ্ছে, তাদের গ্রাম, গোষ্ঠী, জাতির বাহিরে একটা বড় কিছুর প্রতি আনুগত্য ও নিষ্ঠা বোধ করছে।

জাতীয়তাবাদ সাম্রাজ্যবাদকে হারিয়েছে উন্নতির নূতন কলাকৌশল আবিষ্কারের পথে নয়। এদিকে তারা হয়তো পেছিয়েই আছে। জাতীয়তাবাদ এক নূতন মানুষের সৃষ্টি করেছে যে এখনও হয়তো নূতন জগতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে নি, কিন্তু যে সাম্রাজ্যবাদীর মত বিফল হবে না, তার মত অচল হয়ে পড়বে না।

১৭৭৬এর মনোভাবে আমেরিকার বিপ্লবের ঘটনার সঙ্গে আজকের জাতীয়তাবাদের ঘটনার মিথ্যা তুলনা না করে যদি মার্কিনবাসী নূতন জগতের দিকে দৃষ্টি ফেলেন তবে হঠাৎ কোন সহজ সিদ্ধান্ত গ্রহণের অসার্থকতা তিনি বুঝতে পারবেন। নূতন জাতিদের মধ্যে কে কতটা সরব সাম্যবাদ-বিরোধী তার উপর তার বিচার করার রীতিটা যে সম্পূর্ণ ভুল তা তাঁদের বোঝা দরকার। মার্কিনবাসী হয়তো দেখবেন যারা হাঁটতে শেখেনি তারা দৌড়তে সুরু করেছে ও স্বাভাবিকভাবেই তাদের পতন ঘটছে, দেখবেন যাদের জলকূপ ও

ভাল বীজের দরকার তারা ইস্পাতের কারখানা চাইছে, যারা লরি মেরামতের কাজ জানে না তাবা চাইছে আণবিক কামান, যারা জগতের খবর রাখে না তাবা বড বড কথার স্রোত বহিয়ে দিচ্ছে।

আমেরিকাবাসী হয়তো দেখবেন তাদের সামাজিক বাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন ধারাব অনুকবণ কবতে কোনও জাতিই রাজী নয়। তাবা যদি এই নূতন জাতি-গোষ্ঠীকে সাহায্য করতে চান তো অ-মার্কিন প্রথাতেই তা কবতে হবে, ধৈর্য ধবার মত অ-মার্কিন গুণ তাদের আযত্ত করতে হবে। যদি আমেবিকা সাম্যবাদেব বিরোধী মিত্র চায় তবে জাতীয়তাবাদী বাষ্ট্রের মধ্যেই তাকে খুঁজে পাবে। যদিও নূতন জাতি সাম্যবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে রাজী নয়, কিন্তু তাবাই আন্তর্জাতিক সাম্যবাদেব সবচেয়ে বড বাধা। সম্ভবত আজকেব বিরাট যুদ্ধ সমুদ্রতটে যেখানে নৌ-বাহিনী এসে নাবতে পারে সেখানে বাধবে না বাধবে মানুষেব অন্তরে। ইতিহাসে এই প্রথম জগত পার্থিব দিক দিয়ে কার্যকবীভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে ও বিদ্বেষ ও তীব্র ভাবাবেগে অন্তরের দিক দিয়ে পৃথক হয়ে পড়েছে। সাম্রাজ্যবাদের দিনগুলি সম্বন্ধে আমরা ক্ষোভ করতে পাবি কিন্তু আজকের অক্ষম ও অনুন্নত জাতীয়তাবাদী জগতেই আমাদের বাস করতে হবে।

# মৌলিক গবেষণার মৌলিকত্ব কিসে

## হ্যানস সীলাই

সাধারণের জন্য লেখা "The Stress of Life" বইটিতে হ্যানস সীলাই (Hans Selye) যে আবিষ্কার কথা বলেছেন—আমাদের দেহাবয়বে, জীবদেহে, ক্লান্তি, কষ্ট ও রোগের বিরুদ্ধে কতকগুলি সহজাত প্রতিরোধ শক্তি আছে—তা আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেছে। তার আবিষ্কারকে পাস্তুর, কোচ্ (Koch) ও এইরলিচের (Ehrlich) আবিষ্কারের শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। সীলাইএর জন্ম ভিয়েনায় ও এখন তিনি কানাডার নাগরিক অধিকারভুক্ত ও মনট্রিয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের Institute of Experimental Medicine and Surgeryর নির্দেশক।

এতদিন পর্যন্ত আমরা যারা মৌলিক গবেষণায় নিরত জনসাধারণের কাছে আমাদের কাজের ও আমাদের উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা করার কোনও সঙ্গত কারণ খুঁজে পাই নি। গবেষণার সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলি বোঝায় অক্ষম সাধারণ লোকের কাছে এ বিষয়ের আলোচনাটা আমরা অশোভনীয় ও নিজেদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের একটা অবিনয়ী চেষ্টা বলে মনে করেছিলাম। আমাদের ধারণা ছিল যারা মৌলিক গবেষণার জগতে বাস করে তাদের পক্ষেই ওই গবেষণার আলোচ্য বিষয়টি বোঝা সম্ভব। সাধারণের ভাষায় এইসব তথ্য বোঝাবার চেষ্টাটা হাস্যকর বলে আমরা মনে করতাম। আফ্রিকার কোন উপজাতি নেতা যে আমেরিকা দেখেনি ও মটরগাড়ি দেখেনি তার কাছে আমেরিকার মটরগাড়ি শিল্পের সমস্যা উত্থাপন করার মতন ব্যর্থ ও হাস্যকর। তবে বার্টর‍্যাণ্ড রাসেল বলেছেন, "বৈজ্ঞানিককে শুধু যে মানব-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান চর্চা করতে হবে তাই নয়, তাকে আরও ঢের বেশী শক্ত কাজ, সাধারণ মানুষকে তার কথা মেনে চলতে প্ররোচিত করতে হবে। এই কঠিন কাজে তারা যদি সফল না হয় তাহলে মানুষ তার আংশিক জ্ঞান ও কলাকৌশল প্রয়োগে নিজেকেই ধ্বংস করবে।"

আজকের মৌলিক গবেষণা ভবিষ্যতের জীবনরক্ষার ঔষধ ও মারণাস্ত্র দুই সৃষ্টি করতে পারে। এর ফল প্রত্যেককে ভোগ করতে হবে। গণতন্ত্রে

সাধারণ মানুষ ধন-সম্পদের বণ্টন কেমন হবে স্থির করে দেয় ও সে হিসাবে বিজ্ঞানের উন্নতির দায়িত্বও তাকে নিতে হয়। কিন্তু উন্নতি সম্বন্ধেই জ্ঞান না থাকলে তারা বুদ্ধিমানের মত ভোট কাকে দেবে তা স্থির করবে কি করে?

বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ লোকের মধ্যে যে ব্যবধান তা অতিক্রম করা সহজ নয়। অবৈজ্ঞানিক যাতে বুঝতে পারে এমন ভাষায় বৈজ্ঞানিককে তাঁর বক্তব্য ব্যক্ত করতে হবে। অন্যদিকে অবৈজ্ঞানিককে মনে রাখতে হবে যে যতই সোজাভাবে লেখা হ'ক মনোনিবেশ না করলে মৌলিক গবেষণার সারমর্ম বোঝা সম্ভব নয়।

মৌলিক গবেষণা কাকে বলে? পূর্বতন প্রতিরক্ষা সচিব চার্লস ই, উইলসনের সংজ্ঞায় এ এমন কাজ যাতে "তুমি জান না তুমি কি করছ।" এই ঠাট্টা-বিদ্রূপের উদ্দেশ্যে বোধ হয় মৌলিক গবেষণার জন্য যে অল্প অর্থ সাহায্য দেওয়া তার সমর্থন। আরও সাধারণ সংজ্ঞা হল এ ব্যবহারিক গবেষণা, যার ফলটা তখনই প্রয়োগ করে দেখা যায়, তার বিপরীত। এর অর্থ মৌলিক গবেষণার সঙ্গে মানুষের প্রতিদিনের সমস্যার সম্পর্ক অল্প। অস্ত্র-শস্ত্র, টেলিভিশন বা রোগের টীকা প্রভৃতির উদ্ভাবনের একটা ব্যবহারিক দিক আছে। দূরের তারকার আভ্যন্তরীণ তাপ, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জীবকণার ব্যবহার, ফুলের রঙের সংক্রমণ সম্বন্ধীয় বিধি ইত্যাদিকে নিয়ে গবেষণার অন্তত প্রথম দৃষ্টিতে কোন আশু লাভ আছে বলে মনে হয় না। এগুলিকে শিক্ষিত লোকের খেলা হিসাবে ধরা হয়। মৌলিক গবেষকরা মেধাবী কিন্তু খেয়ালী ও অসামাজিক; তাদের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ কিন্তু অকেজো ও কষ্টকল্পিত বিষয়ে তাদের অদ্ভুত আকর্ষণের ফলে সে বুদ্ধি বিপথগামী।

স্কুলে সুদূরবর্তী তারকার আভ্যন্তরীয় তাপ নির্ণয় করা যখন শিখছিলাম তখন আমার নিজের মনের প্রতিক্রিয়ার কথা এখনও মনে আছে। মনে হয়েছিল বুদ্ধির কাজ হলেও এসব কথা মানুষ জানতে চায় কেন? লুই পাস্তুর যখন ঘোষণা করেন যে জীবাণু রোগ বহন করে, তখন অনেকের বিদ্রূপ তাঁকে সহ্য করতে হয়। একজন বয়স্ক লোকের অদৃশ্য অতি ছোট ছোট পোকার কামড়ের এত ভয়! অষ্ট্রিয়ার ধর্মযাজক গ্রেগর জোহান মেনডেল যখন তাঁর মঠের বাগানে লাল ও সাদা মটরের সঙ্কর প্রজননের ফল লক্ষ্য করে আনন্দ উপভোগ করতেন, তখন তাঁর সমসাময়িক দূরদর্শী ব্যক্তিরাও এই পরীক্ষণের গূঢ় তত্ত্ব বুঝতে পারেন নি।

কিন্তু সুদূরবর্তী তারার ব্যবহার না জানলে আজ আমরা আমাদের কৃত্রিম উপগ্রহগুলিকে তাদের কক্ষপথে চালিত করতে পারতাম না। রোগ বীজ সম্বন্ধে মৌলিক জ্ঞান না থাকলে টীকা ও রোগবীজ নাশক ঔষধ বার করতে পারতাম না; মটরের রঙ সংক্রমনের তত্ত্ব না জানলে আধুনিক প্রজনন শাস্ত্র, কৃষি ও ঔষধ প্রয়োগের ক্ষেত্রে যার বিশেষ গুরুত্ব আছে, তার সৃষ্টি হত না।

এইসব কথা বিচার করলে মৌলিক গবেষণার বিষয়ে সাধারণ মানুষের আগ্রহ জাগবে। তারা বুঝবে গবেষণা যত প্রয়োগ-সাধ্য ও সহজ হয়, ততই তা অভিনবত্বহীন, সাধারণ। অন্যদিকে যাকে কষ্টকল্পিত ও অব্যবহার্য ঘটনা বলে মনে হয়, তার থেকেই মৌলিক জ্ঞানলাভ করা যায়, যে জ্ঞান নূতন নূতন আবিষ্কারের পথ দেখায়।

অনেকে বলেন, "শিল্পর জন্য শিল্প" ( Art for arts sake ) এই মতবাদের পিছনে যে মনোভাব আছে, সেই মনোভাব নিয়ে আমাদের মৌলিক গবেষণার কাজে নাবা উচিত, তার প্রয়োগসাধ্যতার বিচার করে নয়। কিন্তু এ কথার সমর্থনেও তাঁরা বলেন যে, অত্যন্ত দুর্বোধ্য গবেষণা থেকে ত শেষ পর্যন্ত ব্যবহারিক ফল লাভ হয়। যাকে অব্যবহার্য বলছি তার সমর্থন তার ব্যবহারিক গুণ সম্ভাবনার বিচারে করতে হবে এটা ঠিক যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় না।

অন্যান্য লোক বলেন মৌলিক গবেষণার গুরুত্ব ধার্য করতে হবে তার ব্যবহারিক সম্ভাবনার বিচারে। এই অতি প্র্যাক্‌টিকালের দল প্রসিদ্ধ ইংরেজ রাসায়নিক ও পদার্থবিদ মাইকেল ফ্যারাডে, একশ' বছর আগে যে কথাগুলি বলেছিলেন তার পুনরাবৃত্তি করেন, "নবজাত শিশুর প্রয়োজন কি ?" কিন্তু আমাদের জীবনে যা কিছু গুরুত্বপূর্ণ তাকে যে প্রয়োজনীয়ও হতে হবে এমন কোন কথা নেই। অথচ গুরুত্বের বিচার থকে উপকারিতার বিচারটাকে আমরা বাদ দিতেও পারি না। হয়তো মানুষের এখনও সংস্কার শূন্য ও নমনীয় অন্তরে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার একটা আশা আছে। সে যাই হক, শিশুর প্রয়োজন তাকে আমরা ভালবাসতে পারি বলে ও জীবনে ভালবাসাকে বাদ দিয়ে আমরা সুখী হতে পারি না। বিশুদ্ধ শিল্প, মহৎ চিত্রকলা বা সঙ্গীতের উপকারিতা হল তা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের চিন্তা ও কাজ থেকে মুক্ত করে আমাদের মনে শান্তি ও সাম্যভাব সৃষ্টি করে। এইসব দিক বিচার করে আমি মৌলিক গবেষণার সংজ্ঞা স্থির করতে বলব যে আশু ফললাভের

চিন্তা বাদ দিয়ে প্রাকৃতিক নিয়মের অনুশীলনের জন্য অনুশীলন—এখানে অবশ্য "আশু" কথাটার উপর জোর দিতে হবে।

কিন্তু আমার মতে মৌলিক গবেষণার সংজ্ঞা বার করার চেয়ে ওই গবেষণার ছোট বড়টা বোঝা বেশী দরকার। এই ছোট বড় সামান্য অসামান্যর পার্থক্য বোঝার গুরুত্ব যারা গবেষণা করছে ও গবেষণার বিষয় স্থির করার জন্য একটা মাপকাঠি চাইছে তাদের কাছেও যতটা, সাধারণ লোক যারা লাভের আশায় ওই গবেষণার পিছনে টাকা খরচ করছে তাদের কাছেও ততটা। জগতের ভবিষ্যৎ কল্যাণ নির্ভর করছে ব্যবহারিক প্রয়োগ বোঝার আগেই প্রথম শ্রেণীর মৌলিক গবেষণার স্থির করার উপর। কোন দেশই সব রকম গবেষণার জন্য টাকা যোগাতে পারে না। আবার অর্থের অভাবে বহু উর্বর ও সম্ভাবনাযুক্ত চিন্তা প্রকাশের আগেই বিনষ্ট হয়ে যায়।

আমার মতে একমাত্র সেইটাই মৌলিক গবেষণা যেটা প্রকৃত আবিষ্কার। এর পরে যা আসে তা ক্রমোন্নয়ন। আবিষ্কাররূপ গবেষণাটাই একমাত্র মৌলিক কারণ তার থেকেই অন্যান্য গবেষণার সূত্রপাত হয়। এই গবেষণাকে অব্যবহার্য ও খাপছাড়া মনে হয় কারণ যা আবিষ্কার, যার সম্বন্ধে আমাদের প্রথম জ্ঞান জন্মাচ্ছে, সে সম্বন্ধে পূব-পরিকল্পনা সম্ভব হয় না। পরিকল্পনার ভিত্তি কতকগুলি জ্ঞাত তথ্যের উপর ও জ্ঞাত তথ্য থাকলে গবেষণার পূর্ণ মৌলিকত্ব থাকে না। এইজন্যই যা সম্পূর্ণ নূতন তা আকস্মিক আবিষ্কার, এমন লোকের আবিষ্কার যার অভাবনীয়কে ধারণা করার বিশেষ বুদ্ধি ও গুণ আছে। এই সম্পূর্ণ মৌলিক তথ্য পরবর্তী গবেষণার ভিত্তি স্বরূপ। এদেরই আমি উন্নয়নমূলক গবেষণা বলছি।

এখন প্রশ্ন হতে পারে যা অভাবনীয় গোড়া থেকে তার মূল্য নিরূপণের চেষ্টাটা অসিদ্ধ হতে বাধ্য। এ কথার মধ্যে কিছুটা সত্য আছে। মৌলিক গবেষণার গুরুত্ব বিচারের কোন নির্দিষ্ট মাপকাঠি নেই। কিন্তু আমার বিশ্বাস আমরা এমন কতকগুলি নীতি উপস্থাপিত করতে পারি যা আমাদের দিক-নির্দেশ করবে। এগুলি সে হিসাবে কোনও মাপকাঠি নয়, বিজ্ঞানকে বোঝার একটা দৃষ্টি ভঙ্গি মাত্র, যা সৃষ্টিমূলক বিজ্ঞান চর্চার আনন্দ উপভোগে ও তার স্বরূপটা চেনায় আমাদের সাহায্য করা।

মহৎ মৌলিক আবিষ্কারের মধ্যে একই সঙ্গে তিনটি বিশেষ গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। এর তথ্যগুলিই শুধু সত্য নয়, তথ্যের ব্যাখ্যাটাও সত্য,

তথ্যগুলিকে একটা সাধারণ নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব ও আবিষ্কারের সময় পর্যন্ত যা জানা ছিল সে হিসাবে তথ্যগুলি বিস্ময়কর।

নব আবিষ্কৃত তথ্যগুলি যে সত্য হবে তা বলাই বাহুল্য, কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে এগুলি সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকেও আমাদের দেখতে হবে। তার থেকে ভুল সিদ্ধান্তে এসে পৌছলে তথ্যগুলি ভ্রান্তিব স্ূচনা কববে।

অল্প কিছুদিন আগে একজন রাসায়নিক ক্ষুধা নিবৃত্তি ও ওজন কমানর জন্য একটা যৌগিক পদার্থ উদ্ভাবনেব চেষ্টা কবেছিলেন। অনেকদিনের অনুসন্ধানের পর ওই পদার্থের গঠন সম্পর্কে তাঁর যে ধারণা ছিল তার অনুরূপ একটা ঔষধ তিনি তৈরি করতে সক্ষম হন। পরে ইঁদুব, বেড়াল, কুকুর ও বাঁদরের উপর তিনি ওই ঔষধেব ফলটা কেমন হয় পবীক্ষা করে দেখেন। তাঁব আশা অনুযায়ী প্রাণীগুলিব ক্ষুধা ও ওজন কমে যায়। একটি প্রবন্ধে এই পরীক্ষাব ফলটি ব্যাখ্যা কবে দেখিয়ে তিনি বলেন কেন ওই বিশেষ রাসায়নিক গঠনযুক্ত পদার্থ প্রাণীদেহের ওপর ঠিক ওই ভাবে কাজ করবে। প্রচলিত অর্থে এ একটি প্রকৃত আবিষ্কার। কিন্তু আমাব মতে এ অযথার্থ আবিষ্কার। সমস্ত হানিকর দ্রব্যই যে ক্ষুধা কমিয়ে দেয় একথা আমাদেব অজানা নয় ও এই নূতন আবিষ্কৃত ঔষধটিও হানিকর। আবিষ্কাবক একথা স্বীকার করেন নি, অস্বীকাবও কবেন নি। ঔষধটা মানুষেব ব্যবহারে আসুক তিনি তা বলেন নি। কিন্তু তাঁর প্রবন্ধেব অপ্রত্যক্ষ অর্থ তাই হয়। এইজন্যই বলেছি ওই আবিষ্কার অযথার্থ। তিনি যদি বুঝতেন যে তাঁর আবিষ্কৃত যৌগিক পদার্থ হানিকর বলেই ক্ষুধা নিবৃত্তি করে তবে তিনি তাঁর আবিষ্কারের কথাটা প্রচার করতেন না। কোনও বৈজ্ঞানিক সজ্ঞানে মিথ্যা প্রচার করেন না। কিন্তু অনেক বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় লেখায় অপ্রত্যক্ষভাবে মিথ্যা তথ্যের বিবৃতি থাকে।

একটা আবিষ্কার সব দিক থেকে সত্য হলেও গুরুত্বহীন হতে পারে। সাম্প্রতিক একটি প্রবন্ধে ল্যাবরেটারির ইঁদুরদের অন্তর-ইন্দ্রিয়গুলির একটা গড়পড়তা ওজন দেওয়া হয়েছে। লেখকের তথ্যগুলি সঠিক। অনেক ইঁদুর মেরে তিনি একটা অর্থপূর্ণ ধারাবাহিক শ্রেণী বার কবেছেন। কিন্তু এ সত্য সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, বিস্ময়করও নয়, সেই হিসাবে এর গুরুত্বটা অল্প। সর্বত্র প্রযোজ্য নয় তার কারণ এর থেকে কোন সাধারণ নিয়মে উপস্থিত হওয়া যায় না। ওই নিয়ম ভিন্ন জাতের ইঁদুরের সম্বন্ধেও হয়তো প্রয়োগ করা যাবে না। এমন কি ল্যাবরেটারির তাপমাত্রা বা ইঁদুরের

খাদ্যের পরিবর্তন করলে গবেষণার ফলটি ভিন্ন হতে পারত। আবিষ্কারের মধ্যে বিস্ময়করও কিছু নেই কারণ গড়পড়তা ওজনটা যে ওজন করে বার করা সম্ভব সেটা জানা ছিল। এই আবিষ্কারগুলিকে যে শুধু মৌলিক গবেষণার শ্রেণীভুক্ত করা যায় না তাই নয়, এগুলি কোনও কাজে লাগান যায় না।

এই পরীক্ষাব ফল সম্বন্ধে শুধু এইটুকু বলা চলে যে এগুলি অন্যান্য মৌলিক অনুসন্ধানের কাজে লাগতে পারে। সে হিসাবেও এগুলি তাহলে মৌলিক নয়। বিজ্ঞান-সাহিত্যে এমন তথ্যের খবর অনেক রয়েছে। এ ক্ষেত্রে লেখকরা সবিনয়ে স্বীকার করেন যে তাঁদের আবিষ্কৃত তথ্য থেকে তাঁরা কোনও সিদ্ধান্তে পৌছতে চান না। কিন্তু এই স্বীকৃতিটা যথেষ্ট নয়। যে তথ্য থেকে কোনও সিদ্ধান্তে আসা যায় না সে তথ্যের মূল্য কি?

এই তথ্যগুলি আকস্মিকভাবে আবিষ্কৃত হতে পারে কিন্তু সাধারণত যাকে "বাছাই" পদ্ধতি বলা তার প্রয়োগে ওই তথ্য পাওয়া যায়। সে হিসাবে এগুলিকে প্রকৃত আবিষ্কার বলা চলে না, এগুলি উন্নয়নমূলক উদ্ভাবন। নিদান-শিক্ষাবিদ (Clinician) যখন বাত বোগীর উপর "কর্টিসন" ঔষধের ফলটা লক্ষ্য করে দেখেন তখন তিনি "বাছাই" পদ্ধতিরই ব্যবহার করেন। "কর্টিসন" এক রকম অন্তর্বাহী রস (hormone) যা বাতের ক্ষেত্রে উপকারী। নিদান-শিক্ষাবিদের কাজ একই রকমের যৌগিক পদার্থের মধ্যে কোনটি আবও বেশি উপকারী তা "বাছাই" পদ্ধতিতে নির্ধারণ করা। এর কোনটাই স্বাধীন সৃষ্টিধর্মী গবেষণা নয়।

এই উন্নয়নমূলক গবেষণার কাজে "অবগামী অনুমান" (deductive reasoning) আমাদের সহায় হয়। এখানে পূর্ব মীমাংসিত সাধারণ নিয়মের উপর নির্ভর করে আমরা বিশেষ ক্ষেত্রে কি হতে পারে, বা ঘটতে পারে তার অনুমান করি। কর্টিসনের মত কোন ঔষধ যদি বাতে কাজে লাগে, তবে ওই জাতের নূতন ঔষধও কাজে লাগার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু অবগামী যুক্তিকে সাধারণ নিয়মে পর্যবসিত করা চলে না। এমন উন্নয়নমূলক গবেষণার একটা তাৎক্ষণিক ব্যবহারগত গুরুত্ব থাকতে পারে, আমরা বাতের শ্রেষ্ঠ ঔষধটা বার করতে পারি, কিন্তু কাজটা ওইখানেই শেষ হয়ে যায়, তার থেকে আর নূতন কিছু আবিষ্কার করা সম্ভব নয়।

দুঃখের বিষয় এমন নীরস গবেষণার জন্যই অর্থসংগ্রহ করা সহজ হয় কারণ এই গবেষণা থেকে একটা আশু ফলের আশা থাকে যাকে অর্থ সাহায্যের হিসাবে যথার্থ ব্যাখ্যা করা যায়।

অন্যান্য পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্য "আরোহ অনুমানের" (inductive reasoning) উপযোগী। এখানে একটি বিশেষ তথ্য থেকে সাধারণ তত্ত্বের অনুমান করা হয়। কিন্তু এরও বিশেষ কোন ফল নেই। যেমন অন্তর্বাহী গ্রন্থিজাত প্রথম যে দশটি অন্তর্বাহী রস তৈরি করা হয় সেগুলি বিশুদ্ধ ও সাদা। এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে পরের পাঁচটি হর্মনও সাদা হবে। কিন্তু তাতে কি? ভবিষ্যৎ হর্মনের রঙ সাদা হবে কি না হবে তাতে আমাদের কি আসে যায়? বস্তুর বাহ্যরূপটা আসল নয়।

আরোহ অনুমানের ক্ষেত্রে আমরা যা পাই তা একাধারে সত্য ও সাধারণ নিয়মের অনুগত। কিন্তু এখানে তৃতীয় গুণটির অভাব—এ গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক গবেষণার পর্যায়ে পড়ে না, এর মধ্যে কোন বিস্ময়ের অনুভূতি নেই।

মেডিকেল স্কুলে পড়বার সময় আমি শুনে বিস্মিত হয়েছিলাম যে মানুষের ডিম্বকোষে যে বিকৃত অঙ্গবৃদ্ধি হয়, যার নাম "ডারময়েড" (dermoids), তাতে দাঁত ও চুল থাকতে পারে। চিকিৎসাশাস্ত্রের দিক থেকে এর নূতনত্ব আছে স্বীকার করি, কিন্তু এই দৃশ্যগত তথ্যকে সাধারণ নিয়ম করে তোলা যায় না—অন্তত এখনও পর্যন্ত তা করা যায় নি। আমরা শুধু বলতে পারি যে সময়ে সময়ে গর্ভাধান হবার আগের, মানুষের ডিম্বকোষের একটি ডিম চুল ও দাঁত সমেত একটা বিকৃত মূর্তিতে পরিণত হতে পারে। সতের শতকে জার্মান চিকিৎসক Scultetus এই বিকৃত আকৃতি ডিমের পরিচয় পেয়েছিলেন ও এই ঘটনার নাম দিয়েছিলেন কেশসংক্রান্ত রোগের প্রকাশ। মার্টিন লুথার একে বলতেন "দানব সন্তান"।

কয়েক শতাব্দী ধরে এই ঘটনা চিকিৎসক সাধারণ মানুষ দুজনার মনেই কৌতূহল জাগিয়েছে। কিন্তু এর থেকে গবেষণার কোন নূতন ক্ষেত্র তৈরি হয়নি। এর কারণ বোধ হয় এই যে তথ্যটি বড় আগে আবিষ্কৃত হয়েছিল। আজও পর্যন্ত আমরা এর মূল্য নিরূপণ করতে পারি না। মানুষের জ্ঞানের পরিধির বাইরে এ একটা আশ্চর্য দূরবস্থিত দ্বীপের মত। হয়তো একদিন, যখন আমরা গর্ভাধান সম্বন্ধে আরও নূতন তথ্য জানতে পারব, যখন গর্ভাধান ছাড়া জন্মের কথা জানতে পারব, যখন যে "সংগঠনী শক্তি" মানবীয় আকৃতি স্থির করে তার কথা জানতে পারব তখন "দানব সন্তান" হয়তো প্রকৃতির রহস্যের সমাধানে দেবদূতের কাজ করবে। কিন্তু কতকগুলি অদ্ভুত তথ্য জেনে কোন ফল নেই। Scultetus দেখেছিলেন, কিন্তু আবিষ্কার করতে পারেন নি।

সাধারণ মানুষ দেখা ও আবিষ্কার করার মধ্যে যে ভিত্তিগত পার্থক্য রয়েছে সেটা বুঝতে পারেন না। আমেরিকার ইণ্ডিয়ান মানবজাতির জন্য আমেরিকা আবিষ্কার করতে পারেনি, দশ শতকে ভিয়েনার জলদস্যুরাও তা পারে নি, আমেরিকা আবিষ্কার করলেন খৃশ্চান কলম্বাস নূতন ও পুরাতন জগতের মধ্যে একটা সেতু সৃষ্টি করে। জানা তথ্যের মধ্যেও ঐক্য সৃষ্টি ও তার সৃষ্টিধর্মী সংশ্লেষণই একমাত্র পরস্পরকে বোঝার ও প্রগতির পথ।

বিখ্যাত মার্কিন রোগবীজাণুতত্ত্ববিদ হ্যান্স জিনজর যেমন বলেছেন, "চিকিৎসার ইতিহাসে প্রায়ই দেখা যায় যে সব তথ্য আমবা বহুদিক থেকে জানি ও প্রয়োগ করে আসছি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কাব সেগুলিকেই স্পষ্ট করে তোলে ও আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করে। অত্যন্ত পুরাণ অণুবীক্ষণযন্ত্র আবিষ্কাব হবার প্রায় একশ' বছর আগে ফ্র্যাকাসটোরিয়াস বোগের সংক্রমণ বিধির ইঙ্গিত করেছিলেন ও অদৃশ্য সূক্ষ্ম জীবাণুর অস্তিত্বের কথা বলেছিলেন। পাস্তরের পূর্ববর্তী শতাব্দীতে রোগ নির্ণয় সম্বন্ধে যে প্রচুর তথ্য সংগ্রহিত হয়েছিল তাতে এই যুগকে মনে হয় নূতন বিজ্ঞানের জন্মের পূর্বের গর্ভধারণের পালা।"

দেখা ও আবিষ্কার করার এই যে মূলগত পার্থক্য তাব পরিচয় দেখি ইনস্থলিনের উদ্ভাবনে। ওই অগ্ন্যাশয় নিঃসৃত হর্মন দিয়ে আমরা বহুমূত্র রোগের চিকিৎসা করি। ১৮৮৯ সালে জার্মান শারীরতত্ত্ববিদ মিনকোস্কি ( Minkowski ) ও তাঁর সহকারী ভন মেরিং ( Von Mering ) কুকুরের অগ্ন্যাশয় অস্ত্রোপচারে বাদ দিয়ে তার মধ্যে বহুমূত্র রোগের সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা বুঝতে পারেন নি যে অগ্ন্যাশয় নিঃসৃত হর্মনের ( ইনস্থলিন ) প্রভাবটাই ওই রোগের কারণ। ফলে ১৯২২ সাল পর্যন্ত যতদিন না ক্যানাডার ফ্রেডারিক ব্যানটিং ( Frederick Banting ) ও তাঁর সহকর্মীরা অগ্ন্যাশয় থেকে ইনস্থলিন বার করে বহুমূত্র রোগের চিকিৎসা করে দেখালেন ততদিন এ বিষয়ে আমাদের জ্ঞান আর অগ্রসর হয়নি।

পরে জানা যায় যে এর সতের বছর আগে ফরাসী শারীরতত্ত্ববিদ মারসেল ইউজিন এমিল গ্লে ( Marcel Eugene Emile Gley ) ব্যানটিংএর অনুরূপ পরীক্ষা করেছিলেন। শীল করা একটা খামে তিনি তাঁর পরীক্ষার কথা সোসিয়েতে দ্য বিয়োলজির ( জীববিদ্যা সমিতি ) কাছে পাঠিয়ে দেন। ১৯২২ সালে ব্যানটিংএর আবিষ্কারের কথা প্রচার হবার পর তিনি সেই খাম খুলতে অনুমতি দেন। এতে তিনিই যে ইনস্থলিনের

প্রথম আবিষ্কারক তা প্রমাণ হল সত্য কিন্তু তিনি যথাযোগ্য সম্মান পেলেন না। বহুমূত্র রোগের উপর একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যখন গ্লে এই অন্যায়ের তীব্র প্রতিবাদ করেন তখন মিনকোস্কি জবাবে বলেন, "আপনার মনোভাব বুঝতে পারছি। যখন মনে হয় ইনস্থলিন আবিষ্কারের কত কাছাকাছি গিয়ে পৌছেছিলাম তখনও আমারও হাত কামড়াতে ইচ্ছা হয়।"

স্পষ্টত গ্লে যা দেখেছিলেন তার গুরুত্ব বুঝতে পারেন নি। দেখা থেকে সাধারণ নিয়মের অনুমান করতে পারেন নি ও ইনস্থলিনকে ঔষধের তালিকাভুক্ত করে দেখেন নি। না হলে একটা শীল করা খামে তাঁর আবিষ্কারের বর্ণনা দিয়েই তিনি সন্তুষ্ট থাকতেন না। তা যদি করতেন তবে সেটা ঘোর অন্যায় হত। ইনস্থলিনের কথা জানতে না দিয়ে তিনি অপরোক্ষ ভাবে বহু বহুমূত্র রোগীর মৃত্যুর কারণ হতেন। গ্লের পরীক্ষণের গুরুত্ব ইনস্থলিন আবিষ্কারের গুরুত্বের চেয়ে অনেক কম। যদি তিনি তার পরীক্ষার তাৎপর্য বুঝেই ছিলেন তবে তা প্রকাশ করেন নি কেন? আমার মনে হয় গ্লে আকস্মিকভাবে ইনস্থলিনের পরিচয় পেয়েছিলেন, তিনি তা আবিষ্কার করেন নি।

মৌলিক গবেষণায় আকস্মিকতার উপর বড বেশী জোর পড়েছে। আকস্মিক বা দৈবের তুলনা হয় নারীর সঙ্গে, তাঁকে হাসাতে জানলেই তিনি আমাদের উপর খুশী হয়ে হাসেন।

মৌলিক গবেষণার বাস্তবিক এক বিরাট সাফল্যের কথা ধরা যাক। আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং (Alexander Fleming) দেখেছিলেন যে মানুষের সহের অনুপাতে ব্যবহার করলে পেনিসিলিন নানা রকম রোগবীজাণু নষ্ট করতে পারে। এটা তথ্যের দিক থেকেও যেমন সত্য, তেমনই এর থেকে যে সিদ্ধান্তটা স্পষ্ট ধরা পড়ে যে পেনিসিলিন রোগের সংক্রমণ প্রতিরোধ করে, সে হিসাবেও ওই দেখা সত্য। এর থেকে আমরা একটা সাধারণ নিয়মে পৌছতে পারি। এই আবিষ্কারের পরে অন্যান্য পর্যবেক্ষকেরা ছাতা বা "ফাংগাস" থেকে পেনিসিলিনের মত গুরুত্বপূর্ণ আরও ঔষধ উদ্ভাবন করতে পেরেছিলেন। এই সঙ্গে আমরা দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম যে, যে ছাতা রোগ সংক্রমণের আধার তাই আবার রোগবীজাণুর প্রতিরোধক হতে পারে। একটা অত্যন্ত সৃজনীশক্তিসম্পন্ন ও মৌলিক মন যা প্রচলিত রীতি-নীতির উপরে উঠতে পারে তার দ্বারাই এমন আবিষ্কার সম্ভব। অনেক

রোগবীজতত্ত্ববিদ দেখেছিলেন যে পরীক্ষণের জন্য প্রস্তুত করা বীজাণু ফাংগাসের প্রভাবে নষ্ট হয়ে যায়। এর থেকে তাঁরা শুধু এইটুকু বুঝলেন যে ওই বীজাণুগুলিকে ফাংগাসের কাছ থেকে দূরে রাখতে হবে। এই মৌলিক পরীক্ষণের চিকিৎসার সম্ভাবনা বুঝতে একটি প্রতিভার দরকার হয়েছিল।

মৌলিক গবেষণাকে অবশ্য অজ্ঞাতের সন্ধানে নাবতে হয় জ্ঞাত ঘটনার সঙ্গে সংস্পর্শ রেখে। এর জন্য বৈজ্ঞানিকদের এক রকম স্বাভাবিক অন্তর্দৃষ্টি থাকা চাই। বৈজ্ঞানিকের একটা বড গুণ তিনি সব রকম সংস্কার মুক্ত। স্বয়ংসিদ্ধ ঘটনা বা ধারণাকেও যে তিনি স্বীকার করে নেবেন এমন কোনও কথা নেই। ফলে তাঁর মন সুদূরপরাহত সম্ভাবনার কল্পনায় নিযুক্ত হতে পারে। এর জন্য তাঁর "সেরেনদিপও" থাকা চাই, অযাচিত ঐশ্বর্য আবিষ্কার করার ক্ষমতা থাকা চাই। ("সেরেনদিপও" কথাটা সৃষ্টি করেছেন হিউ ওয়ালপোল ও কথাটা এসেছে "সেরেনদিপের তিন রাজপুত্রের" রূপকথা থেকে। এই তিন রাজকুমার দৈবযোগেই হ'ক বা তাদের বুদ্ধির জোরেই হ'ক সব সময়ে অযাচিত ঐশ্বর্য আবিষ্কার করতো।) বৈজ্ঞানিকের বিমূর্ত চিন্তার ক্ষমতা থাকা চাই। অজানা জগতে প্রবেশ করার পরিকল্পনা প্রথমে মনে মনে করে নিতে হয়, সেখানে বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করার উপায় নেই।

মৌলিক গবেষকের স্বপ্ন দেখার ক্ষমতা থাকা চাই ও সেই স্বপ্নের উপর তার বিশ্বাস থাকা চাই। একটা বিরাট স্বপ্নকে সত্য করে তুলতে হলে, প্রথমে স্বপ্নটা দেখতে হয় ও পরে সেই স্বপ্নকে ধরে থাকতে হয়, তার উপর বিশ্বাস রাখতে হয়। বুদ্ধির সম্বন্ধে আমি "The Stress of Life" বইতে যা বলেছি তারই এখানে পুনরাবৃত্তি করব, "বিশুদ্ধ চিন্তা সাধারণত মধ্য-শ্রেণীর মনের পরিচায়ক। অতি নীচ গুণ্ডা ও অতি বড় স্রষ্টাকে প্রেরণা যোগায় স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও অন্তর্দৃষ্টি, বিশেষ করে বিশ্বাস। বিস্ময়ের কথা যে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় যেখানে মানুষের বিশুদ্ধ চিন্তার শ্রেষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায় সেখানেও ওই একই নীতি খাটে। এই জন্যই বস্তুধর্মী ও নিরপেক্ষ মৌলিক বিজ্ঞানের বই বা পড়ার বই গবেষণার পিছনে আত্মা আছে তাকে আবিষ্কার করতে পারে না।"

বৈজ্ঞানিকের মধ্যে এই সব গুণেরই একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রকাশ থাকা চাই। বিমূর্ত তত্ত্বচিন্তার প্রবৃত্তিটা যদি বেশী হয় তবে সে বইএর পোকা

হয়ে ওঠে ও মিথ্যা তর্ক-বিতর্কের দিকে আকৃষ্ট হয়। বিশ্বাসটাই একমাত্র সম্বল হলে, স্বপ্নটাকে পরীক্ষা করে দেখে তার সত্য প্রমাণ করা হয় না। এই জন্যই প্রকৃত প্রতিভা ও খামখেয়ালীপনার মধ্যে পার্থক্য বোঝাটা এত কঠিন। যে জানে না তার কাছে তাই খেপা লোক ও প্রতিভাশালী লোকের মধ্যে যে পার্থক্য তা সহজে ধবা পড়ে না। কিন্তু উদীয়মান মৌলক গবেষককে প্রথমেই বুঝতে হবে, কারণ তখনই তার প্রতিভার স্ফূর্তির জন্য তার সমর্থনের বিশেষ প্রয়োজন। জাতির সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য ও সামর্থ নির্ভর করে তার মৌলিক গবেষকদের উপর, যাদের বলা হচ্ছে "ডিম্বাকৃতি মস্তিষ্ক", তাদের উপর।

এই জনপ্রিয় শব্দটার প্রকৃত অর্থ কি? আমার মনে হয় "ডিম্বাকৃতি মস্তিষ্কের" প্রধান চেষ্টা হওয়া উচিত এমন সত্যের সন্ধান করা যা অভিজ্ঞতা দিয়ে যাচাই করা যায়। শিল্প-ব্যবসায়ে যে গবেষকেরা নিযুক্ত হন তাঁরা জীবনধারণেব জন্য ওই কাজ করেন, গবেষণা তাঁদেব জীবনের মূল উদ্দেশ্য নয়। যদি তা হয় তবে তাকে "ডিম্বাকৃতি মস্তিষ্ক" বলব। বুদ্ধিজীবী মানুষ বইএ যে কথা লেখা আছে বা বিদ্বান লোক যে কথা বলছেন তা বিনা প্রশ্নে মেনে নিতে পারেন, অভিজ্ঞতা দিয়ে এর সত্যকে যাচাই করবার তাঁর ইচ্ছা জাগে না। ঈশ্বরতত্ত্ববিদ যাদের বিশ্বাস-নিভর বদ্ধমূল ধারণা থাকে, শিক্ষক যাঁরা জ্ঞান-প্রচার করেন, আইনজীবী, ইন্‌জিনিয়ার ও ডাক্তার, যাঁরা জ্ঞানের প্রয়োগ কবেন, সকলেই বুদ্ধিজীবী ও মূল্যবান মানুষ। কিন্তু এঁরা কেউ "ডিম্বাকৃতি মস্তিষ্ক" নন।

অর্থের অভাবের জন্য প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিক নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকবে এমন অবস্থা আর আমাদের স্বীকার করে নিলে চলবে না। "স্পুটনিককে" আদর্শ করে নিয়ে শুধু পদার্থ বিজ্ঞানের চর্চায় সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করলেও চলবে না। আণবিক যুদ্ধ ঘটবে কি ঘটবে না জানা নেই, কিন্তু "প্রাকৃতিক কারণে" রোগ ও মৃত্যুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ সুরু হয়ে গেছে।

কিন্তু বিজ্ঞানের সেবকদের অর্থসাহায্য করাটাই একমাত্র সমস্যা নয়। এই যুগের সঙ্গে মিলিয়ে চলতে গেলে আমাদের দর্শন ও মূল্যজ্ঞানের পুনর্বিচার দরকার। যেমন প্রস্তর যুগে পাথরের, তাম্র যুগে তামার, লৌহ যুগে লোহার ব্যবহারটা প্রধান ছিল, তেমনই আমাদের যুগে নিঃসন্দেহে মৌলিক গবেষণাটাই প্রধান। প্রকৃতির নিয়ম অনুসন্ধান করতে করতে মানুষের হাতে এখন প্রচুর ক্ষমতা এসে জড়ো হয়েছে। এই শক্তি হয় ইতিহাসের শেষ পর্যায়ে

আমাদের নিয়ে যাবে নয় আমাদের জীবনের উজ্জ্বলতম পরিচ্ছেদের সূচনা করবে।

আমাদের জীবনের চূড়ান্ত প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। আমরা কি নিজেদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করব না প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। অর্থলাভের জন্য মানুষ মানুষকে আক্রমণ করে। প্রাধান্য বিস্তারের জন্য এক দেশ অন্য দেশের সঙ্গে যুদ্ধে নাবে। কিন্তু আমাদের প্রকৃত শত্রু প্রকৃতি এবং সেই প্রকৃতিকে আমরা আমাদের আজ্ঞাবহ করতে পারি। এই প্রকৃতির শক্তি এত যে তা আমাদের সকলের বিরোধিতা করতে পারে, আবাব তার ঐশ্বর্যও এত প্রচুর যে তা আমাদের সকলের সেবায় লাগলেও শেষ হয় না।

একদল লোক আছে যাবা ঐশ্বর্য সৃষ্টি করে, আর একদল আছে যে তা নিয়ে কাড়াকাড়ি করে। যারা সৃষ্টি করে তারাই সুখী। ঐশ্বর্য তাদেরই সৃষ্টির আবেগের ফল। বৈজ্ঞানিক গবেষণা করতে ভালবাসে। মহৎ শিল্পপতি শুধু নিজের লাভের জন্যই শ্রমিকের জন্য কাজ ও ক্রেতার জন্য মাল-পত্র সৃষ্টি করে না। শিল্পী শুধু খ্যাতির জন্য ছবি আঁকেন না। এমন স্রষ্টার কাছে কাজ বিরক্তিকর শ্রম নয়, কাজের লোভটা জীবনের চরম উদ্দেশ্য নয়। ধর্ম ও খ্যাতি তাঁদেব কাছে প্রীতিকর হলেও অনেকটা অযাচিত। যে কাজ তাঁরা নিজের জন্য করেন তারই আর একটা পরিণতি।

প্রকৃতির নিয়ম এমন যে তার অন্তর্নিহিত লক্ষ্যগুলি ছদ্মবেশে থাকে যাতে মনে হয় যে আমরা যা কাজ করি তারই অপরিকল্পিত ফল ওই লক্ষ্যের সাধন। (স্বামী-স্ত্রী শয়ন ঘরে ঢোকবার সময় একথা মনে করে ঢোকে না যে সন্তান উৎপাদন তাদের প্রধান উদ্দেশ্য।) এই জন্য জনসাধারণ ও অনেক সময় বৈজ্ঞানিকেরাও প্রশংসা ও পুরস্কারের কোনও প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন না। তথাপি সৃজনী শক্তি সম্পন্ন মানুষকে আমাদের উঁচু আসনে বসাতেই হবে, অর্থের দিক থেকে নয়, তাঁকে উৎসাহ দেবার জন্যও নয়, শুধু এইজন্য যে পরবর্তী যুগে মানুষ যেন বুঝতে পারে আমরা জীবনের মূল্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম।

এ যুগের বালক-বালিকাদের শেখাতে হবে যে বড় বড় যুদ্ধ এর পরে আর বল প্রয়োগের যুদ্ধ হবে না। তখন যুদ্ধ জয়ের অর্থ হবে গৌরবান্বিত, প্রমত্ত ও মুহূর্তের সাহসের প্রকাশে একটি আদর্শের জন্য বিপদ-বরণ বা মৃত্যু-বরণ। আমাদের সন্তান-সন্ততিদের বুঝতে হবে যে যুদ্ধে ও শান্তির সময় অন্য এক

প্রকৃতির যোদ্ধা এর পর জয়ী হবে। এই যোদ্ধা হবে ধীশক্তি সম্পন্ন মানুষ যারা ধীর-স্থিরভাবে তাদের জীবন উৎসর্গ করবে একটা আদর্শের জন্য। তাদের জানতে হবে যে একটা আদর্শের জন্য মরার চেয়ে বাঁচাটা ঢের বেশী শক্ত।

টীকা :—


Selye Hans : The Stress of Life. New York : McGraw-Hill Book Company 1956.

E. A. Burtt : The Metaphysical Foundations of Modern Physical Science. New York : Humanities Press ; 1952

# শিল্প ও জীবন

## স্যার হার্বার্ট রীড্

স্যার হার্বাট রীড, প্রবন্ধকার, সম্পাদক, সমালোচক ও কবি, তাঁর নিজের ভাষায় গত পচিশ বছর শিল্পের পরিচালনায় নিজেকে নিযুক্ত করেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইয়র্কসায়ার রেজিমেণ্টে পদাতিক দলে অফিসার হিসাবে কাজ করার পর স্যার হার্বার্ট লণ্ডনে ভিক্টোরিয়া ও এলবার্ট প্রদর্শনাগারে কর্মী হিসাবে যোগ দেন। পরে তিনি এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুশিল্পের অধ্যাপক পদ গ্রহণ করেন। স্যার হার্বার্ট প্রায়ই যুক্তরাষ্ট্রে যাতায়াত করেন ও সম্প্রতি তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন ও ওয়াশিংটনের জাতীয় শিল্প-গ্যালারিতে ( National Gallery of Arts ) বক্তৃতা দিয়েছেন।

টলস্টয়ের প্রথম দিকের একটি গল্প আছে যাতে, আমার মতে, ধ্বংসাত্মক কাজ যাকে আমবা "অপবাধ" বলি ও স্বষ্টিমূলক কাজ যাকে বলা হয় "শিল্প" তাদের যে সম্বন্ধ সে বিষয়ে একটা মূলগত ইঙ্গিত পাওয়া যায়। টলস্টয় একদিন তাঁর জমিদারির স্কুল থেকে তিনটি অল্পবয়স্ক ছাত্রকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন, গল্পটিতে তারই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সেদিন ক্লাসে গগলের একটা হিংসাত্মক গল্প পড়ে ছেলেগুলির মন উত্তেজিত হয়েছিল এবং সেটা ছিল শীতের চাঁদহীন রাত্রি, মাটি ছিল বরফে ঢাকা ও আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন। ছেলেগুলির মনে তখন দুঃসাহসের ছোঁয়া লেগেছে, তারা প্রথমে বনে গিয়ে ঢুকতে চাইল, যে বনে নেকড়ে বাঘের দেখা পাওয়া যেত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অতখানি সাহস সংগ্রহ করতে না পেরে জঙ্গলের আশেপাশে ঘুরতে ঘুরতে তারা ককেশীয় ডাকাতের গল্প শুরু করে দিল। টলস্টয় তাদের ককেশীয় বীরদের কাহিনী শোনালেন। শোনালেন একজনের কথা যে শত্রু পরিবৃত হয়ে উদাত্ত স্বরে গান স্থরু করে দেয় ও নিজের ছোরা বুকে বিঁধে মৃত্যু বরণ করে।

মৃত্যুর সামনে গান গাওয়ার চিন্তাটা তাদের মনে লাগলেও, যে নৃশংসতার ক্ষুধা তাদের জেগেছিল তা মিটল না। তখন টলস্টয় তাঁর

খুড়ির নিষ্ঠুর হত্যাকাহিনীর বর্ণনা দিলেন, ডাকাতরা যাঁর গলা কেটে রেখে গিয়েছিল। এদের মধ্যে ফেদকা নামে দশ বছরের একটি "কোমল স্বভাব, ভাবগ্রাহী, কবিসুলভ, কিন্তু সাহসী" বালক ছিল, সে হঠাৎ প্রশ্ন করে উঠল, "মানুষ গান গাইতে শেখে কেন? এ কথা আমার প্রায়ই মনে হয়!"

টলস্টয় লিখছেন: "মৃত্যুর আতংক থেকে সে হঠাৎ এই প্রশ্নে কেন চলে এল, তা ভগবানই জানেন। কিন্তু তবু তার গলার স্বর, প্রশ্নের গম্ভীর ভঙ্গি, ও অন্য দুটি ছেলের উত্তর শোনার জন্য নীবব আগ্রহ দেখে মনে হল ওই প্রশ্ন ও তার আগে বলা আমার গল্পের মধ্যে একটা নিগূঢ় সম্বন্ধ রয়েছে। আমি গল্পের মধ্যে অশিক্ষা ও অপরাধের সম্পর্কের কথা বলেছিলাম, তার থেকেই হ'ক, কিম্বা তার সখের (তার সুন্দব গানের গলা ছিল ও গান শেখার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল) সঙ্গে হত্যাকারীব মনোভাবের তুলনায় নিজেকে পরীক্ষা করার চেষ্টাব মধ্যেই হ'ক সে এই সম্বন্ধ খুঁজে পেয়েছিল কিনা জানি না। এমনও হতে পাবে গল্পেব শেষে সে খোলাখলি আলোচনায় তার সমস্যার মীমাংসা করতে চেয়েছিল। কিন্তু সে যাই হ'ক এই প্রশ্ন আমাদেব কাউকেই আশ্চর্য করতে পারে নি।"

ছেলেটির প্রশ্নের উত্তর দিতে না পেরে টলস্টয় নিজেই প্রশ্ন কবলেন, "ছবি আঁকি কেন, ভালভাবে লেখার চেষ্টা করি কেন?" ফেদকাও এই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করল, "ছবি আঁকি কেন?" টলস্টয় বলেছেন, "ছেলেটির আসল প্রশ্ন ছিল শিল্প কেন ও সে প্রশ্নের আমি জবাব দিতে পারিনি।"

সারা জীবন ধরে এই প্রশ্নের কথা টলস্টয় ভেবেছিলেন এবং সাঁইত্রিশ বছর পরে তার "শিল্প কি?" ( What is Art? ) বইএ শিল্প ও জীবনের মধ্যে যে রহস্যপূর্ণ সম্বন্ধ রয়েছে তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিলেন।

টলস্টয় জানতেন এই সম্বন্ধটি অত্যন্ত গভীর। ছেলেগুলিও সহজ প্রবৃত্তির বলে বুঝতে পেরেছিল যে সৌন্দর্য ও হিংসার মধ্যে প্রেম ও মৃত্যুর মধ্যে একটা নিকট সম্বন্ধ রয়েছে। হোমার ও গ্রীক ট্র্যাজিক নাট্যকার, সেক্সপিয়ার ও "যুদ্ধ ও শান্তি"তে ( War & Peace ) টলস্টয় নিজে এই সম্বন্ধের ছবি এঁকেছেন। শুধু আমরা আজকে এই সম্বন্ধের কথা ভুলে গেছি। আমাদের যন্ত্রপ্রয়োগগত সভ্যতা শক্তি ও সম্পদ সংগ্রহের মত্ত আবেগে ওই সব মূল্যকে অস্বীকার করতে শিখেছে। এর দণ্ড হয়েছে জনগণের মধ্যে স্নায়বিক বিকারের প্রাদুর্ভাব যার লক্ষণ হল ভয়াবহ হতাশা, অনাগ্রহ ও নিরর্থকতাবোধ ও হিংসার জন্যই হিংসা।

অল্প কিছুদিন আগে ইংল্যাণ্ডের যুবকের মধ্যে এমনই একটা বর্বরতার পরিচয় পাওয়া গেছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ থেকে আগত এদেশের কালো অধিবাসীদের মার-ধোর করে তাদের বাড়ি-ঘর এরা পুড়িয়ে দিয়েছিল। এর সঙ্গে জাতিগত কুসংস্কারের কোন সম্পর্ক নেই। এখানে দেহের চামড়ার রঙ কুপ্রবৃত্তি প্রকাশের একটা ওজর মাত্র, ওই ওজর না থাকলে অন্য কোন অজুহাত বার করা হত। অপ্রাপ্তবয়স্ক অপবাধী ও শিক্ষার আর একটু উচ্চস্তরে "ক্রুদ্ধ যুবকের" দল তাদের হতাশার অবরুদ্ধ অনুভূতিটাই ওই বর্বরতার মধ্যে প্রকাশ করার সুযোগ পেয়েছে। এদের প্রকৃতিব কোন একটা বিশেষ সত্তার স্বাভাবিক ও সুশৃঙ্খল প্রকাশ ঘটে না। ফলে বিরক্তিকর একঘেয়েমী ও কোন কিছু করার জন্য অস্থির আবেগ, এই হতাশাগ্রস্ত যুবকদের মধ্যে ধ্বংস করার প্রবৃত্তি জাগায়। কারণ ধ্বংসের প্রচারক নিহিলিস্ট বাকুনিন যেমন বলেছেন, ধ্বংসও একরকম সৃষ্টি। সঠিক ভাবে বলতে হলে সৃষ্টির আর এক রূপ।

ভাষায় যে হিংস্রভাবের প্রকাশ ঘটেছে—শুধু সাধারণ গল্প-উপন্যাসে, সংবাদপত্রে, চলচ্চিত্রে ও টেলিভিসানে নয়—বিশ্ববন্দিত সংস্কৃতির আধার-স্বরূপ সাহিত্যেও, তার সঙ্গে এই কাজের হিংসার নিঃসন্দেহে সম্বন্ধ আছে। আমেরিকা এ বিষয়ে একা নয়। উইলিয়াম ফ্যকনারের উপন্যাসগুলি বর্বর হিংস্রতা, আমাদের বর্তমান সভ্যতাবই একটা বিশেষ বিকাশের ছবি।

সাহিত্যে অবশ্য হিংসামূলক ছবির অভাব নেই। "ইলিয়াডে" এর প্রচুর পরিচয় রয়েছে। সেকস্‌পিয়ার ও 'সারভঁতের ( Cervants ) লেখাতেও জিঘাংসার যথেষ্ট পরিচয় আছে। কিন্তু এই মহাকবিরা হিংসাকে কখনও ক্ষমা করেন নি। একে তাঁরা ঈশ্বর বিরোধিতার শাস্তি হিসাবে দেখেছেন, কিম্বা বীরত্বের শহিদ হওয়ার আত্মত্যাগ হিসাবে বুঝেছেন। কিন্তু আধুনিক সাহিত্যের বিশেষত্ব নৃশংসতার জন্যই নৃশংস ছবি আঁকা। বোধ হয় মানুষের মৃত্যুযজ্ঞ দেখে দেখে জীবন সম্বন্ধে আমরা সম্ভ্রম হারিয়েছি, যদিও মৃত্যুযজ্ঞ ইতিহাসে বিরল নয়। এখন যুদ্ধের পরে যে ক্লান্ত যুগের সূচনা হয় সেইটাই ইতিহাসে বিরল। শান্তির দিনে যেটা আমাদের প্রধান অনুভূতি তা হল একলা হওয়ার ভয়, কিছু উদ্দেশ্য না থাকার ভয়। এ একটা বিকার যার লক্ষণ হল অধৈর্য ও অস্থির চিত্ততা, অকারণ ও অনির্দিষ্ট ক্রোধ ও বিস্বাদপূর্ণ অবসন্নতা। বর্তমান নিরাপত্তাহীনতাবোধ এই বিকারকে

আরও তীব্র করে তোলে। আণবিক যুদ্ধের ভয় আমাদের জীবনের বিশ্বাসটাকেই কলুষিত করেছে।

প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগমনের সঙ্গে সঙ্গে সারা জগতের এই বিকার আরও বেড়ে উঠেছে। যে মানুষ নিজের হাতে জিনিস তৈরি করতে ভুলে গেছে, যাদের কাজ বোতাম টেপা ও হাতল-টানা, এই বিকার তাদেরই বিশেষত্ব। আজ যে শুধু দৈহিক শ্রমের অভাব ঘটেছে তাই নয়, মনের সৃষ্টিধর্মী কাজও কমে গেছে। অষ্টাদশ শতকের ছুতোর ও বিংশ শতাব্দীর মিস্ত্রির দৈনিক কাজের হিসাব যদি সময় ও গতির মাপে ফুটিয়ে তোলা যায় তা হলে আজকের মিস্ত্রিকে একটা পুনরাবৃত্ত জড বস্তু বলে মনে হবে ও সেদিনের ছুতোরকে তার তুলনায় মুক্ত ও খেয়ালী মানুষ হিসাবে দেখতে পাব। কিন্তু তাদের মধ্যে যেটা মূল পার্থক্য সেটা চোখে পড়বে না—একজনের মন একটা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের চলাফেরার উপর উদ্দেশ্যহীনভাবে স্থির হয়ে আছে ও আর একজনের মন তার ইন্দ্রিয়ের অবিরত সাক্ষ্যের মধ্য দিয়ে একটা জিনিসকে সচেতনভাবে গড়ছে।

রুটিনে বাঁধা কাজ অন্যান্য যুগেও ছিল। কিন্তু সাধারণত মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির প্রত্যক্ষ যোগ ছিল, মানুষ বস্তুর সঙ্গে যুক্ত ছিল, তার উপর নিভরশীল ছিল। শিল্প বিপ্লবের বহু আগেই জঁা জেক্স্ রুশো শিক্ষা নীতির নির্দেশ দিয়েছিলেন, "শিশুকে বস্তুর সঙ্গে যোগ রেখে শিখতে দাও।" রুশোর মতে শিশু চেষ্টা ও ভুল-ভ্রান্তির মধ্য দিয়ে যতটা শিখতে পারে ফরমুলা মুখস্ত করে ততটা পারে না। এই রকম প্রয়োগমূলক শিক্ষা বস্তু-নির্ভর হতে বাধ্য। এখানে কর্ম-পটুতা জন্মায় বস্তুর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। কয়েকটি শিল্প-পদ্ধতিতে এই শ্রেণীর কর্ম-পটুতার প্রয়োজন হয়। আমরা শ্রমিকদের দু'ভাগে ভাগ করি, যারা প্রয়োগমূলক কাজে রপ্ত এবং যারা তাতে রপ্ত নয়। কিন্তু আজকের দিনে এই কর্ম-পটুতার অর্থ একটা যান্ত্রিক-পদ্ধতির জ্ঞান, একটা জিনিসকে নিজের হাতে গড়া নয়। এখানে আমাদের মাথার কাজটা বেশী, আর ইন্দ্রিয়ের কাজ প্রায় নেই। কৃষিক্ষেত্রেও এই একই কথা খাটে; আগেকার কৃষকেরা যেখানে কোদাল ও কাস্তে চালাত সেখানে আজকের কৃষক মিস্ত্রি হয়ে ট্র্যাক্টার চালায়।

মানুষের কর্মরীতির এই যে মূলগত প্রভেদ তাতে মানুষের মানসিক ও নৈতিক জীবনে গভীর পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। এর একটি প্রকাশ ঘটে আমাদের লক্ষ্যহীন আক্রমণাত্মক ব্যবহারে। নিষ্কর্মার মধ্যে এখনও শয়তানের

প্রকাশ ঘটে। আবদ্ধ কর্মশক্তি গতানুগতিক পথে বার হতে না পেরে হিংসার মধ্য দিয়ে ফেটে বেরিয়ে পড়ে।

গ্রীকদের কাছ থেকে পশ্চিমী লোক শিল্পের দর্শন শিক্ষা করেছে, কিন্তু গ্রীকভাষায় শিল্পের অনুরূপ কোন শব্দ ছিল না। "শিল্পের" জায়গায় তারা (techne) কথাটা ব্যবহার করতেন যার অর্থ দক্ষতা "স্কিল"। "স্কিল" কথাটা এসেছে নরওয়ের ভাষা নর্স থেকে যার মৌলিক অর্থ ছিল "পার্থক্যবোধ"। "Ar" এই শব্দমূলের অর্থ "মিলে যাওয়া বা যুক্ত হওয়া।" খুব সম্ভব রোমীয়রা প্রথমে চারুশিল্প ও কারিগরি শিল্পকে প্রভেদ করে দেখেন। তাঁরা শিল্পকে মূর্ত করে তুলেছিলেন ও শিল্পকলাকে সূক্ষ্ম ও সংস্কৃত কাজ হিসাবে ধরতেন। কিন্তু তবু মধ্যযুগেও শিল্পকে দক্ষতার অন্তর্গত করেই দেখা হত, জিনিস তৈরির দক্ষতা বলতে চেয়ার, গান, কাব্য তৈরির দক্ষতা বোঝাতে পারত। স্কুলে যে উদার কলা-শিল্পের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল তাতে ব্যাকরণ, অলঙ্কারশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, পাটিগণিত, জ্যামিতি, সঙ্গীত ও জ্যোতিষবিদ্যার শিক্ষা দেওয়া হত। আমরা আর এই উদার শিল্প শিক্ষার কথা বলি না, আমরা বলি বিজ্ঞান শিক্ষা। অর্থাৎ বিভিন্ন শ্রেণীর জ্ঞান যাকে প্রমাণসাপেক্ষ ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব। শিল্প ছিল দক্ষতা জন্মায় এমন কতকগুলি "কাজ" আর বিজ্ঞান হল যুক্তিতর্কের মধ্যে দিয়ে কোন বিষয় "জানা"।

ভাব ও চিন্তার ইতিহাসের চাবিকাঠি রয়েছে শব্দ ব্যবহারের ইতিহাসের মধ্যে। আমরা এখন মূলে একার্থবোধক শব্দ "techne" ও "ar" এর মধ্যে সম্পূর্ণ পার্থক্য ঘটিয়েছি। প্রয়োগবিদ্যা, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও কারিগরি দক্ষতা এই সবগুলি কথা অপরোক্ষভাবে বুদ্ধিগত বিশেষ প্রয়োগ জ্ঞানকে বোঝায়। এই শব্দগুলি আধুনিক প্রয়োগবিদ্যাগত সভ্যতার বিশেষত্ব। যদিও মৃতপ্রায় কলাশিল্পের বিদ্যালয়গুলি এখনও শিল্পকে "দক্ষতার" পর্যায়ে ফেলে তার শিক্ষার ব্যবস্থা করে থাকেন, শিল্পকে স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগত কাজ বলে ধরা হয়, যে কাজে লিপ্ত হয়ে আছেন অল্প কয়েকজন প্রতিভাশালী পুরুষ। এই কাজকে মূলত প্রেরণাসিদ্ধ কাজ বলে মনে করা হয়, যাতে ব্যক্তিগত প্রকাশ ও তাৎপর্যটাই প্রধান। প্রয়োগবিদ্যাগত সভ্যতায় এর মূল্য বেশী নয়, অনেক দেশের যা অর্থ-সম্বল তাতে সেখানে এই চারুশিক্ষা প্রচলনের সাধ্য থাকে না। প্রয়োগবিদ্যাগত সভ্যতার আদর্শ উৎপাদন দক্ষতা, সৌন্দর্য ও সৌষ্ঠব নয়।

গ্রীকেরা দক্ষতা ও সৌষ্ঠবের মধ্যে পার্থক্য করেনি। তারা এ দুই জিনিসকে এক করে দেখত। প্লেটো বলেছিলেন রাষ্ট্রনীতি এমন এক দক্ষতা যার সঙ্গে তাঁতির কাজের তুলনা করা যায়, অর্থাৎ এখনকার ভাষায় রাষ্ট্রনীতি একটা শিল্প, বিজ্ঞান নয়। রাষ্ট্র-চিন্তায় একটা অন্তর্দৃষ্টি আছে যাতে সবকিছুর মধ্যে একটা রূপদর্শন হয়, এর মধ্যে আইনরক্ষার অত্যাচার নেই। আধুনিক দার্শনিকের সঙ্গে প্লেটোর মিলবে না। আমরা এখন রাজনীতিকে বিজ্ঞান হিসাবে দেখি। আমরা প্রয়োগবিদ্যার বিশেষজ্ঞের অজানা হাতে নিজেদের সমর্পণ করি যারা আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলি বিজ্ঞানসম্মত সংগঠনের মধ্য দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করেন।

প্রশাসন শিল্প ও প্রশাসন বিজ্ঞানের আলোচনাটা এখন নেহাতই পণ্ডিতি বলে মনে হবে, কিন্তু এটা জীবনকে শিল্প হিসাবে বা বিজ্ঞান হিসাবে দেখার যে অতি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা তারই একটা অংশ। অতি গুরুত্বপূর্ণ বলার একটা কারণ আছে। আমার মনে হয় সমস্যাটাকে বোঝা ও যা চাই তা স্পষ্ট করে জানার উপর মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। মানুষের উন্নতির দুই পথের সংযোগস্থলে আজ আমরা এসে দাঁড়িয়েছি বললে হয়তো একঘেয়ে শোনায়, কিন্তু এটা আজকের জীবনের একটা বড় সত্য।

মানুষের "দক্ষতা" বলতে কি বুঝি আরও ভাল করে দেখা যাক। ডাঃ লরেন সি, আইজলি এই বইএর অন্যত্র "দক্ষতার" অর্থ স্পষ্ট করে বলেছেন। এ হল একটা গুণ যার উপর মানুষ জীবন-যুদ্ধে জয়ী হবার জন্য নির্ভর করে এসেছে। বল-প্রয়োগের কিম্বা পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার জন্য মানুষ বিবর্তনের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ আসন পায় নি। সে ওই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে তার চেতনার ক্রমবিকাশে, যে চেতনা বা সংজ্ঞান তাকে জীবনের ভাল-মন্দের বিচারের ক্ষমতা দিয়েছে।

মানুষ যে বিরোধী জড়পদার্থকে নিজের ইচ্ছাধীন করেছে তার দীর্ঘ ইতিহাস সম্বন্ধে আমরা শুধু জল্পনা করতে পারি। কিন্তু একটি শিশু যেভাবে সেই ক্ষমতা ক্রমশ আয়ত্ত করছে সেটা জল্পনার বিষয় নয়। "আন্তর্জাতিক শিক্ষা দপ্তরের" ( International Bureau of Education) পরিচালক ও বিখ্যাত সুইস শিক্ষক, জঁ পিয়াজে ( Jean Piaget ) শিশুর আচরণের উপর অনেকগুলি বই লিখেছেন। এরই এক জায়গায় বুদ্ধির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, মানুষ ও বস্তুর মধ্যে যে সম্বন্ধ

তারই নাম বুদ্ধি। বিশ্ব জগতে জীবদেহের যে বিশেষ স্থান তাকে বাদ দিয়ে তার কোন স্বাধীন চিন্তা ক্ষমতা নেই। বরং ওই চিন্তা ক্ষমতা জীবদেহ ও তার পদার্থগত পরিবেশের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া চলে তার সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু এটা একটা সামান্য প্রতিবর্তী ( reflex ) ক্রিয়া নয়। বহিঃপ্রকৃতির বস্তুকে নিজের আয়ত্তে আনার সঙ্গে সঙ্গে সেই বস্তুগুলিকে বিশেষ মানসিক গঠন দেওয়া হয়। শিশু প্রথমে তার অস্পষ্ট অভিজ্ঞতার মধ্যে নিজেকে হাতড়ে বেড়ায়, পরে কাজ ও তার উদ্দেশ্যের মধ্যে যে কতকগুলি সম্বন্ধ রয়েছে সে বিষয়ে ক্রমশ সচেতন হয়ে ওঠে ও এইভাবে অভিজ্ঞতা থেকে লাভবান হয়। তার কতকগুলি অভ্যাস জন্মায় বিশিষ্ট পরিবেশে কতকগুলি প্রতিক্রিয়ার আপনা থেকেই পুনরাবৃত্তি ঘটে। ক্রমশ নিজেকে "হাতড়ে" বেড়ানর চেষ্টাটা ধারাবাহিক ও নিয়মিত হয়ে উঠে "অভিপ্রায়ের" সৃষ্টি করে। বুদ্ধির বিশেষ অঙ্গ হল এই অভিপ্রায় ( intention )।

বুদ্ধি বলতে তার পিছনে যে অভিপ্রায় থাকবে সেটা আমরা ধরে নিতে পারি। মনের মধ্যে মূর্তি গঠনের যে ক্ষমতা দেখি তার সঙ্গে অভিপ্রায়ের যোগ রয়েছে। এই যোগটাই পরে সাঙ্কেতিক পদ্ধতিতে ভাষার মধ্যে প্রকাশ হয়ে পড়ে। শিশুদের স্তন্যপান প্রতিক্রিয়াগুলির পর্যবেক্ষণ করে পিয়াজে দেখিয়েছেন যে সাধারণ শারীরিক ক্রিয়া অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে শিশু অভিপ্রায় অনুযায়ী নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করে। তখন সে বস্তুর ব্যবহার শেখে ও বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে যে সম্বন্ধ রয়েছে তাকে নিজের কাজে লাগায়। অর্থাৎ বস্তুর সঙ্গে সংযোগে তার বুদ্ধি জাগ্রত হয়। রুশো এই কথাই বলেছিলেন।

অভিপ্রায় বলতে কোনও বস্তুর দিকে যাওয়ার ইচ্ছা বোঝায়। এর পিছনে যে উদ্দেশ থাকে ফ্রয়েডের ভাষায় তা আসে সুখ-লিপ্সা থেকে। দেহের দিক থেকে এই সুখ-লিপ্সার অর্থ একটা সাম্য ও স্বস্তিবোধ সৃষ্টি করা। এর মধ্যে নির্বাচনের প্রয়োজন দেখা যায়—মানসিক স্বস্তি-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বিভিন্ন মানসিক সংযোজনের মধ্য থেকে একটিকে বেছে নেওয়া। যেখানেই নির্বাচন আছে সেখানে মূল্যবোধও আছে। পিয়াজে বলেছেন অভিজ্ঞতার ভিন্ন ভিন্ন স্তরে যা কামনার যোগ্য, যা বাঞ্ছনীয় তারই প্রকাশ ঘটে আমাদের মূল্যবোধে। এবং আমার মতে এই কামনাগত মূল্যবোধ সর্বত্র সৌন্দর্যবোধ বা রসবোধগত। অর্থাৎ আমাদের কাছে যে অভিজ্ঞতার গঠন সবচেয়ে সুখকর বা স্বস্তিদায়ক তাই দিয়েই এই মূল্যবোধগুলি নির্দিষ্ট

হয়। আমাদের সব কাজের অন্তিম লক্ষ্য ওই সাম্যসৃষ্টি ও সাম্যসৃষ্টি যেখানে হয় সেখানেই মূল্যবোধের দেখা পাওয়া যায় তা সে আমাদের প্রাথমিক কার্যক্রমেই হ'ক বা শিল্পের ক্ষেত্রেই হ'ক। শিশুর বুদ্ধিবৃত্তির শুরু যে সব পদ্ধতিতে হয় তার সঙ্গে শিল্পকার্যের সৌন্দর্য যে রীতি নির্ধারিত করে তার অবিচ্ছেদ্য যোগ রয়েছে।

স্বস্তি ও স্থিতি সৃষ্টি করতে পারে এমন যে মূল্য তা কি বোঝার সমস্যাটা এখনও রয়ে গেল। এক শ্রেণীর মনস্তত্ত্ববিদ, যাবা মূলে জার্মান কিন্তু এখন যুক্তরাষ্ট্রে তাদের কাজ চালাচ্ছেন, তাঁরা এই সমস্যার সমাধানে বিশেষভাবে মনঃসংযোগ করেছেন। তাঁদের প্রশ্ন বস্তুকে যে রূপে দেখি সে রূপ সে কিসে পায়? প্রত্যক্ষ উপলব্ধির মধ্যে এর উত্তর তারা খুঁজে পেয়েছেন। ইন্দ্রিয় মারফৎ যে বিশৃঙ্খল মূর্তিগুলি আমাদেব মনে এসে জড়ো হয় উপলব্ধির (perception) পদ্ধতিতে তা একটা সুসঙ্গত আকৃতি পায়। আমরা দেখতে শিখি। মানস প্রতিমাগুলিকে আমরা একটা সুন্দর গঠনে সাজাতে শিখি, এই যে সাজান তার জার্মান শব্দ "গেসতাল্‌ৎ" (Gestalt), যা থেকে এই শ্রেণীর মনস্তত্ত্ববিদের নাম হয়েছে "গেসতালৎ" মতবাদী। অধ্যাপক কাফকার মতে চোখের পটে আলোর উত্তেজনা জাগলে আমাদের স্নায়ুমণ্ডল "সংগঠনের এমন কার্যধারা সৃষ্টি করে যাতে একটা প্যাটাণ বা নক্সা তৈরি হয়, যে প্যাটার্ণ উপস্থিত অবস্থার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। রঙ ও ঔজ্জ্বল্য, আকৃতি ও স্থান, মূর্তি ও পটভূমি, অবস্থিতি ও গতি, সবই ওই সুগঠিত প্যাটার্ণের পরস্পর-নিভর অংশ, যে প্যাটার্ণ চোখের উপর আলোর উত্তেজনার মধ্যে সৃষ্ট হয়।" অর্থাৎ আমাদের স্নায়ুমণ্ডল যেভাবে মনের মধ্যে সুগঠিত নক্সা তৈরি করে তা অনেকটা চিত্রকরের ছবি আঁকার মত। বস্তুর ইন্দ্রিয়লব্ধ ভাবকে নিজের মধ্যে জীবিত করে তাদের মধ্যে একটা তাৎপর্যপূর্ণ সম্বন্ধ স্থির করার যে গুণ, তাতেই মানুষ জগতে তার বিশেষ স্থান পেয়েছে। আধুনিক মানুষের মধ্যে এই গুণের অভ্যাসটাই ক্রমশ কমে আসছে। ব্যবহারের মধ্য দিয়েই মানসিক গুণের বিকাশ ঘটে। ওই ব্যবহারের অভাবের জন্যই মানুষের বুদ্ধির ইমারতের মূল আজ নড়ে উঠেছে। শিশুর স্তন্যপানের প্রতিবর্তী ক্রিয়া এবং গির্জা গড়া বা ঐক্যতান সৃষ্টির জন্য যে গঠনমূলক বুদ্ধির প্রয়োজন তাঁর মধ্যে গভীর প্রভেদ আছে বলে মনে হবে, কিন্তু দুটি ক্ষেত্রেই উপলব্ধির একই নিয়মগুলি কাজ করে। পৃথক করা বা বাছাই করার কাজে ওই একই নিয়ম খাটে। "শিল্প কৌশল" ও "নৈপুণ্য"

শব্দের মধ্যে যে পার্থক্য আমরা করে থাকি তা ওই উপলব্ধির রীতি অনুযায়ীই করি। এর থেকে আমরা বলতে পারি শিল্প-সমালোচনার ক্ষেত্রেও ওই একই নিয়ম কাজ করে। কারণ শিল্পের রসগ্রহণ ও নির্ভর করছে উপলব্ধিগত কতকগুলি মূর্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উপর যা শিল্প-সৃষ্টির অন্তরালে যে রীতিগুলি কাজ করে তারই পুনরাবৃত্তি ঘটায়।

শিল্পী যে ঐক্য সৃষ্টি করতে চান তার ক্রমশ বিকাশ ঘটে নানা বস্তুর ব্যবহার ও উপলব্ধির মধ্য দিয়ে। অন্যদিকে আমরা যারা শিল্পকার্যের রসগ্রহণ করি ওই ঐক্যটাই প্রথমে দেখি ও তারপর যে বিচ্ছিন্ন বস্তু ওই ঐক্য সৃষ্টি করেছে সে বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠি।

শৃঙ্খলা ও ঐক্য সৃষ্টির গুণ আছে বলেই শিল্পকলা আমাদের আনন্দ দেয়। কিন্তু আমরা যা প্রায়ই বুঝতে পারি না তা হল ওই গুণগুলিই মানসিক উৎকর্ষের প্রত্যেক স্তরে বুদ্ধিবৃত্তি থেকে গ্রাহক-কারক প্রতিবর্তী ক্রিয়ার ( Sensorimotor reflexes ) পার্থক্য ঘটায়।

আজকের যান্ত্রিক প্রয়োগমূলক সভ্যতা আমাদের এই পৃথক করার শক্তিটাকে সম্পূর্ণ নষ্ট করে দেয়। অবশ্য একথা সব দেশের পক্ষে সত্য হতে না পারে। বিভিন্ন দেশের সমাজ ব্যবস্থা এক নয়। যদিও এশিয়া ও আফ্রিকা আমদানী করা প্রয়োগশিল্পগত সুবিধাগুলি ভোগ করছে, সেখানে যান্ত্রিক-প্রয়োগের পরিপূর্ণ ফলটি এখনও স্পষ্ট নয়। অতএব আমার বক্তব্য বিশেষ করে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা সম্বন্ধে প্রযোজ্য, যেখানে বেশীর ভাগ মানুষ মাটি, অন্যান্য জীব, কাঠ, কাদা ও ধাতুর স্পর্শ হারিয়েছে। প্রগতিশীল কয়েকটি স্কুলে ছাত্রদের ইন্দ্রিয় অনুভূতি গত শিক্ষা দেবার চেষ্টা হয় বটে। কিন্তু প্রয়োগশিল্প চরম অত্যাচারী, তার রীতি বলে প্রত্যেক স্কুলে ব্যতিক্রমহীনভাবে ধারণাগত চিন্তার শিক্ষা দেওয়া হ'ক। সাইমন ওয়েল ( Simone Weil ) বলেছিলেন, "সমসাময়িক সভ্যতার তিনটি অসুর হল টাকা, যান্ত্রিকতা ও বীজগণিত।"

কিন্তু ওই তিনটি পদ্ধতির মধ্য দিয়েই বিজ্ঞান তার শ্রেষ্ঠ সাফল্যলাভ করেছে, "তর্কশাস্ত্র ও অঙ্কশাস্ত্র, দেখার চেয়ে আত্মগত চিন্তা, শ্রেণী-বিভাগের চেয়ে প্রকল্প, এদের কাছেই আমরা আমাদের আনবিক যুগের বিরাট বিস্ময়ের ( বা বিরাট ভয়ের ) জন্য ঋণী।

এ সবই সত্য ও এখানে বিজ্ঞানের সাফল্যের সঙ্গে তার ক্ষতির আমি পরিমাপ করতে বসব না। আমি এখানে একটি সামাজিক সমস্যার বিচার

করতে বসেছি, বিচার করতে বসেছি সমাজের উদ্বেগ ও নিরাপত্তহীনতার সর্বময় অনুভূতি যা নিঃসন্দেহে আমাদের অপরাধমূলক ও হিংসামূলক কাজে আমাদের প্ররোচিত করে।

অনেকের মধ্যে নৈতিক নীতি প্রবর্তনের আন্তরিক আগ্রহ দেখা যায়। এঁরা বলেন বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে আমাদের নৈতিক জ্ঞান পা ফেলে চলতে পারে নি। মানুষের আজ পাপবোধ নেই, পাপের শাস্তির কথায় সে ভয় পায় না। কিন্তু একটা যান্ত্রিক সভ্যতার সঙ্গে নৈতিক আদর্শের সংঘটনের কোনও ব্যবহারিক পদ্ধতির কথা আমাদের নীতিবাদী দার্শনিক বা ধর্ম-প্রচারকেরা বলতে পারেন নি। নীতির প্রশ্নটা অভ্যাস ও ঐতিহ্যের উপর নির্ভর করে, বিশ্বাসটা সেখানে বড় কথা নয়। নৈতিক আচার ব্যবহার গড়ে ওঠে পারিবারিক, স্কুল ও সামাজিক জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে। গৃহপালিত পশুর মত এই আচার-ব্যবহার নির্দিষ্ট প্রতিবর্তী কাজ হয়ে দাঁড়ায় বলে মনে হতে পারে। মানুষ সাধুতায় বিশ্বাস করলেই সাধু হয়ে ওঠে না। যে জীবনের মধ্যে সে বেড়ে উঠেছে সেই জীবনই তাকে সাধু করে। একটা প্রয়োগগত সমাজের যান্ত্রিক জীবনধারার মধ্যে সৎ ব্যবহারের কি প্রেরণা থাকতে পারে? এটা রাজনৈতিক প্রশ্ন নয়, সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের নৈতিক মূল্য বিচারের প্রশ্ন এতে নেই কারণ আধুনিক প্রত্যেকটি রাজনৈতিক ব্যবস্থাই প্রয়োগমূলক। জগতে যান্ত্রিক আদর্শ আজ সমস্ত নৈতিক আদর্শকে ছাপিয়ে উঠেছে।

বুদ্ধির দুটি রূপ বা ধারা আমাদের শেষ পর্যন্ত মানতেই হয়। একটি ধারার সূত্রপাত ডেকার্তে থেকে তাই একে বলা যাক কার্তেজীয় ধারা। ডেকার্তেই প্রথম বিচার-বুদ্ধিকে বস্তু-বোধ থেকে মুক্ত করেছিলেন। (আমি জানি তাই আমি আছি)। অপর ধারাটির নাম দেওয়া যায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্য-বুদ্ধি যা বিচারের প্রতি স্তরে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে, স্পর্শ রেখে চলে (আমি অনুভব করি তাই আমি আছি; বাস্তব আমার ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি)। কার্তেজীয় বুদ্ধি-বিচার আমাদের যুক্তি ও আদর্শ চিন্তার বিরাট সৌধগুলি তৈরি করেছে। ইন্দ্রিয়গত বুদ্ধি পদার্থ বিদ্যার আবিষ্কার ও শিল্পকার্যের মূলে রয়েছে। আজকের যুগ এই দুই বুদ্ধি ধারার মধ্যে সাম্য রেখে চলে নি। ফলে অনুভূতিশীল মানুষ ও চিন্তাশীল মানুষের মধ্যে এক বিরাট গহ্বরের সৃষ্টি হয়েছে; জ্যামিতিবিদের থেকে অঙ্কশাস্ত্রবিদের ও পরীক্ষা ও ব্যবহারে নিযুক্ত বৈজ্ঞানিকের থেকে বিজ্ঞান দার্শনিকের একটা অনতিক্রম্য ভেদ

সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানকালে উচ্চশিক্ষা গণিতশাস্ত্রের ত্রুটিহীন পূর্ণতার আদর্শে পৌঁছতে চায়। সেখানে প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার কোন প্রয়োজন থাকে না। সকল সত্য সেখানে যুক্তিগত, সত্যের ব্যবহারিক গুরুত্বের সেখানে প্রশ্ন ওঠে না।

ইন্দ্রিয়গত সামঞ্জস্য বুদ্ধিব চর্চা করতে হলে, তাব উৎকর্ষ সাধন করতে হলে, শিক্ষার আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গি দুই বদলাতে হবে। রুশোর কথামত শিশুকে বস্তুমুখী করতে হলে আজকেব শিক্ষাধারাব সমস্ত প্রচেষ্টা, যাতে শিশুকে বস্তু-মুক্ত কবে বাক্য-নিভব কবে তোলা হচ্ছে, তা ত্যাগ কবতে হবে, বিমূর্ত চিন্তার নিগূঢ় চর্চা আমাদেব ছাড়তে হবে। তর্কশাস্ত্র ও বীজ গণিতেব নিয়মানুবর্তিতাব মূল্যগুলি অস্বীকাব কবা হচ্ছে না। কিন্তু এই আদর্শ যাতে পদার্থ ও প্রকৃতি বিজ্ঞানকে ঢেকে না দেয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। নিউটন ও আইনস্টাইনেব মত বৈজ্ঞানিকেবা স্বীকার কবেছেন তাঁবা ইন্দ্রিয়গত অভিজ্ঞতার সুস্পষ্ট মূর্তি-কল্পনার উপর নিভবশীল আব ডারউইনের মত বৈজ্ঞানিক শুধু বিমূর্ত চিন্তাব জগতে বাস কবা নিযে ক্ষোভ প্রকাশ করে গেছেন।

আমরা বৈজ্ঞানিকই হই বা শিল্পীই হই, আমাদেব জীবনেব লক্ষ্য হওয়া উচিত ওয়ার্ডসোয়ার্থেব ভাষায় "আনন্দ যা সর্বসাধাবণে প্রসারিত ( Joy in widest commonalty spread ), লক্ষ্য হওযা উচিত বিকারহীন সামাজিক জীবন, ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ-ভয মুক্ত সভ্যতা। রাষ্ট্রীয় আইন বিধানে দমননীতিব প্রয়োগে আমরা এ আদর্শে পৌঁছতে পারব না। আমাদের জীবনের দিক থেকে পরিবর্তন আসা চাই। যে মূলগত নীতি জন্মের সঙ্গে সঙ্গে বিকশিত জীবনের দৈহিক ও মানসিক সাম্য-সামঞ্জস্য বজায় রাখে তার সঙ্গে আমাদের মিলিয়ে চলতে হবে।

এই নীতিগুলি কি তা জানি। এখন শুধু সেগুলিকে আমাদের সামাজিক সমস্যার মাপে প্রয়োগ কবা চাই, সেগুলিকে জীবনের বিশ্বাসে জাবিত করা চাই, যে বিশ্বাস আমাদেব সকল প্রচেষ্টার প্রেরণা, ধর্মীয় অনুমোদন। জীবন তার অন্তরতম দেশে বোধ ও বিচার শক্তি, সৃষ্টি শক্তি, ও শিল্প। কিন্তু ওই অন্তরতম দেশে প্রবেশ করে জীবনের সৃজনী শক্তিকে মুক্ত করা যাবে কি করে?

টলস্টয় এর যা উত্তব দিয়েছেন, আমার মতে তা ঠিক। টলস্টয় বাস্তব দৃষ্টিশূন্য আকাশচাবী ছিলেন না। জীবনের সমস্ত শোক-দুঃখ আবেগ-আকাঙ্ক্ষা তিনি পূর্ণমাত্রায় অনুভব করেছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে

সৈনিক ও জমিদার, পিতা ও শিক্ষক, পাপী ও সাধু। প্রচুর সম্পত্তির তিনি অধিকারী ছিলেন কিন্তু সেসব দান করে তিনি দারিদ্র বরণ করেন। গদ্যে বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য তিনি লিখে গেছেন ও সাহিত্য জগতের সেরা স্রষ্টার মধ্যে তাঁর নাম থাকবে। তাঁব বৃদ্ধ বয়সের পরিণত লেখা, "শিল্প কি"? ( What is Art ) বইতে তিনি স্কুলের ছাত্র ফেদকার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। শিল্প কেন? স্পষ্ট তিনটি বাক্যে তিনি এর জবাব দেন; শিল্পের মাধ্যমে অনুভূতি শক্তির বিবর্তন ঘটে; শিল্প-সাহিত্য সকলের জন্য; একমাত্র শিল্পের মধ্য দিয়েই আমরা হিংসাকে জয় করতে পারি। "শিল্পের কাজটা বিরাট। বিজ্ঞানের সহায়তায় ও ধর্মের নির্দেশে প্রকৃত শিল্প মানুষের ইচ্ছাকৃত ও আনন্দপূর্ণ কাজের মধ্য দিয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার সূচনা করতে পারে, যে শান্তি-সহযোগিতা এখন আদালত, পুলিশ, দাতব্য প্রতিষ্ঠান, কারখানা পরিদর্শন ইত্যাদি উপায়ে বজায় রাখতে হয়।

টলস্টয়ের সঙ্গে সর্ব বিষয়ে একমত হবার প্রয়োজন দেখি না—অনেক সময় তাঁর নৈতিক সংস্কার তাঁর রস-বিচারকে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু প্লেটোর পরে একমাত্র টলস্টয়কে দেখি যিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে শিল্প জীবনের একটা অলঙ্কার মাত্র নয়, এ "শুধু একটা সুখ, সান্ত্বনা বা আমোদের ব্যাপার নয়···শিল্প জীবনেরই অঙ্গ যা মানুষের বিচারাধীন উপলব্ধিকে অনুভূতিতে রূপান্তরিত করে।" জীবন ও মানুষের প্রগতির ক্ষেত্রে শিল্পের মূল্য বিজ্ঞানের চেয়ে কম নয়। বরং তার আর একটা বড় কাজ মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রেম ও জীবনের প্রেমেব মধ্য দিয়ে তাদের মিলন ঘটান। গান গাইতে শিখি কেন? ছবি আঁকি কেন? টলস্টয় এর জবাব দিলেন ও আজ আমরাও সেই জবাব পেলাম। শিল্প চর্চার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে সজাগ-সমর্থ করে তুলি। তার ব্যবহার শিখি। এ যদি না করতাম, অন্তর যদি শূন্য থাকত ও রূপ ও আকৃতির অনুভূতি যদি না জাগত, তাহলে আলস্যে ও রিক্ততার মধ্যে আমরা হিংসা ও অপরাধ বৃত্তিতে ফিরে যাই। যখন সৃষ্টি প্রেরণার অভাব ঘটে তখন মৃত্যু প্রবৃত্তি দেখা দেয় ও অশেষ, লক্ষ্যহীন ধ্বংসের ইচ্ছা মনে জাগে।

বর্তমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাত্রদের ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা, যাকে অন্যত্র শিল্পের শিক্ষা বলেছি, তা দিতে মোটেই ব্যস্ত নয়। শিশু শিক্ষায়তনে ও কিনডারগার্টেন স্তরে এ বিষয়ে প্রাথমিক কিছু শিক্ষা দেওয়া হয় বটে, কিন্তু তারপরেই শিশুকে

এমন একটা শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রাস করে যাতে অনুভূতির বিবর্তনের কোন স্থান নেই, যেখানে শিল্পের মুক্ত আনন্দ উপভোগের সময়ের অভাব। এই শিক্ষার একমাত্র আদর্শ মস্তিষ্ক দিয়ে জানা। প্রয়োগ শিল্পের অধীন এই সভ্যতার সামাজিক ব্যবস্থাকে যে অল্প কয়েকজন লোক পাশ কাটিয়ে চলতে পারে সৃষ্টি করে শুধু তারাই। শিশুর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বস্তুর সঙ্গে তার সম্পর্ক ঘুচে যায়, বাইরের জিনিসকে মনোমত করে গঠন করার শক্তি সে ক্রমশ হারিয়ে ফেলে, বিভিন্ন রূপ ও আকৃতির পার্থক্যবোধটা তার নষ্ট হয়ে যায়। এই প্রাথমিক জৈব পদ্ধতির উপর শিক্ষার ভিত্তি গড়ার উপায় যদি না আমরা বার করতে পারি তবে প্রেমের মধ্য দিয়ে ঐক্যবদ্ধ একটা নূতন সমাজ গড়ায় শুধু যে অক্ষম হব তাই নয়, বিচ্ছেদ, বিকার ও যুদ্ধের অতলে আমরা ডুবে যাব।

এই শিক্ষা-রীতির জন্য যে পাঠ্যতালিকা দরকার তার ধারণাটা আমাদের কাছে অস্পষ্ট নয়। চল্লিশ বছর আগে ওয়ালটার গ্রোপিয়াস ( Walter Gropius ) জার্মানিতে তাঁর Bauhaus School of Design ( নকশা তৈরির স্কুল ) স্থাপন করে এর প্রমাণ দিয়েছিলেন। তাঁর মনের অভিযান প্রবন্ধে ( অনুবর্তিতার অভিশাপ ) ডাঃ গ্রোপিয়াস লিখেছিলেন, "আমি তাঁদের মতের সঙ্গে একমত যাঁরা বলেন যে আমাদের শিল্পপণ্য উৎপাদনকারী সমাজের অনুবর্তী হওয়ার আগে বা কল্পলোকের মধ্যে আবদ্ধ হবার আগে বিশেষ গুণসম্পন্ন ছাত্রদের বাছাই করে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। যে শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে ব্যবসায়ী ও প্রয়োগদক্ষ ব্যক্তির অনড় মনোভাব ও সৃজনী শক্তি সম্পন্ন শিল্পীর কল্পনার জগতের মধ্যে যোগাযোগ সৃষ্টি করা।

স্নাতকোত্তর স্তরে শিক্ষার জন্য ডাঃ গ্রোপিয়াস যে শিক্ষা-পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন তাকে সর্বস্তরে ব্যবহার করার দায়িত্ব এখন আমাদের।

# কালের সুরুতে

**ফ্রেড হয়েল**

গণিত শাস্ত্রবিদ ও জ্যোতিষ পদার্থ বৈজ্ঞানিক ফ্রেড হয়েলের বয়স এখন ৪৪ বৎসর। ইনি ইয়র্কসায়ারের লোক ও সম্প্রতি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে অল্পবয়স্ক অধ্যাপক হিসাবে যোগ দিয়েছেন। সেণ্ট জন কলেজের জ্যোতিষ ও পরীক্ষণমূলক দর্শনের "প্লুমিয়ান" ( Plumian ) অধ্যাপক। ফ্রেড হয়েল একদিকে কেমব্রিজে অধ্যাপনা করছেন, অন্যদিকে ক্যালিফোর্নিয়ার মাউণ্ট উইলসন ও মাউণ্ট পালমার গ্রহ পর্যবেক্ষণাগারে গবেষণা করছেন। অধ্যাপক হয়েল বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ইত্যাদি ছাড়াও সৃষ্টি তত্ত্বের ( Cosmology ) উপর কতকগুলি জনপ্রিয় বই লিখেছেন ও একটি ভুতুড়ে বৈজ্ঞানিক গল্প লিখেছেন, নাম "কালো মেঘ" ( The Black Cloud ) আর একটি গল্প যন্ত্রস্থ।

যুগ যুগ ধরে মানুষ রাত্রের আকাশের দিকে বিস্মিত দৃষ্টি তুলে ধরে তার চারিদিকের বৃহত্তর বিশ্বের সম্বন্ধে অশেষ জল্পনা-কল্পনা চালিয়েছে। কেমন করে কখন, ও কেন এই জগতের সুরু হল? এর কি কোন শেষ আছে? দেশ, কাল ও পদার্থের রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টায় যে তিনটি তত্ত্বের অবতারণা করা হয়েছে এখানে তার ব্যাখ্যা করব। এই তিন তত্ত্বকে বলা হয়, "বিস্ফোরণ তত্ত্ব", "বিস্তারণ-সঙ্কোচন তত্ত্ব" ও "স্থায়ী-অবস্থিতি তত্ত্ব"। বিশ্ব-জগতের ক্ষেত্রে আবিষ্কার অভিযান সুরু করার আগে এই তিন তত্ত্বের সাধারণ পটভূমিকাটাকে বোঝা দরকার।

পূর্বের তুলনায় বিশ্বের বৃহত্তর দিকের ধারণা আজ আমাদের ঢের বেশী বিস্তৃত ও ঢের বেশী সুসম্বদ্ধ। দশ বছর আগে যে পর্যবেক্ষণ কাজ অসম্ভব ছিল আজ রেডিও ও দৃশ্যমূলক দূরবীক্ষণের সাহায্যে তা সম্ভব হয়েছে। এমন কি কৃত্রিম উপগ্রহে বসান যন্ত্রের সহায়তায় জাগতিক বায়ুমণ্ডল যে দৃষ্টির বাধা সৃষ্টি করে তা আমরা কাটিয়ে উঠতে পারছি। এ ছাড়া কণা পদার্থ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের সাম্প্রতিক অগ্রগতির ফলে বিশ্ব জগতের নানা অবস্থানে পদার্থের আচরণ কেমন হতে পারে তা আমরা সঠিকভাবে গণনা করতে পারছি।

অশেষ তারকাপুঞ্জ আকাশ ঘিরে রয়েছে। ছায়াপথ ( milky way ) এমনই একটি তারকাপুঞ্জ যার একটুকরো অংশ আমাদের এই পৃথিবী। তারকাপুঞ্জগুলি আকাশে দল বেঁধে থাকে, কোনও কোনও দলে হাজার হাজার তারার মণ্ডল রয়েছে, আবার কোন দলে দু-তিনটি মাত্র তারকার দল থাকে। আমাদের তারকাপুঞ্জের দলটি ছোট, এবং একে বলা হচ্ছে স্থানীয় দল। এর দুটি মাত্র প্রধান বিভাগ, এক আমাদের ছায়াপথ ও অন্যটি বিখ্যাত নক্ষত্রপুঞ্জ "এম-৩১", M-31। "এম-৩১" নক্ষত্রপুঞ্জ এন্‌ড্রোমেডা তারকামণ্ডলের ( ছায়াপথের তারকা সমষ্টি ) মধ্য দিয়ে দেখা যায়। আকাশের কোন দিকে দেখতে হবে জানা থাকলে অন্ধকার পরিচ্ছন্ন রাত্রে "এম-৩১কে" খোলা চোখেও দেখা যায়।

ক্যালিফোর্নিয়ার মাউন্ট পালমারের ২০০ ইঞ্চি 'হেল' দূরবীক্ষণে একশ' কোটি তারকামণ্ডল দেখা যায়। কোনও মণ্ডলকে ৩০,০০০,০০০, ০০০,০০০,০০০,০০০,০০০, মাইল দূরেও দেখা যায়। এটাই অবশ্য বিশ্বের সীমা নয়। মহাকাশের অসীম বিস্তারের মধ্যে আরও তারকামণ্ডল ছড়িয়ে থাকতে পারে।

উজ্জ্বল তারকামণ্ডল নিজেদের দলের মধ্যে ঘোরে ও সময়ে সময়ে তাদের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ বাধে। সেই সংঘাত তারাগুলির মধ্যে বাধে না কারণ তাদের আকার মণ্ডলগুলির তুলনায় অত্যন্ত ছোট ও তাদের নিজেদের মধ্যে দূরত্বও খুব বেশী। কিন্তু তারকামণ্ডলে প্রচুর গ্যাসের ধোঁয়া আছে। সংঘাত বাধে তাদের মধ্যে।

এই সংঘাতে গ্যাসের মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়ন জাগে ও সেগুলি অত্যধিক গরম হয়ে ওঠে। এর ফলে তার থেকে রঞ্জন-রশ্মির বিরাট ঢেউ বার হয়ে আসতে থাকে। একশ' কিলোওয়াটের বেতারকেন্দ্র আমাদের পৃথিবীতে যথেষ্ট শক্তিশালী বলে গণনা করা হয়। কিন্তু দুটি তারকামণ্ডলের সংঘাতে যে শক্তি নির্গত হয় তার পরিমাণ ১০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০, ০০০,০০০,০০০,০০০, কিলোওয়াট।

এইখানে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা এসে পড়ে। আমরা দেখি তারকামণ্ডলের বিভিন্ন সমষ্টিগুলি একে অন্যের কাছ থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। একটা সাধারণ উপমা নেওয়া যেতে পারে। ধরা যাক উনুনে মনাক্কার কেক্ সেঁকা হচ্ছে। ধরা যাক সেঁকার সঙ্গে সঙ্গে কেক্‌টা সমানভাবে ফুলে উঠছে, কিন্তু মনাক্কাগুলির আকারের পরিবর্তন হচ্ছে না। এক একটি

মনাক্কাকে এক একটি তারকামণ্ডলের সমষ্টি হিসাবে দেখা যাক ও এর একটির মধ্যে আমরা রয়েছি এমন কল্পনা করতে পারি। কেক্‌টা ফুলতে স্থরু করলে আমরা দেখব অন্য মনাক্কাগুলি আমাদের কাছ থেকে দূরে দূরে সরে যাচ্ছে। যে মনাক্কাটি যত দূরে সেটা তত জোরে সরে যাচ্ছে দেখা যাবে। কেক্‌টা দ্বিগুণ হয়ে ফুলে উঠলে, প্রত্যেক মনাক্কার মধ্যের দূরত্বটাও দ্বিগুণ হয়ে যাবে। যে ছুটো মনাক্কা এক ইঞ্চি দূরে ছিল সেটা এখন ছু' ইঞ্চি দূরে সরে যাবে, যেটা এক ফুট দূরে ছিল, সেটা ছু' ফুট দূরে চলে যাবে। একই সময়ের মধ্যে যখন সব কাজটা ঘটছে, তখন যে মনাক্কাটা বেশী দূরে ছিল সেটা বেশী জোরে সরে যেতে বাধ্য। তারকামণ্ডলের সমষ্টির ক্ষেত্রেও এই একই কথা খাটে।

এই উপমা থেকে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে এসে পৌছতে পারি। আমরা যে-কোন মনাক্কার মধ্যেই থাকি না কেন, অন্যগুলিকে আমরা আমাদের কাছ থেকে সরে যেতে দেখব। অতএব আমরা যে দেখি অন্য সমস্ত তারকামণ্ডলের সমষ্টি আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, তার অর্থ এই হয় না যে আমরা বিশ্বজগতের কেন্দ্রে রয়েছি। বরং এইটাই দৃঢ় সত্য বলে মনে হয় যে বিশ্বের কোন কেন্দ্র নেই। মনাক্কার কেকের সীমা আছে বলেই তার কেন্দ্র আছে বলে আমরা ধরতে পারি। কিন্তু এখানে ধরতে হবে কেক্‌টির বিস্তারের কোন সীমা নেই, যার অর্থ এই হবে আমরা যে পরিমাণ কেক্‌ই কল্পনা করি না কেন, তার চেয়ে আরও বেশী কেকের দেখা পাব।

এর থেকে আমরা "বিস্ফোরণ তত্ত্বে" এসে পড়ি। আমরা দেখেছি তারকামণ্ডল বিস্তৃত হবার সময়, একটা মণ্ডল আর একটা মণ্ডল থেকে দূরে সরে যায়। এর অর্থ মহাকাশে শূন্যস্থান ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। এর আর এক অর্থ পূর্ববর্তীকালে আকাশে তারকামণ্ডলের ভিড় আরও বেশী ছিল। একথা যদি সত্য হয় যে বিশ্বজগতের বিস্তার অবাধে চলে আসছে, তবে একথাও ধরতে হবে একদিন আমাদের আকাশে নক্ষত্রমণ্ডল ঠাসা ছিল। জ্যোতিষ পদার্থ বৈজ্ঞানিকের গণনা থেকে বোঝা যায় আট নয় লক্ষ কোটি বছর আগে বিশ্বাকাশে তারকামণ্ডল জমাট বেঁধে ছিল।

আর একভাবে বিচার করে বলা হয়েছে যে আমাদের ছায়াপথস্থিত নক্ষত্রগুলির বয়স ঠিক করা যেতে পারে তাদের অভ্যন্তরের পরমাণুগুলির অবস্থান্তর দেখে। এই গণনা থেকেও জানা যায় যে সবচেয়ে পুরাণো তারার বয়স আট নয় লক্ষ কোটি বছর। ছুই গণনা থেকেই একই হিসাবে এসে

পৌছান গেছে। এর থেকে মনে হয় এই ব্রহ্মাণ্ড দশ লক্ষ কোটি বছর আগে সৃষ্টি হয়েছিল ও আমাদের ছায়াপথের সৃষ্টি হয়েছিল তার এক লক্ষ কোটি বছর পরে।

একটা মূলগত ধারণা এই যে সৃষ্টির সুরুতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডগত জড় পদার্থ অত্যন্ত ঘনীভূত অবস্থায় ছিল, আজকের নক্ষত্রমণ্ডলের ঘনত্বের চেয়ে তার ঘনত্ব অনেকগুণ বেশী ছিল। এই প্রাথমিক জড় পদার্থ ছিল বিস্ফোরক। বিশ্ব-জগত অতি দ্রুত বিস্তৃত হওয়ায় তার ঘনীভূত অবস্থাটা মাত্র কয়েক মিনিট স্থায়ী হয়েছিল। পরে ব্রহ্মাণ্ডের ক্রমশ বিস্তারের ফলে তার ঘনত্ব আরও কমে যেতে থাকে। ব্রহ্মাণ্ড এক লক্ষ কোটি বছর ধরে বিস্তৃত হওয়ার পর ও তার ঘনত্ব কমতে থাকার পর তারকামণ্ডলগুলির সৃষ্টি হয়। তারপর থেকেই তারকামণ্ডল একে অন্যের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে ও অনাদিকাল ধরে বিশ্বের এই প্রসার চলবে।

এর থেকে দেখা যাচ্ছে "বিস্ফোরণ তত্ত্ব" মতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছিল একটা নির্দিষ্ট সময়ে এবং বিশ্বের প্রসার কখনও বন্ধ হবে না। নক্ষত্রমণ্ডল একে অন্যের কাছ থেকে ক্রমশ দূরে সরে যেতে থাকবে ফলে একটা নির্দিষ্টকাল পরে মহাকাশে সর্বত্র নিরবয়ব শূন্যতা বিরাজ করবে। তারকামণ্ডলের মধ্যেও সব কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। তারা জ্বলবে না ও শক্তির সব উৎস নিঃশেষ হয়ে যাবে।

অল্পকাল আগে পর্যন্ত জ্যোতিষ ও পদার্থবিদরা ভেবেছিলেন যে আর একটি বিচারের মধ্যেও এই তত্ত্বের সমর্থন পাওয়া যাবে। তাঁরা দেখেছিলেন একশ'র কাছাকাছি যে রাসায়নিক মৌলিক পদার্থ আছে তাদের একটা মিল এই যে প্রকৃতির সর্বত্র তাদের বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়। এই যে নিয়ম তার থেকে বোঝা গিয়েছিল যে সবচেয়ে সরল পদার্থ হাইড্রোজেনকে ভিত্তি করে একটা নির্মাণ কাজ চলেছে। কিন্তু যদি অঙ্গার, অম্লজান, লোহা ইত্যাদি জটিল মৌলিক পদার্থ সরল পদার্থ থেকে "তৈরি করা" হয়ে থাকে, তবে প্রশ্ন ওঠে কেমন করে তা হয়েছিল?

প্রথমত মনে হয় ব্যাপক বিস্ফোরণের প্রথম কয়েক মিনিট, যখন ঘনত্ব ছিল অত্যধিক ও উত্তাপ ছিল প্রচণ্ড, জটিল মৌলিক পদার্থ সৃষ্টির পক্ষে আদর্শ সময় ছিল। অর্থাৎ জটিল মৌলিক পদার্থ ইতিহাসের আদিম যুগের সাক্ষ্য বয়ে আনে।

কিন্তু এই যুক্তির ত্রুটি অবিলম্বেই চোখে পড়ল। প্রথমত, এই যুক্তি

আমাদের আণবিক পদার্থ বিজ্ঞানের ধারণার বিরোধী। দ্বিতীয়ত, এই যুক্তি মানলে প্রত্যেক তারকায় ওই জটিল মৌলিক পদার্থগুলি সমান অনুপাতে পাওয়া উচিত। কারণ যে পদ্ধতিতে জটিল পরমাণুর সৃষ্টি হয় তাকে যদি সত্যই বিশ্বজনীন হতে হয়, তাহলে তাদের গঠনে স্থানীয় পার্থক্য ঘটা উচিত নয়। কিন্তু এই স্থানীয় পার্থক্য অনেকটা নিয়ম হয়ে দেখা গেছে। আমাদের তারকামণ্ডলের যেগুলি সবচেয়ে পুরাণো তারা তাদের মধ্যে জটিল মৌলিক পদার্থ অল্পই পাওয়া যায়। সূর্যের মত মধ্যবয়সী তারার জটিল মৌলিক পদার্থ অনেক বেশী। এর থেকে বোঝা যায় জটিল মৌলিক পদার্থ সৃষ্টি হয় তারাগুলির মধ্যে, এর সঙ্গে বিশ্বগঠনের প্রাথমিক ইতিহাসের কোন সম্বন্ধ নেই।

অতএব প্রশ্নটাকে আবার নূতন করে দেখতে হবে। যদি একটা অতি ঘন অবস্থার কথা স্বীকার করি, তবে পদার্থের সেই ঘনীভূত অবস্থায় আণবিক নিদর্শন পাওয়া যায় না কেন? এর একটা সন্তোষজনক উত্তর হয়তো দেওয়া যায়, যদি ধরা হয় বিশ্বের প্রথম অবস্থায় যে পরিমাণ উত্তাপ সৃষ্টি আমরা গণনা করেছিলাম, তার চেয়ে ঢের বেশী উত্তাপের সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ আমরা এখন জানি যে উত্তরোত্তর উত্তাপ বৃদ্ধি হাইড্রোজেনের দ্রবণে অন্য জটিল মৌলিক পদার্থের সৃষ্টিতে সাহায্য করে না বরং তাতে বাধা দেয়। এই জ্ঞানের ফলে "বিস্ফোরণ" তত্ত্বের সংস্কারের প্রয়োজন হল ও তার থেকে আমরা "বিস্তরণ-সঙ্কোচন তত্ত্বে" এসে পৌছলাম।

কয়েকজন জ্যোর্তিবিজ্ঞানী মনে করেন প্রাথমিক অতি ঘনপদার্থের যে প্রথম বিস্ফোরণ ঘটে তা এত তীব্র ছিল না যাতে ওই পদার্থের বিকিরণ সম্পূর্ণ হতে পারে। তাঁরা আরও বিশ্বাস করেন যে নক্ষত্রমণ্ডলের দূরে সরে যাবার গতি ক্রমশ কমে আসছে ও কিছুকাল বাদে নক্ষত্রমণ্ডল এই বিস্তারের গতি হারাবে। তখন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবার তারকামণ্ডলকে কাছের দিকে টানবে। অর্থাৎ বিশ্বের আবার একটা সঙ্কোচন পর্ব শুরু হবে। একের প্রতি অন্য তারকাপুঞ্জের আকর্ষণ শক্তি ক্রমশ বেড়ে যাবে ও একদিন আবার তারকামণ্ডলে তারকামণ্ডলে সংঘর্ষ বাধবে, তারায় তারায় সংঘাত হবে। এই সংঘাত সঙ্কোচনে যে প্রচণ্ড উত্তাপ সৃষ্টি হবে তাতে আবার জটিল মৌলিক পদার্থগুলির বিঘটন ঘটবে ও তা সরল হাউড্রোজেনের মূল পদার্থে পরিণত হবে। এইখানে সঙ্কোচন পদ্ধতির শেষ হয়ে আবার বিশ্বের বিস্তরণ শুরু হবে।

অতএব এই তত্ত্ব থেকে বিশ্বের একটা সম্পূর্ণ পৃথক ছবি পাওয়া যায়। এখানে চক্রাকারে একবার বিস্তরণ ও আবার সঙ্কোচন ঘটছে। বিস্তরণের সময় তারা ও তারকামণ্ডলের সৃষ্টি হচ্ছে। হাইড্রোজেন তারার মধ্যে শক্তি সরবরাহ করে ও ক্রমশ জটিল মৌলিক পদার্থে পরিণত হয়। সঙ্কোচনের সময় তারা ও তারকাপুঞ্জ ভেঙে যায়, সঙ্কোচনজনিত উত্তাপের ফলে জটিল পদার্থের বিঘটন ঘটে ও আবার হাইড্রোজেনের সৃষ্টি হয়। একই ঘটনা চক্রাকারে ফিরে ফিরে ঘটে ও ঘটনাচক্রের কোন শেষ দেখা যায় না। এক একটি পূর্ণ ঘটনার চক্র শেষ হতে তিরিশ লক্ষ কোটি বছর সময় লাগে। আমরা এখন একটা বিস্তরণ পবের মাঝামাঝি কাল অতিক্রম করেছি।

"বিস্তবণ-সঙ্কোচন" মতে বিশ্বের পদার্থের পরিমাণ সীমিত, নির্দিষ্ট। এমন কি মহাকাশের বিস্তারটাও সীমিত। বিস্তরণের সময় মহাকাশ বেলুনের মত ফুলে ওঠে, সঙ্কোচনের সময় আকাশ একটা বিন্দুতে পরিণত হয়।

তৃতীয় তত্ত্বটি, অর্থাৎ স্থায়ী অবস্থিতি তত্ত্ব যার প্রত্যেক মূল বিষয়ে অন্য দুটি তত্ত্ব থেকে ভিন্ন। "বিস্ফোরণ" ও "বিস্তরণ-সঙ্কোচন" তত্ত্বে আমরা ধরে নিই যে এখন যে পদার্থ দেখছি পূর্বেও সেই পদার্থ ছিল। এই ধারণা ভুল হলে বিশ্বের একটা অতি ঘন অবস্থার অস্তিত্বের কথাটাও মিথ্যা হয়ে যায়। অতএব এখন পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে বর্তমান যে পদার্থ দেখতে পাচ্ছি তা আগে ছিল কিনা ও পরে এমন পদার্থের সৃষ্টি হতে পারে কিনা যা এখন নেই।

পদার্থ বিজ্ঞানবিদেরা এ বিষয়ে কি বলেন? তাঁদের মতে কোনও পদার্থকণাই চিরস্থায়ী নয়। এক পদার্থকণা অন্য পদার্থকণায় রূপান্তরিত হতে পারে; নূতন পদার্থকণার সৃষ্টি হতে পারে। এইসব পরিবর্তন ও সৃজন কতকটা আণবিক কেন্দ্রগত কণার প্রভাবে এবং কতকটা তাড়িৎ-চুম্বকশক্তির ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। এই শক্তিক্ষেত্রগুলি পারমাণবিক নাভিকে কেন্দ্রগত করে রাখে ও তাড়িৎ-চুম্বকজনিত আলোক, রঞ্জনরশ্মি ও তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রবাহ সৃষ্টি করে।

কিন্তু বিশ্বের বিস্তারের যে প্রশ্ন সেখানে এই যে অস্থায়িত্ব তার কোন গুরুত্ব নেই। কারণ এখানে আমরা আণবিক বা তাড়িৎ-চুম্বক ক্ষেত্রগত পরিবর্তনেব কথা বলছি না। আমরা মাধ্যাকর্ষণশক্তির ক্ষেত্রে অস্থায়িত্বের বিচার করছি, যে শক্তি প্যারাসুটবহ আকাশচারীকে মাটির দিকে টানে, যার জন্য পৃথিবী সূর্যকে বেষ্টন করে নিজ কক্ষে ঘোরে। মাধ্যাকর্ষণ বিশ্ব-জগতের প্রধান

নিয়ন্ত্রণ শক্তি। কিন্তু আধুনিক পদার্থ বৈজ্ঞানিক মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলতে পারেন না। ল্যাবরেটারি পরীক্ষা থেকে এ বিষয়ে যথেষ্ট তথ্য সংগ্রহ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় নি।

পরীক্ষাগারে মাধ্যাকর্ষণ বিষয়ে অনুসন্ধান করা কঠিন, কারণ সেখানে পদার্থের ছোট-খাট টুকরো নিয়ে আমাদের কাজ করতে হয়। এগুলি আণবিক ও তাড়িৎ-চুম্বক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অভিঘাত সৃষ্টি করতে পারে। এমন কি একটিমাত্র পরমাণুতেও আণবিক শক্তিক্ষেত্রের অনুসন্ধান সম্ভব। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে বুঝতে হলে, তার ফলাফলের সম্যক পরিমাপ করতে হলে, আমাদের বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সামগ্রিক বিচার করতে হবে কারণ বিশ্ব-জগতে যত পরমাণু আছে তাদের মাধ্যাকর্ষণশক্তি বিশ্ব-মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সঙ্গে মিলিত হচ্ছে। এইজন্য মাধ্যাকর্ষণশক্তিকে ভেঙে ভেঙে আলাদা করে তার বিচার করা যায় না, তার সামগ্রিক পরিমাপ চাই। এমন পরিমাপ এখনও সম্ভব হয় নি।

অতএব ল্যাবরেটারি থেকে যথেষ্ট তথ্য সংগ্রহে অপারগ হয়ে আমাদের দুটি সম্ভাবনার বিচার করতে হয়—মাধ্যাকর্ষণশক্তির ক্ষেত্রে, হয় জড়কণা স্থায়ী নয় অস্থায়ী। "বিস্ফোরণ" ও "বিস্তরণ-সঙ্কোচন" তত্ত্বে জড়কণা স্থায়ী কারণ এই মতের সমর্থকেরা পদার্থের অবিরাম সৃষ্টি স্বীকার করে না। "স্থায়ী-অবস্থিতি" মতে জড়কণা অস্থায়ী কারণ এই মতে পদার্থের বিরামহীন সৃষ্টি চলেছে।

আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিক মতবাদ এমন একটা শক্ত কাঠামো দিয়েছে যাতে জড়কণা অস্থায়ী কিনা তা যাচাই করা যেতে পারে। কিন্তু এই কাঠামোকে স্বীকার করে নিলে আমরা যেভাবে অস্থায়িত্বের কল্পনা করতে চাই, তেমনভাবে করা সম্ভব হবে না। আপেক্ষিক মতবাদ স্বীকার করার সুবিধাও যেমন আছে, অসুবিধাও তেমন।

এইসব অসুবিধা বা বাধা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। বাধা কাটিয়ে উঠলে অস্থায়িত্বের অর্থ হয়, হয় পদার্থের নিয়মিত সৃষ্টি, নয় নিয়মিত বিনাশ। দুটো একসঙ্গে হতে পারে না। বিশ্বের একদিকে সৃষ্টি অন্যদিকে ধ্বংস চলেছে এ সম্ভব নয়। পদার্থের সৃষ্টির সঙ্গে জগতের সম্প্রসারণের, বিস্তারের ধারণার যোগ রয়েছে। আইনস্টাইনের গণিতে মহাকাশ পদার্থের একটা নির্দিষ্ট ঘনত্বের বেশী ধারণ করতে পারে না। অর্থাৎ পদার্থের নিয়মিত সৃষ্টি হলে, বিশ্বেরও নিয়মিত সম্প্রসারণ দরকার। একই যুক্তিতে পদার্থের নিয়মিত বিনাশ ঘটলে, বিশ্বের সঙ্কোচন ঘটে। কিন্তু সম্প্রসারণ ও সঙ্কোচন একই

সময়ে ঘটতে পারে না। একটা বেলুনকে একই সঙ্গে ফোলান ও সঙ্কুচিত করা যেমন সম্ভব হয় না।

অতএব আমাদের হয় অবিরাম সৃষ্টি ও অবিরাম সম্প্রসারণ, নয় অবিরাম ধ্বংস ও সঙ্কোচনের ধারণাকে স্বীকার করতে হয়। এই দুই ধারণার বিচার করে দেখতে হবে। কালের গতি সম্বন্ধে পদার্থ বিজ্ঞান দুটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ মেনে নিয়েছে—এক, কালের গতি বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকে চলেছে ও দ্বিতীয় মতে কাল পিছনে ফিরে অতীতের দিকে চলেছে। একটা গোটানো কার্পেটকে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত খুলে ফেলার উপমা নেওয়া যেতে পারে যে পদ্ধতিতে কাল অতীত থেকে বর্তমানের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতে পৌছায়। পদ্ধতিটাকে উল্টে দিলে আমরা শেষ আবার গোড়ায় এসে পৌছাই। বাস্তবিক ক্ষেত্রে আমরা যদি অতীত ও ভবিষ্যতকে সাধারণ ধারণা অনুযায়ী দেখি, আপেক্ষিকবাদ একটিমাত্র সম্ভাব্যের ইঙ্গিতে দেয়, পদার্থের সৃষ্টির মধ্য দিয়ে বিশ্বের সম্প্রসারণের ইঙ্গিত।

বিশ্বাকাশে পদার্থের গড়পড়তা ঘনত্ব যদি একই থাকে তাহলে আমাদের "স্থায়ী-অবস্থিতি" তত্ত্বকে স্বীকার করতে হবে। এই তত্ত্বের কথা প্রথম আলোচনা করি অধ্যাপক হারম্যান বণ্ডি ( Prof. Hermann Bondi ), অধ্যাপক টমাস গোল্ড ( Prof. Thomas Gold ) ও আমি। ঘনত্ব একই রকম থাকলে নক্ষত্রমণ্ডলের সঙ্কোচনের অবস্থা ভবিষ্যৎ, বর্তমান ও অতীত সব সময়েই এক রকম হবে। সম্প্রতি গোল্ড ও আমি শূন্যদেশে পদার্থের অতিরিক্ত তাপ থাকার সম্ভাবনার কথা ও সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে পদার্থের তাপ-হ্রাস হওয়ায় নক্ষত্রমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পরীক্ষা করে দেখেছি। পদার্থখণ্ডের তাপ হ্রাস হওয়ার ফলে তার আভ্যন্তরীণ চাপ আশেপাশের উত্তপ্ত পদার্থের আভ্যন্তরীণ চাপের চেয়ে কমে যাবে। এতে ওই পদার্থ-খণ্ডগুলির সঙ্কোচন ঘটবে। এই যুক্তিধারা মেনে চললে তারকামণ্ডলের সৃষ্টির কারণ বুঝতে আগে যে অন্তরায় দেখা গিয়েছিল সেগুলি আর থাকে না। আমরা আরও দেখি যে তাপহ্রাসের পদ্ধতির মধ্য দিয়ে মহা-জাগতিক রশ্মির ( Cosmic Radio Waves ) উৎপত্তি ও তেজস্ক্রিয় রশ্মি-প্রবাহের একটা ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হতে পারে। রেডিও তরঙ্গের সুদূরবর্তী যে উৎসের সন্ধান রেডিও জ্যোতিষ বৈজ্ঞানিক পেয়েছেন সেখানে এমনই তাপহ্রাস পদ্ধতি চলেছে বলে আমরা বিশ্বাস করি। ওই উৎস স্থানে এখন যে পর্ব চলেছে তাকে নূতন তারকামণ্ডল সৃষ্টি হওয়ার পর্ব বলা চলে।

"স্থায়ী-অবস্থিতি" তত্ত্বে তারকামণ্ডল এক অন্যের থেকে দূরে সরে যায় বটে, কিন্তু সেই নূতন তারকামণ্ডলের সৃষ্টি হয় ও এমন গতিতে হয় যাতে ঘনত্ব কমে না বা বাড়ে না। এক একটি নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে পরিবর্তন-উদ্ভাবন ঘটে, কিন্তু বিশ্ব জগতের কোন পরিবর্তন ঘটে না। অতএব সময়ের সুরু ও শেষের প্রশ্ন এখানে ওঠে না, কারণ বিশ্বের এই মতে কোনও সুরুও ছিল না, তার শেষও নেই। তারকামণ্ডলের, তারার, পরমাণুর সবেরই সুরু ও শেষ আছে কিন্তু বিশ্ব হিসাবে বিশ্বের কোনও সুরুও নেই শেষও নেই।

বিচক্ষণ পাঠক হয়তো ভাবছেন অন্তহীন প্রসারমান বিশ্বে সুদূরবর্তী তারকামণ্ডলগুলির কি অবস্থা হবে। মনাক্কার কেকের উপমায় আমরা দেখিয়েছি যে নক্ষত্রমণ্ডল যত দূরে থাকে তত দ্রুত আমাদের দৃষ্টিপথ থেকে সরে যায়। দূরত্ব ও বেগের মধ্যে যে সম্বন্ধ তা জানি। যাকে আমরা "লাল রশ্মি রেখার অপসরণ" (red shift) বলি সেই পদ্ধতিতে ওই সম্বন্ধের পরিমাপ করতে হয়—এতে একটি বিশেষ তারার আলোক-তরঙ্গ বর্ণালীর উপর দিয়ে চলে যায়। যখন একটা ট্রেণ শ্রোতার কাছ থেকে দূরে সরে যায় ও তার বাঁশীর আওয়াজ কমে আসে তখন শব্দচ্ছটায় এমনই স্থান পরিবর্তন দেখা যায়। দূরবর্তী তারকামণ্ডলের বেগ বাড়তে বাড়তে আলোর বেগকে (প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল) ছাড়িয়ে যায়। তখন তারাকে আর আমরা দেখতে পাই না, তা আমাদের কাছে সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়।

বিশ্বের গঠন সম্বন্ধে এই মতগুলিই প্রধান। পর্যবেক্ষণের উপর কোন মতটা ঠিক তা নির্ভর করে। যেমন নূতন তারকামণ্ডল সৃষ্টি হচ্ছে কি না তা জানতে পারলে আমরা অনেক কিছু বুঝতে পারব। যদি এমন নূতন সৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়, তবে "বিস্ফোরণ" ও "বিস্তরণ-সঙ্কোচন" তত্ত্বে সন্দেহ জাগবে কারণ তাতে নূতন সৃষ্টির কথা নেই। যদি নূতন তারকামণ্ডলের সৃষ্টি না হয় তবে "স্থায়ী-অবস্থিতি" মত অপ্রমাণ হয়ে যায়।

পর্যবেক্ষণের কাজ অবশ্য চলেছে কিন্তু এমন বিশ্ব-দর্শন যে সহজ কাজ নয় তা বুঝতে কষ্ট হওয়া উচিত নয়। যাদের নিয়ে পরীক্ষা হচ্ছে তারা আমাদের জগত থেকে বহু বহু দূরে রয়েছে। অতএব যন্ত্রপাতির শেষ শক্তি-সীমা পর্যন্ত কাজ করতে হয়। এ অবস্থায় অত্যন্ত সাবধানে ও অত্যন্ত ধীরে সুস্থে সূক্ষ্ম সিদ্ধান্ত না গ্রহণ করতে পারলে ভুল হবার সম্ভাবনা খুব বেশী হয়ে পড়ে। অতএব সৃষ্টিতত্ত্বের কোন তত্ত্বটি ঠিক তা তাড়াতাড়ি জানা সম্ভব নয়। জ্যোতিষবিদ্যার ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে একটা স্থির স্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌছান যাবে।

ইতিমধ্যে এই বিভিন্ন মতে বিশ্বের যে বিভিন্ন চিত্র আমরা পাই তার পার্থক্য বিচারের জন্য দার্শনিক প্রমাণের উপর নির্ভর করতে হয়। দার্শনিক প্রমাণ মূল্য-হীন নয়। পরীক্ষা-সাপেক্ষ প্রমাণ যে বড় তা স্বীকার করে নিয়ে আমরা যত দিন না তেমন প্রমাণ পাচ্ছি তত দিন দর্শনের উপর নির্ভর করা অন্যায় হবে না।

"বিস্ফোরণ" তত্ত্বে বিশ্ব জগতের যে ছবি দেখি তাতে একটা অতি ঘন পদার্থের বিস্ফোরণের পরিচয় পাই। এই প্রকল্পে সৃষ্টির একটা বিশেষ মুহূর্তের কল্পনা থাকায় অনেকে এই মতকে স্বীকার করে নিতে চান। এই সিদ্ধান্তে বিশ্ব-জগত স্বয়ংক্রিয় কিছু নয়। একটা বৃহৎ যন্ত্রকে চালু করার মত বিশ্বকে চালু করতে হয়। এই ধারণা সম্বন্ধে এমন সব প্রশ্ন ওঠে যার উত্তর আমরা কল্পনা করতে পারি না। কারণ চালু করার পদ্ধতির উপর জগতের বর্তমান বহু চারিত্রিক বিশিষ্টতার ব্যাখ্যা নির্ভর করে। এই প্রকল্পে বিশ্বের বাহিরে একটি অন্য সত্তার অবস্থিতির ইঙ্গিত আছে, ঈশ্বরতত্ত্ব আছে, যা অনেকের কাছে আকর্ষণীয়, অন্যের কাছে আকর্ষণহীন।

"বিস্তরণ-সঙ্কোচন" ও "স্থায়ী-অবস্থিতি" তত্ত্বের একটা মিল দুয়েতেই জগতকে স্বয়ংক্রিয় হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে। সৃষ্টির কোন সুরু নেই, অতীতকে যতদূর পর্যন্ত দেখতে চাই দেখতে পারি। এ ছাড়া কিন্তু ওই দুই মতের মধ্যে অনেক অমিল। একের নির্ভর মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রে পদার্থের স্থায়িত্বের, অন্যের নির্ভর তার অস্থায়িত্বের উপর।

তিনটি মতে দেশ ও কালের ভূমিকা সম্পূর্ণ পৃথক। "বিস্ফোরণ" তত্ত্বে দেশ সীমাহীন, কালের সুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। "বিস্তরণ-সঙ্কোচন" তত্ত্বে সময়ের আদিও নেই, অন্তও নেই কিন্তু দেশ-ব্যাপ্তির সীমা আছে। "স্থায়ী-অবস্থিতি" মতে দেশ কাল দুই সীমাহীন। এ ছাড়া শেষের মতে দেশকালের মধ্যেও একটা নিকট সম্বন্ধ রয়েছে। এর গুরুত্ব এত বেশী যে এ বিষয়ে আলাদা করে কিছু বলা দরকার।

বিশ্বের ক্ষেত্রে একদেশস্থিত দর্শকের সমভাবের ধারণা বহুকাল প্রচলিত। এর অর্থ শূন্যদেশের বিভিন্ন স্থানে যেসব দর্শক রয়েছেন তাঁরা বিশ্বকে সমগ্রভাবে একই রূপে দেখেন—এক জায়গা থেকে দেখার থেকে অন্য জায়গা থেকে দেখার কোনও পার্থক্য নেই। "বিস্ফোরণ" ও "বিস্তরণ-সঙ্কোচন" দুই তত্ত্বেই এই ধারণার স্থান আছে। কিন্তু একটি মূল সর্তে। দর্শকদের বিশ্বকে একই মুহূর্তে দেখতে হবে। এই সর্ত পূর্ণ না হলে দর্শকদের সমদৃষ্টি থাকবে না। কারণ সময় জাগতিক পরিবর্তনের সঙ্গে জড়িত, যে পরিবর্তনের পুনরাবৃত্তি

ঘটে না। বিবর্তনশীল বিশ্ব, যেখানে ঘনত্ব ক্রমশই কমে যাচ্ছে, সেখানে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দৃশ্য দেখতে পাওয়া যাবে। কিন্তু "স্থায়ী-অবস্থিতি" মতে দর্শকেরা বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন সময়ে যদি বিশ্বের দিকে দৃষ্টি ফেলেন তবুও একই দৃশ্য দেখবেন। পদার্থের অবিরাম সৃষ্টির মধ্য দিয়ে বিশ্বের গঠনের কোন পরিবর্তন ঘটে না, কাজেই বিভিন্ন সময়েও তাকে একই রকম দেখায়।

সমতার এই বিস্তৃত অর্থ পাই বলেই "স্থায়ী-অবস্থিতি" তত্ত্বকে সামঞ্জস্যের দিক থেকে যোগ্যতর বলে মনে হয়। এছাড়া আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের প্রগতির সঙ্গে দর্শকের অবস্থান অনিভর কতকগুলি সম্বন্ধের যোগ রয়েছে। এই একটিমাত্র কারণেই "স্থায়ী-অবস্থিতি" তত্ত্বটা ভুল বলে প্রমাণিত হলে আমি বিস্মিত হব।

"স্থায়ী-অবস্থিতি" তত্ত্বের প্রতি আমার পক্ষপাতিত্ব কেন তার কারণগুলি নিচে দিচ্ছি। এই কারণ মূলত দার্শনিক। কিন্তু একটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার কথা প্রথমে বলব। ওই তত্ত্ব অনুযায়ী বিশ্বের যা কিছু দোখ তা সর্ব কালে সর্ব সময়ে কার্যরত কতকগুলি সৃষ্টি পদ্ধতির ফল। আমরা অন্য দুটি তত্ত্বের মত এখানে বলতে পারব না যে অতীতের বিশ্বের অবস্থা ভিন্ন ছিল। এর থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে জগতের সমস্ত ঘটনার পর্যবেক্ষণ সম্ভব, চোখে দেখে তার বিচার সম্ভব। অতএব "স্থায়ী-অবস্থিতি" তত্ত্বে পর্যবেক্ষণ অনেক বেশী গুরুত্ব পাচ্ছে।

সামঞ্জস্য ও ব্যয়-পরিমিতির প্রশ্নটাও এখানে অবান্তর নয়। আমরা দেখেছি "বিস্ফোরণ" ও "বিস্তরণ-সঙ্কোচন" তত্ত্ব মতে সমস্ত পদার্থ এক সময়ে অতি ঘন অবস্থায় ছিল। কিন্তু সেই অবস্থা আণবিক প্রতিক্রিয়ার যোগ্য ছিল না বরং সেই প্রতিক্রিয়াকে বাধা দেবার জন্যই যেন তৈরি হয়েছিল। এই অদ্ভুত অবস্থার সাক্ষ্য যাতে আমাদের চোখে না পড়ে বিশ্ব বোধ হয় তেমনিভাবে গঠিত হয়েছে। আমার সাক্ষ্যহীন সাক্ষ্য তাতে আমার বিশেষ আস্থা নেই। অতি ঘন অবস্থা কখনও ছিল না বলে বিশ্বাস করাটাই এ স্থলে সহজ হবে।

"প্রসারণ-সঙ্কোচন" তত্ত্বে বলা হয়েছে বিশ্বের প্রসার ও সঙ্কোচন একের পর এক অবিরত ঘটে চলেছে। সম্প্রসারের সময় নক্ষত্রমণ্ডল, নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহ ও প্রাণীর সৃষ্টি হয়। সঙ্কোচনের সময় এ সবেরই বিনাশ ঘটে ও বিনাশের মধ্য দিয়ে জগত আবার বিস্তারের জন্য প্রস্তুত হয়। এই ঘটনা-চক্রের পুনরাবৃত্তি ঘটে। এখানে নূতনত্বের কোন স্থান নেই। এই "নূতনত্বের" অভাবটাকেই আমার কাজে সামঞ্জস্যের ও প্রেরণার অভাব বলে মনে হয়। এটা বৈজ্ঞানিকের আপত্তি নয়, সামঞ্জস্য অনুভূতির দিক দিয়ে আপত্তি। কিন্তু

বৈজ্ঞানিকেরা সুন্দর-সামঞ্জস্যের চিন্তায় কতটা লিপ্ত তা সাধারণ লোক হয়তো বুঝতে পারেন না।

"স্থায়ী-অবস্থিত" বিশ্ব সম্বন্ধে তবে কি বলবার আছে। প্রথমে মনে হয় এখানেও একই অসামঞ্জস্য রয়েছে। কিন্তু অন্যভাবে দেখলে এর ঠিক উল্টো ছবিটাই পাওয়া যাবে। এর ব্যাখ্যার সুরুতে আমি আবার একটা অন্য বিষয়ের অবতারণা করব।

সাম্প্রতিক কালে পদার্থ-বিজ্ঞানীরা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছেন, "পদার্থ-বিজ্ঞানের নিয়মগুলি কত গভীর? কতদূর পর্যন্ত গেলে একেবারে মুলে পৌছান যায়, চরম সত্য আবিষ্কার করা যায়?" গত সত্তর বছরে দু'বার বৈজ্ঞানিকেরা পদার্থ-বিজ্ঞানের চরম বিধি আবিষ্কার করেছেন বলে ভেবেছিলেন। দু'বারই এ আশার কোন ভিত্তি ছিল না। এখন প্রশ্ন করা হচ্ছে, তেমন কোন বিধি সত্যই কি আছে? আমরা যতই কেন না গভীরের সম্পাদনে ব্যাপৃত হই, তার চেয়ে গভীর, সূক্ষ্মর চেয়ে সূক্ষ্ম, সব সময়েই থেকে যায় না কি? আজকের রীতি এই মনোভাবকে স্বীকার করে নেওয়া। এই মতে পদার্থ-বিজ্ঞান-বিধির জটিলতার কোন শেষ নেই।

"স্থায়ী-অবস্থিতি" তত্ত্বে এই দৃষ্টিকোণের সমর্থন আছে, অন্য দুটি তত্ত্বে যা আছে বলে আমার মনে হয় না। "বিস্তরণ-সঙ্কোচন" তত্ত্বে জগত সীমার মধ্যে আবদ্ধ—পদার্থ সীমিত, স্থান সীমিত, ঘটনাচক্র সীমিত। এমন বিশ্বে অশেষ জটিলতার স্থান আছে বলে মনে হয় না। "বিস্ফোরণ" তত্ত্বে জটিলতার সম্ভাবনা আছে। এখানে বিশ্ব অসীম, তার নিয়মও অসীম। কিন্তু এখানে নিয়মের একটা অংশ মাত্র আমরা আবিষ্কার করতে পারি। কারণ এই তত্ত্বে নক্ষত্রমণ্ডলগুলির সৃষ্টি একবারই হয়েছিল। নক্ষত্র ও প্রাণীর অস্তিত্ব এখানে সীমাবদ্ধ, কয়েক লক্ষ কোটি বছর মাত্র। অতএব জীবের জ্ঞানও এখানে সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য। তার অনুসন্ধান এখানে সীমার বাইরে যেতে পারে না।

কিন্তু "স্থায়ী-অবস্থিতি" তত্ত্বে এসব অসুবিধা নেই। এখানে জ্ঞানের শেষ নেই। এখানে অবিরত নক্ষত্রমণ্ডলের সৃষ্টি হচ্ছে। যখন একটা নক্ষত্রমণ্ডলের বিনাশ ঘটে, সেখানের প্রাণীর জ্ঞানের সঞ্চয় নীতিগতভাবে অন্য নবজাত নক্ষত্রমণ্ডলে চলে যেতে পারে। এই পদ্ধতি অবাধে চলতে পারে যার ফলে আমাদের জ্ঞানের ভাণ্ডার ক্রমশই ভরে উঠতে পারে। আমাদের এই বিশ্ব শুধু বস্তুর দিক থেকেই অসীম নয়, জ্ঞানের সম্ভাবনার দিক থেকেও অসীম।

# যুদ্ধের সুরু

## লুই মামফোর্ড

লেখক, সাংস্কৃতিক দার্শনিক, স্থাপত্যশিল্প ও নগর পরিকল্পনা বিষয়ের সমালোচক লুই মামফোর্ড নিজেকে একজন "সাধারণতত্ত্ববিদ" বলে অভিহিত করে থাকেন যার কাজ হল "আংশিক জোড়াতালি দেওয়া নয়. অংশের গঠনের মধ্যে একটা তাৎপর্যপূর্ণ ছবি সৃষ্টি করা।" লুই মামফোর্ড ১৯৩৫ সাল থেকে গণতন্ত্রবিরোধী সার্বভৌম শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের পক্ষপাতী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তিনি তাঁর ছেলেকে হারান। বাইশটি বইএর লেখক, এক সময় পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্‌টির সভ্য, বর্তমানে পেন্‌সিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার অধ্যাপক মামফোর্ড নিউইয়র্কের আর্মেনিয়াবাসী।

প্রাচীন যুগের বড় বড় সভ্যতাগুলির বিকাশ যখন সবে শুরু হয়েছে, তখন তার দেহে একটা আঘাত লাগে। সেই আঘাতের ফলটি মানবজাতি এখনও কাটিয়ে উঠতে পারে নি। আমার সাক্ষ্য বিচার যদি ঠিক হয় তবে সেই আঘাতের ক্ষতি আমাদের জীবনে এখনও তার নিগূঢ় ছাপ রেখে যাচ্ছে, মানুষের উৎকর্ষতার বড় আশার স্বপ্নকে ঘিরে রয়েছে ধ্বংস ও মৃত্যুর কালো ছায়া।

আজকের মতই প্রাচীন যুগের মানুষের শক্তি হঠাৎ যখন বেড়ে ওঠে, আঘাতটা আসে তখন। এক বা অনেকগুলি বিভ্রান্তির ফলেই মানুষের সবচেয়ে বেশী কল্যাণকর উদ্ভাবনগুলি তার বিকারগ্রস্ত দুশ্চিন্তার নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়ে। সময়ে এ আঘাতের চিহ্ন মিলিয়ে যায় নি, তার ক্ষতি মুছে যায় নি, বরং সেই প্রথম ক্ষত জাতি ও গোষ্ঠীর সমবেত চেষ্টাকে আজও নিয়ন্ত্রিত করছে।

যে বিকারের কথা বলেছি তা হল মানুষের সামরিক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের মূল কোথায় তার আলোচনা করার উদ্দেশ্য কতকগুলি বিশ্বাস ও ঘটনাকে চেতনাগত করা, যে বিশ্বাস ও ঘটনা নিতান্ত অবহেলার ফলেই হ'ক বা মানুষের চরিত্রের কতকগুলি পীড়াদায়ক শক্তিহীন প্রবণতার অবদমনের কারণেই হ'ক আমরা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলাম। মানুষের জন্মের

সম্বন্ধে একশ' বছরের নিগূঢ় গবেষণার ফলে আজ আমরা ওই ঘটনাগুলির কিছু কিছু হদিস পাচ্ছি, ব্যাখ্যা করার সুযোগ পাচ্ছি।

ওই প্রাচীন ক্ষতের সঙ্গে তুলনা করা যায় শৈশবকালীন আঘাতের, যাকে মনোরোগের চিকিৎসকেরা 'ট্রমা' ( trauma ) বলেন, যার ফলটা বয়ঃপ্রাপ্তির আগে পর্যন্ত প্রকাশ পায় না। এখানে আঘাতের ফলটা ব্যক্তির মনে নয়, পরবর্তীকালের নগর, রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্যের আনুষ্ঠানিক জীবনের উপর তার প্রভাব বিস্তার করেছে।

আমি এই বিশ্লেষণের শুরুতেই একটা কথা ধরে নিচ্ছি যা প্রমাণ সাপেক্ষ নয়। আজকের মানুষের সাধারণ অবস্থার সঙ্গে যে কোনও মানুষের অবস্থার একটা মিল আছে। জীবনের সমস্যার কাছে পরাজয় স্বীকার করেছে, এরা যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম, এরা বিভ্রান্ত, অকর্মণ্য ও ব্যর্থ। এই অবস্থার কারণ শৈশবের ওই উদ্ভট অবাস্তব চিন্তা কল্পনার জগত থেকে বেরিয়ে আসতে বা তাকে নিয়ন্ত্রিত করতে না পেরে ব্যক্তি ও মানবগোষ্ঠী তারই মধ্যে নিজেদের হারিয়ে ফেলেছে। ব্যক্তির ক্ষেত্রে আমরা জানি শৈশবের ওই উদ্ভট চিন্তা-কল্পনা, আঘাত বা ক্ষতর চিহ্ন মিলিয়ে গেলেও, মানুষের সারা জীবনকে তা বিষাক্ত করে তুলতে পারে। বাল্যকালের ভ্রান্তি, শত্রুতা, ক্ষোভ ও জীবন, মৃত্যু, বিরহ ইত্যাদি স্বাভাবিক ঘটনার ভুল অর্থ করা—এই সবই মানুষের জীবনে শিশুসুলভ অপরিণত আচরণের প্রসারণ ঘটায়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ওই আচরণ পরিণত জীবনের দৃষ্টিভঙ্গিকে ঢেকে ফেলে মানুষকে নিঃসহায় করে তোলে। পরিণত বয়সেও সে বাস্তবের দিকে তাকায় শিশুসুলভ উদ্ভট কল্পনার চোখে।

সৃজনী শক্তির বিরাট বিকাশের মধ্যে কোন এক সময় মানুষের জীবনে যে একটা অঘটন ঘটে তার বোধ হয় কিছু পরিচয় পাওয়া যায় ইহুদী ও খৃষ্টান পুরাণের স্বর্গ থেকে পতনের কাহিনীতে। তারও আগে ঈশ্বর নির্দিষ্ট পথ ছেড়ে মানুষ উচ্ছৃঙ্খল-অসৎ হয়ে পড়েছে বলে মিশরীয়দের বিলাপের মধ্যেও "পতনেরই" পূর্বাভাস পাওয়া যায়। গ্রীস থেকে চীন পর্যন্ত বহু দেশের লোক অতীতের এক স্বর্ণ যুগের কথা বলে থাকেন, যখন যুদ্ধ ও সংঘর্ষ বলতে কিছু ছিল না। লায়োৎসির ভাষায় এক গ্রামের চিমনির ধোঁয়া দেখে অন্য গ্রামের লোক হিংসায় মরত না।

এখন নৃতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্ব থেকে অনেক তথ্য পাওয়া যায় যা থেকে বলা যেতে পারে যে মানুষের মনে শান্তিপূর্ণ অতীতের মনোরম স্মৃতিটা সম্পূর্ণ

ভিত্তিহীন হয়তো নয়। এক সময় হয়তো ছিল যখন খাদ্যের অভাব, হিংসা, বিপদের আশঙ্কা ও মৃত্যুর কারণ ছিল প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা, মানুষ নিজে নয়। সভ্য মানুষের প্রথম বড় সাফল্য যদি ভয় ও উদ্বেগের সৃষ্টি করে থাকে তার কারণগুলি আমাদের বুঝতে হবে, কারণ সেই ভয় ও উদ্বেগ এখনও জীবনকে ঘিরে রয়েছে। আমাদের যুক্তিহীন কাজের উৎসটা কোথায় যত দিন না জানতে পারছি, তত দিন যে শক্তি আমাদের ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাকে আয়ত্তে আনা যাবে না। সভ্য মানুষের প্রথম ভুলের যেটা সবচেয়ে অবাঞ্ছনীয় অংশ ও আমাদের বর্তমান অবস্থার যেটা সবচেয়ে ভয়াবহ দিক তা হল এই যে আমরা আমাদের আত্মঘাতী কাজগুলিকে স্বাভাবিক ও অপরিহার্য বলে মনে করি। করতে শিখি।

মিশর ও মেসপটেমিয়ার প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে আমাদের আজকের এই বিরাট সীমাহীন শক্তিসম্পন্ন ও গর্বিত সভ্যতার নিকট সম্বন্ধ রয়েছে। বর্তমান সাফল্যের মধ্যে হয়তো আধুনিক মানুষ ভাবতে পারে যে পার্থিব শক্তির ও মানুষের সম্ভাবনার এত বিরাট প্রকাশ আর কখনও ঘটে নি। কিন্তু একটু পরীক্ষা করে দেখলেই এ কথা যে সত্য নয়, তা প্রমাণ করা যাবে। প্রাচীন ও আধুনিক দুই শক্তির যুগের মধ্যে অনেক মিল আছে, তার ভাল-মন্দের মধ্যে যথেষ্ট ঐক্য আছে, যা ওই দুই যুগের থেকে অন্য যুগকে ভিন্ন করে রেখেছে।

আণবিক যুগের ঠিক পূর্বে যেমন জল, বায়ু ও বাষ্পীয় শক্তির বিপুল ব্যবহার শুরু হয় তেমনই সভ্যতার প্রথম ধাপে নব প্রস্তর যুগের প্রারম্ভে গাছপালা, শাক-সব্জি ও পশুকে মানুষ নিজের আয়ত্তে এনেছিল। এই কৃষি-বিপ্লব মানুষকে যত খাদ্য, শক্তি, নিরাপত্তা ও উদ্বৃত বাহুবল দিয়েছিল তা আগে কখনও সে পায় নি। বর্বরতা থেকে সভ্যতায় রূপান্তরের সেই দিনের প্রথম বড় লাভ জ্যোতিষ ও গণিতশাস্ত্রের সূত্রপাত, প্রথম জ্যোতিষশাস্ত্র-নির্ভর পঞ্জিকা, নৌকা, লাঙল, কুমোরের চাকা, তাঁত, জলসেচের খাল ও হাতে চালান যন্ত্রের ব্যবহার। সভ্য মানুষের ভাবগত ও বুদ্ধিগত শক্তির বিকাশের আরও সুযোগ ঘটে লেখার উদ্ভাবনে, চিত্রাঙ্কন, স্থাপত্য ও স্মৃতিস্তম্ভের মাধ্যমে ইতিহাসের বিস্তৃত বিবরণকে স্থায়ীভাবে লিপিবদ্ধ করার সুবিধায় ও প্রাকারযুক্ত নগর স্থাপনে।

প্রবল অগ্রগতি চরমে এসে পৌছায় ৫০০০ বছর আগে। শক্তির এমন সংযোগ তারপর আমাদের এই যুগে এসে দেখা যায়। প্রাচীন সেই

অগ্রগতির ফলটা তার পরের যুগের মানুষ শুধু ভোগ করে এসেছে, নিজেদের কিছু কিছু অবদান থাকলেও অগ্রগতির পুরাণো পথটা তারা বদলাতে পারে নি।

মানুষের জীবনের আমূল রূপান্তরের বোধ হয় একটা ধর্মের দিক ছিল। পুরোহিতদের গণনায় যে মাস ও বছরের হিসাব থাকত তাতে জাগতিক শক্তির উপর, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ-উপগ্রহ ইত্যাদির উপর মানুষ কতটা নিভরশীল সে বিষয়ে সে সচেতন হয়ে ওঠে। গ্রহ-উপগ্রহগুলি যে ঘড়ির কাঁটার মত ঘোরে তার থেকে মানুষ বহির্বিশ্বের নৈর্ব্যক্তিকতা ও শৃঙ্খলার প্রথম ইঙ্গিত পায়। সে বুঝতে পারে এই বিশ্ব নির্ভরশীল ও মঙ্গলময় কিন্তু তার সমস্তটাই নিয়মের অধীনে চলে।

এই নূতন জাগতিক তত্ত্বজ্ঞানের ফলে হঠাৎ সামাজিক পিরামিডের শীর্ষদেশস্থিত সর্বশক্তিমান রাজার মধ্যে দৈবী ও লৌকিক শক্তির সমাবেশ ঘটে। রাজা হয়ে ওঠেন একাধারে ধর্মনিরপেক্ষ শাসক ও প্রধান পুরোহিত, ও মিশরীয়দের কাছে একটি জীবন্ত দেবতা। গ্রামের কর্তাস্থানীয় ব্যক্তির মত তাঁকে গ্রামের ঐতিহ্য ও আচার-ব্যবহার মেনে চলবার প্রয়োজন হত না। তাঁর ইচ্ছাই নিয়ম হয়ে উঠত। দৈব অধিকারে রাজা ঐন্দ্রজালিক শক্তির দাবি করতেন ও সাধারণের মধ্যে এইভাবে তাঁরা ঐন্দ্রজালিক উৎসাহ জাগাতে সক্ষম হতেন।

ভয় দেখিয়ে একা রাজশক্তি যা করতে পারে নি ও যাদুবিদ্যা ও বিশ্বজগতের গণনার সাহায্যে সফল ভবিষ্যৎবাণী করে পুরোহিতেরা যা পারেন নি, একই ব্যক্তিতে এই দুয়ের সংমিশ্রণে তাই সম্ভব হল। বড বড় মানব-গোষ্ঠী রাজ-নির্দেশে ও ঈশ্বর ও শাসকের ইচ্ছা পূর্ণ করার তাগিদে সম্পূর্ণ এক হয়ে চলতে শুরু করল। মানুষ এমন অনেক দৈহিক কষ্ট স্বীকার করতে এগিয়ে এল যা আগে তাকে কখনও করতে হয় নি। ইতিহাসে দেখা যায় খাল, বাঁধ, রাস্তা, প্রাচীর ইত্যাদি জনকল্যাণের সকল কাজ করতে শ্রমিকদের বাধ্য করান হয়েছে। গোষ্ঠীগত শক্তির প্রসার ও সামরিক গঠনের অক্ষয় নিদর্শন চিয়প্‌সের ( Cheops ) বিরাট পিরামিড। ওই পিরামিড তৈরি করতে চাকাওয়ালা গাড়ি ও লোহার যন্ত্র ব্যবহার করা হয় নি। সেই তৈরির কাজে লক্ষ লোকের বিভিন্ন দলকে বহু বছর ধরে নিয়োজিত করা হয়েছে।

শুনে হয়তো বিস্মিত হই আমাদের এই আণবিক যুগের কীর্তির ছবি সে

যুগের দেবতাদের গল্পের মধ্যে ফুটে উঠেছিল। নানা দেবদেবীর মধ্যে সৃষ্টি ও ধ্বংসের চরম ক্ষমতার প্রকাশ ঘটে। মিশরীয় সূর্য দেবতা 'আটুম' তাঁর দেহ থেকে বিশ্বজগত সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁদের শাসন কায়েম করবার জন্য নির্দয় দেবতার দল নানা অপার্থিব শক্তির ব্যবহার দেখাতেন; কারও সঙ্গে যোগাযোগ সৃষ্টি করতে হলে কোন বাধা তাঁদের আটকাত না, দূর থেকে সব কিছু তাঁরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন, প্রয়োজন হলে সোডম ও গোমোরার মত বড় বড় শহরকে একত্রে ভস্মীভূত করতেন ও জীবাণু যুদ্ধের (মিশরের প্লেগ) থেকেও পিছিয়ে আসতেন না। দেবতাদের আদর্শে রাজারাজড়ার দলও তাদের ক্ষমতার সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে এই ধ্বংসলীলার অনুসরণ করত। কর্মদক্ষ শাসনতন্ত্র, সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনী, নিয়মিত কর আদায় ও বাধ্যতামূলক শ্রম ব্যবস্থার মধ্যে ওই প্রাচীন সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রশক্তির অপ্রীতিকর ও নৈরাশ্যজনক দিকগুলি ফুটে উঠেছিল। আমাদের এই যুগে ওই ধরণের শাসন-ব্যবস্থায় প্রায় একই ছবি দেখা যায়।

আদর্শ হিসাবে সমস্ত ক্ষমতাকে একই কেন্দ্রে বা ব্যক্তিতে ন্যস্ত করার চেষ্টাকে মনোবিদরা সন্দেহের চোখে দেখেন। একটি মানুষ যখন সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে চাইতে শুরু করে মনোবিদরা তখন তার মধ্যে নিজেকে ছোট করে দেখার, ওই চাওয়ার মধ্যে তার উদ্বেগ ও অক্ষমতার পরিচয় খোঁজেন। একথা হয়তো সত্য যে পুরাকালের সেই সভ্য মানুষ নিজেদের সৃষ্ট ক্ষমতাকেই ভয় করত, আজ আণবিক শক্তি যেমন আমাদের মনে ত্রাসের সৃষ্টি করেছে। দুটি ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে পার্থিব শক্তি ও শাসন ক্ষমতা বাড়ার সঙ্গে নৈতিক আদর্শ লাভের ও মানবিক নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা জাগে নি।

ওই প্রাচীন সভ্যতার সন্দেহ ও ভয়েব অন্যান্য কারণও ছিল। তারা অভূতপূর্ব নিরাপত্তা ও সম্পদ লাভ করলেও জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও বাণিজ্য বিস্তার তাদের অর্থনৈতিক অবস্থাকে এমন সব শক্তির অধীন করে তুলেছিল, যে শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা তাদের সাধ্যের মধ্যে ছিল না।

যে অর্থনীতির ভিত্তি প্রাচুর্য সৃষ্টির উপর সেখানে ভারসাম্য ও নিরাপত্তা রক্ষা করা যে কত শক্ত তা আমরা আজ জানি। কিন্তু প্রাচীন সভ্যতায় এই ভারসাম্য রক্ষা করা আরও শক্ত কাজ ছিল কারণ সেখানে ধর্মের আচার-বিশ্বাসের সঙ্গে রাজশক্তি ও সমাজের একাত্মবোধের উপর সকলের কল্যাণ নির্ভর করত। সমাজেরই আধার ছিলেন রাজা। দৈবশক্তি ও সাধারণ

মানুষের মধ্যে তিনিই ছিলেন যোগসূত্র। একদিকে যেমন জনগণের জীবন ও জনকল্যাণের সব দায়িত্ব ছিল রাজার, অন্যদিকে তেমন সেই রাজার জন্ম-মৃত্যুর সঙ্গে মানব-গোষ্ঠীর উত্থান-পতন ঘটত।

এই যে যাদুবিদ্যাগত একাত্মবোধ তা আর একটি উদ্বেগের সৃষ্টি করেছিল, যার গভীরতা বন্যা ও আকাশের ভয়ের চেয়ে অনেক বেশী ছিল। রাজারা অমরত্বের ও দেবতার বিশেষ অনুগ্রহের পাত্র হিসাবে দাবি জানালেও তাদেরও দুর্ভাগ্য ও দুর্ঘটনার সামনে পড়তে হত। এই দুর্ভাগ্য-দুর্ঘটনার ভয় এতই ছিল যে মিশরের "ফারাওএর" নামোচ্চারণ করার সময় তার "জীবন, সমৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যের" জন্য আগে প্রার্থনা জানাতে হত। রাজার জীবনের সঙ্গে সমাজের সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্যকে এক করে ফেলে আরও এক গভীর বিকৃতির সৃষ্টি হয়েছিল। প্রাকৃতিক দুর্ঘটনায় দেবতার ক্রোধের যে ইঙ্গিত পাওয়া যেত, সেই ক্রোধ তুষ্টির জন্য রাজার জীবন বলি দেবার ব্যবস্থা ছিল। সভ্যতার ওই স্তরে স্বপ্ন ও সত্য, রূপকথা ও অলীক দৃশ্য, ধর্ম ও বিজ্ঞানের মেশামিশি হয়ে এক চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছিল। একটি আনুষ্ঠানিক উৎসর্গ ক্রিয়ার পর সৌভাগ্যবশত আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটলে সেই উৎসর্গ কাজের পুনরাবৃত্তিটা নিয়মে দাঁড়িয়ে যেত।

রাজাকে এই দুর্ভাগ্যের হাত থেকে বাঁচাতে ও রাজ-সিংহাসনের আকর্ষণ যাতে না কমে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে, ধর্মের আর এক ঐন্দ্রজালিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। রাজার আর এক প্রতিনিধি খাড়া করে তাকে পূর্ণ রাজ-সম্মান ও রাজ-অধিকার দেওয়া হত যাতে শেষে প্রয়োজন হলে তাকে প্রকৃত রাজার জায়গায় উৎসর্গ করা যায়। দুঃসময়ে এমন প্রতিনিধির প্রয়োজন বেড়ে যেত এবং তখন অন্য সমাজের লোক যুদ্ধ করে ধরে এনে তাকে প্রতিনিধির আসনে বসান হত। যা প্রথমে বন্দী সংগ্রহের জন্য এক তরফা হানাদারি হিসাবে সুরু হয়েছিল পরে তাই প্রতিহিংসা ও উল্টো হানার মধ্য দিয়ে যুদ্ধের অনুষ্ঠান হয়ে দাঁড়াল। আর ওই যুদ্ধের পিছনে অনুমোদন রইল বর্বর ধর্ম-বিশ্বাসের, যে ধর্ম-বিশ্বাস বলেছিল যে সমাজকে রক্ষার জন্য মানুষ বলির প্রয়োজন।

অতএব বলতে পারি যুদ্ধ সভ্যতারই একটি বিশেষ ফলস্বরূপ। যুক্তি বিরুদ্ধ কুহক সৃষ্টির আশায় দেবতার পায়ে রক্তদান ও সেই রক্তদানের জন্য সঙ্ঘবদ্ধভাবে বন্দী সংগ্রহের চেষ্টার মধ্যে এর সুরু। সামরিক শক্তি অবশ্য ক্রমশ স্বাধীন হয়ে ওঠে, শক্তি বিস্তারটাই আদর্শ হয়ে দাঁড়ায় ও ক্ষমতালাভের

সঙ্গে রাষ্ট্রের স্বাস্থ্যের প্রশ্নটা জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু তবু যুক্তি-তর্কের অলক্ষ্যে থাকে এই ছেলেমানুষী বিশ্বাস যে প্রাণ বলি দিলে সামাজিক জীবন ও সামাজিক উন্নতি ঘটান সম্ভব হবে। সভ্য মানুষ যুদ্ধের জন্য আমাদের পশু-প্রবৃত্তিকে দায়ী করবার চেষ্টা করেছে, যে প্রবৃত্তির ফলে আমরা স্বজননাশে নাকি প্রবৃত্ত হই। কিন্তু এই যুক্তির মধ্যে সত্যকে চাপবার চেষ্টাটাই বেশী। নৃতত্ত্ববিদ ব্রনিস্‌ল মালিনোস্কির (Bronsilaw Malinowski) কথায়, "একথা যদি বিশ্বাস করতে চাই যে যুদ্ধ দুটি স্বাধীন ও সঙ্ঘবদ্ধ রাজশক্তির মধ্যে সংঘর্ষের ফল, তাহলে আদিম যুগে যুদ্ধে সুরু হয়েছে একথা বলা চলে না।"

যুদ্ধ আমাদের জীবনে একটি স্থায়ী অনুষ্ঠান হয়ে দেখা দেওয়ার মধ্যে একটা জিনিস লক্ষ্য করবার আছে। যে গোষ্ঠীগত উদ্বেগ মানুষ-বলির প্রথা সৃষ্টি করেছিল পার্থিব প্রগতির সঙ্গে সেই উদ্বেগ আরও বেড়ে গেছে। আর আর উদ্বেগ বেড়ে যাওয়ার ফলে তাকে বেদীমূলে আহুতি দেবার প্রথাগত অনুষ্ঠানে শান্ত করা যাচ্ছে না। কারণ ওই অনুষ্ঠান অন্যদিকে বিদ্বেষ, ভয় ও নিপীড়িত মানুষের মধ্যে প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি জাগিয়ে তোলে। সময়ে দলে দলে লোক নূতন অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ওই ভয়াবহ পর্ব অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছে আর যেটা ছিল উৎসর্গের আগে একটা একতরফা হানাদারী কাজ, তাকেই প্রাণদানের যজ্ঞে রূপান্তরিত করেছে। আপন লোকের ব্যাপক হত্যা রোধ কবার বিকল্প উপায় হল পরের মন্দির ভাঙা, শত্রুর শহর ধ্বংস করা ও এক একটা জাতিকে দাসে পরিণত করা। এই সাময়িক ধ্বংসলীলা উদ্বেগের উপশম ও শক্তি বৃদ্ধি করত। বিকারগ্রস্ত ভয়-ভাবনার জায়গায় প্রকৃত বিপদ সৃষ্টি করে যুদ্ধ একরকম আত্ম-সমর্থনের সুযোগ পেত। কারণ বিপদের মধ্য দিয়ে বাস্তবে ফিরে এসে মানুষ তার যুক্তিটাকে, তার সাম্য-ভাবকেই নূতন করে ফিরে পেতে পারে। লণ্ডনে বোমারু আক্রমণের সময় মনোরোগের চিকিৎসকেরা লক্ষ্য করেছিলেন যে প্রকৃত বিপদের সামনে পড়ে রোগী তার বিকারগ্রস্ত উদ্বেগ ভুলে যেত। কিন্তু চিকিৎসার দামটা ভয়াবহ। মনের চিকিৎসার জন্য অঙ্গহীন হওয়া ও মৃত্যুবরণ করার প্রয়োজন নেই।

আইনের প্রবর্তন, নিয়মতান্ত্রিক ব্যবহার ও নীতি যা শহরবাসীর পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতি ঘটিয়েছিল, তার ফলটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ফুটে ওঠে নি। এর কারণ রাজশক্তির একটি নিদর্শনতার বিশৃঙ্খলা, হিংসা ও ধ্বংস করার ক্ষমতা। অপেক্ষাকৃত শান্তিপ্রিয় মিশর ও হিংস্র আসিরীয় ও মঙ্গোলীয় একের

পর এক যে স্তম্ভ গড়েছে তাতে কত রাজা পদানত হয়েছে, কত বন্দীকে হত্যা করা হয়েছে, কত নগর ধ্বংস করা হয়েছে, তারই ইতিহাস যুক্তভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। সর্বত্র মানুষের আচার-ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করেছে রাজশক্তি, ঐশী ক্ষমতা, নরবলি ও সামরিক দক্ষতা। কিন্তু কিছুকাল পরে নরবলির জন্য বন্দীর সন্ধানটা মঙ্গলের ছদ্মবেশ ধরে এসে দেখা দিল। বন্দীরা দাসত্ব মুক্ত হয়ে শ্রমিক হয়ে বহাল হল। এই ভাবেই সামরিক প্রচেষ্টার অপরোক্ষ ফল, দাস, লুঠ, ভূমি ও উপহারের মধ্যে মূল উদ্বেগগত প্রবণতাটা লুকিয়ে রইল। রাজশক্তির প্রসার ও নরবলির প্রবর্তনের সঙ্গে সাধারণ উৎপাদন ক্ষমতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটায় মানুষ একরকম স্বীকার করে নিয়েছিল যে মঙ্গলের জন্য অমঙ্গলের প্রয়োজন আছে। কিন্তু আভ্যন্তরীণ ক্ষয় ও বাহিরের আক্রমণের ফলে সভ্যতার যে বার বার পতন ঘটেছে তার থেকে এ কথা প্রমাণ হয় না যে মন্দ আমাদের জীবনের শুভর সূচনা করে।

এই সত্য আধুনিক ইতিহাসের আবিষ্কার নয়। খৃষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর পর "আমস" থেকে "ইসায়া" ও "লাওৎসি" থেকে "মো তি" পর্যন্ত একাদিক্রমে অনেক ধর্ম-পথ-প্রদর্শক শক্তিকেন্দ্রিক সভ্যতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। এঁদের আদর্শের বিভিন্নতা যতই থাকুক শক্তি ও পার্থিব সম্পদ সঞ্চয়কে জীবনের উদ্দেশ্য বলে এঁরা কেউ মেনে নেন নি। শান্তি ও প্রেমের নামে এঁরা বেদীমূলেই হ'ক বা যুদ্ধক্ষেত্রেই হ'ক অকারণ প্রাণহানিকে আদর্শ হিসাবে স্বীকার করেন নি। খৃষ্টধর্ম আরও এক ধাপ এগিয়ে যায়। এই একটিমাত্র ধর্মে দেব-দেবীর ক্রোধ-তুষ্টির জন্য নরবলির বদলে ঈশ্বর নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন, প্রেমের জন্য নিজের শক্তিকে বিসর্জন দিয়ে পাপীদের উদ্বেগ ও পাপ থেকে রক্ষা করেছিলেন।

মহান ধর্মের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও সভ্যতার অঙ্গীভূত শক্তিমত্তা লোপ পায় নি। খৃষ্টধর্ম নিজেই ৩১৩ খৃষ্টাব্দে বিধর্মী কনস্টানটিনের কাছ থেকে রাজশক্তি অধিকার করে তার দমননীতিটা পূর্ণমাত্রায় চালু রাখে। রাষ্ট্রধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার জন্য ইতিহাসের সবচেয়ে রক্তাক্ত যুদ্ধ লড়া হয়েছে।

যখন দেখি যুদ্ধে জয়, পরাজয় দুই দুঃখ-দুর্দশার সৃষ্টি করে, ন্যায় যুদ্ধ অন্যায় পরিণতি টেনে আনে ; যুদ্ধে বীর শহীদদের স্মৃতি কলুষিত করে যারা বেঁচে যায় তাদের নীচ, স্বার্থপর ব্যবহার, তখন প্রশ্ন ওঠে এ যুদ্ধ বার বার ঘটে কেন ? এর দুটি কারণ আমার চোখে পড়ে। এক, প্রাচীর ঘেরা শহরে যে সভ্যতার জন্ম প্রাচীর ঘেরা রাষ্ট্রে সেই সভ্যতারই মূল ছকটা আজও পর্যন্ত বজায় রয়েছে। যুদ্ধ সভ্য জগতের অনুষ্ঠান-পুঞ্জের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, যে অনুষ্ঠান শ্রেণী-

বিভাগ, দাসত্ব, বাধ্যতামূলক শ্রম ও এক ধর্মের প্রাধান্যর ভিত্তিতে দ্বন্দ্বের মধ্যে টিকে থাকে। এই যে অনুষ্ঠানের শৃঙ্খল তার থেকে একটি অংশ বাদ দিলে বাকি অংশগুলিরও ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা। যারা যুদ্ধের প্রাণোৎসর্গের জয়গান করে তারা নিজেদের ক্ষমতাটাকেই বজায় রাখতে চায়।

যুদ্ধের অমঙ্গলের একটা প্রতিষেধক দিকও ছিল। বর্তমান যুগের আগে পর্যন্ত পৃথিবীর খুব অল্প মানুষই সভ্যতার নীতি স্বীকার করে যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ত। তা ছাড়া সেনাবাহিনী যে ক্ষতি করত তার একটা সীমা ছিল। খৃষ্টধর্মাবলম্বী জাতিগুলি যে সামরিক আচরণ নীতি স্বীকার করত তাতে অসামরিক জনতাকে যুদ্ধে যোগ দিতে হত না, তাদের সম্পত্তি লুঠ করা বা নষ্ট করাও কখন কখন নীতিবিরুদ্ধ ছিল, সৈন্যদের উপরেও অত্যাচারের একটা সীমা ছিল। এবং শেষে পৃথিবীর জনসংখ্যার বেশীর ভাগ যে সমাজের অন্তর্গত ছিল, সেই গ্রাম্য সমাজের দারিদ্র্য-দুর্বলতা তাদের নগর-ভিত্তিক যুদ্ধের লোভ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিল ও পরে এই সমাজই জীবনীশক্তি ও স্থিরবুদ্ধির আধার হয়ে ওঠে।

এই প্রতিষেধকগুলি অতীতে সাম্রাজ্যে সাম্রাজ্যে যে সামগ্রিক যুদ্ধ লড়া হত তার ক্ষয়-ক্ষতিটাকে সীমাবদ্ধ করে রাখত। কিন্তু বাণিজ্যের প্রয়োজন, ধর্ম-অনুশাসন, স্বজনবিয়োগের ক্লেশকর অভিজ্ঞতা ও দাসত্ব কোন কিছুই সভ্যতার মূল ছকটার পরিবর্তন ঘটাতে পারে নি। যে-কোন যুক্তিতে যুদ্ধকে ব্যক্তি-হত্যার শ্রেণীতে ফেলা যায়, যুদ্ধ দলগত অপরাধবৃত্তি, নয় পাগলামো। কিন্তু যাদের হাতে শক্তির দণ্ডটি ছিল তারা যুদ্ধের সম্বন্ধে এই বিরুদ্ধ মতের প্রচারটাকে কখনও সহ্য করে নি, সেই প্রচারের কোন সঙ্গত উদ্দেশ্য থাকলেও নয়। আজকের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার চরম অগ্রগতির মধ্যে যুদ্ধ যে সর্বব্যাপী ও সর্বনাশা হয়ে দাঁড়িয়েছে তার থেকেই বোঝা যায় কি গভীর যুক্তিহীনতা এর মূলে রয়েছে। এই যুক্তিহীনতার উৎস শুধু প্রাথমিক বিকারে নয়, এর উৎস আমাদের অবচেতনের গভীরে যেখানে ঐশ্বরিক ক্ষমতার উদ্ধত ব্যবহারের অবরুদ্ধ অপরাধবোধ ও উদ্বেগ জড়ো হয়ে থাকে।

গত চারশো বছরের পশ্চিমী সভ্যতা মানুষের শক্তি ও সম্ভাবনার বিরাট স্ফুরণ ঘটিয়েছে। কিন্তু সেই অতীতের যুক্তিহীনতার প্রকাশটাও আমাদের মধ্যে সমান অনুপাতে বেড়ে উঠেছে।

আজকের সবচেয়ে বড় ভয়ের কথা বোধ হয় এই যে পুরাকালের উদ্ভট কল্পনাগুলি এখন বাস্তব হয়ে উঠছে। বর্তমান যুগের পক্ষে যেটা চরম

আবিষ্কার অর্থাৎ আণবিক বোমা ও মহাকাশচারী রকেটের আবিষ্কার তা সম্ভব হয়েছে প্রাচীন যুগের মত ধর্মনিরপেক্ষ ও "পবিত্র" শক্তির সমন্বয়ে। সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রের বস্তুসম্ভার ও সর্বজ্ঞানী বৈজ্ঞানিকদের মনীষা ছাড়া জাগতিক শক্তিকে ও মহাকাশকে নিজের আয়ত্তে আনা এমন হঠাৎ সম্ভব হত না। যে সর্বগ্রাসী ধ্বংসের ক্ষমতা শুধু ঈশ্বরের উপর আরোপ করা হত সেই ক্ষমতা এখন যে কোন রুশীয় বা মার্কিন বিমানবাহিনীর সেনাধ্যক্ষের হাতে এসে পড়েছে। বিস্ফোরণে ও তেজস্ক্রিয় রশ্মির দহন, তেজস্ক্রিয় পদার্থ সংক্রমিত খাদ্য ও জলের বিষাক্ত ক্রিয়ার ফলে আজ শুধু একটা শহর নয় সুদূরতম গ্রামও ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। এখানে আমরা তবু মারাত্মক জীবাণু যুদ্ধ ও প্রজনন বিকৃতির কথা ধরি নি। পুরাতন যুগের যে নিরাপত্তার দিক ছিল তা আজ লুপ্ত।

আজ আমাদের ধ্বংসের যন্ত্রগুলি বিশ্ব-জাগতিক আকার ধারণ করায় আমাদের বিকারগ্রস্ত ভয়-ভাবনাগুলি এতদূর বেড়ে গেছে যে সেগুলি প্রকাশের পথে আমরা অবরোধ সৃষ্টি করছি। এই অবরোধের নিদর্শন সবচেয়ে বেশী দেখা যাচ্ছে আমেরিকায় যেখানে আণবিক অস্ত্র ও আমাদের মূল আদর্শটা কি তা নিয়ে বিচার বা আলোচনা একরকম বন্ধ। এর থেকে মনে হয় আণবিক বোমার উদ্ভব ও তার ব্যবহার আমাদের মনে একটা অজ্ঞান অপরাধবোধের সৃষ্টি করেছে। আমাদের আচরণের বিচার ও বিকল্প পথের অনুসন্ধানের অনিচ্ছা ছাড়াও আর একটা বিপদের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে মার্কিনবাসী তাদের ভ্রান্তির স্তূপটাকে বড় করে তোলার জন্য একটা রোগগ্রস্ত বাধ্যবাধকতা বোধ করছে। এর ফলে তারা আরও ভয়ঙ্কর চরম অস্ত্র সৃষ্টি করার জন্য তাদের শক্তি ও বুদ্ধি আরও বেশী করে নিয়োজিত করেছে। অথচ ওই ভয়ঙ্কর অস্ত্রগুলির রাজনৈতিক ও নৈতিক নিয়ন্ত্রণে সেই শক্তির সামান্যতমও ব্যবহার করছে না। তারা তাদের নূতন জ্ঞান ও শক্তি ব্যবহার করছে পুরাণো ভুলগুলিকে আরও বড় করে তুলতে ও প্রাণহীন সেকেলে অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করতে, যে অনুষ্ঠান বহুদিন আগেই বর্জন করা উচিত ছিল।

যুদ্ধের চূড়ান্ত বর্বরতায় ফিরে যাওয়ার চেয়েও যেটা আরও চিন্তার কথা তা হল এই যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরেও আমাদের দেশের অল্প সংখ্যক লোকই আছেন যাঁরা শত্রু নিপাতের জন্য এমন সামগ্রিক বিনাশের প্রয়োজনের নৈতিক দিকটা বিচার করে দেখেন। আমাদের আচরণে আজ আর এমন কিছু নেই যা আমাদের চেঙ্গিস খাঁর মত নীতি সংহারকের থেকে পৃথক করে। একটি

অবহেলার আঘাতে যদি আমরা হিরোশিমার মত ২০০,০০০ মানুষকে একসঙ্গে মারতে পারি তবে ১০০,০০০,০০০ লোকের সংহারেও আমাদের বাধা থাকবার কথা নয়, যদি না এই ভয় থাকে যে নিজের দেশের লোকেরও এইভাবে মৃত্যু ঘটতে পারে।

গত বারো বছরের মধ্যে প্রত্যেকটি দায়িত্বপূর্ণ রাষ্ট্রের শাসক খোলাখুলিভাবে স্বীকার করেছেন যে আণবিক, জীবাণু ও রাসায়নিক যুদ্ধের জন্য আমাদের বর্তমান প্রস্তুতির ফলে যে কোনদিন আমাদের সভ্যতার অবসান ঘটতে পারে ও মানবগোষ্ঠী সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন যদি নাও হয় সে স্থায়ীভাবে বিকলাঙ্গ জীবে পরিণত হতে পারে। এই সাবধান বাণীতেও যে ফল হয়নি তাতেই বোঝা যায় আমরা কতখানি বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। যতদিন এই বিকার আছে ও যতদিন সর্বাত্মক ধ্বংসকারী যন্ত্রগুলি আছে ততদিন সমগ্র মানবজাতির বিনাশের চিন্তা ও ক্ষমতার অপব্যবহার ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

দুটি প্রধান আণবিক শক্তি সম্পন্ন রাষ্ট্রের মনোভাব হল তারা প্রত্যেকেই সর্বশক্তিমান ও এই গ্রহের ভবিষ্যৎটা, তার বাঁচা-মরাটা, তাদের, প্রত্যেকের হাতে। প্রকৃতপক্ষে এই সার্বভৌম শক্তি তাদের সম্পূর্ণ অক্ষম করে তুলেছে। যাকে বলা হচ্ছে "ভয়ের বাধা" তা যে মানবিক গুণের প্রকাশ আমাদের এই অবস্থা থেকে রক্ষা করতে পাবে তার: বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে-কোন মুহূর্তে একটি অসতর্ক বাণী বা ইঙ্গিতে এই সঙ্কটাপন্ন অচল অবস্থার অবসান ঘটতে পারে ও তখন আমাদের এই দাবাখেলার ছক ও বলগুলির আর কোন অস্তিত্বই থাকবে না। এই সঙ্কটের শেষ হতে পারে যদি দুটি দলই স্বীকার করে নেয় যে তারা সম্পূর্ণ অক্ষম হয়ে পড়েছে ও তাদের নূতনভাবে খেলা সুরু করার দরকার।

এই নূতন খেলায় পূর্বের নিয়ম ও পূর্বের বলগুলি থাকলে চলবে না। এখন দু'পক্ষকে দ্বন্দ্ব ভুলে একই সাধারণ উদ্দেশ্যে কাজে নাবতে হবে। যে প্রচণ্ড দুর্যোগ তারা সহসা ঘনিয়ে তুলেছিল তার থেকে জগতকে রক্ষা করতে হবে। কিন্তু আমরা দেখছি ওই দুই রাষ্ট্র তাদের সহযোগীদের প্ররোচনায় উল্টো পথে চলেছে। বিকারগ্রস্ত অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জায়গায় তারা অপরিণত শিশু-সুলভ পরিকল্পনা ও উদ্ভট চিন্তায় অংশ গ্রহণ করাটাকেই রাজনৈতিক বুদ্ধির পরিচয় বলে ভাবছে। এখন একজন অসামরিক প্রতিরক্ষা কর্মীর কাছে পৃথিবী থেকে হিংসাত্মক ঘৃণা ও ব্যাপক বিকার দূর করার চেষ্টার

চেয়ে একটা ১৮,০০,০০,০০০ জনসংখ্যা যুক্ত সম্পূর্ণ জাতির মাটির তলায় বাসের ব্যবস্থা করাটা সহজ বলে মনে হচ্ছে। রুশীয় বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিকার হিসাবে একটা সম্পূর্ণ জাতিকে গোর দেওয়া একটা চতুর উপায় বলে ধরা হচ্ছে। এখানে রোগের চেয়ে চিকিৎসাটা যে আরও অমঙ্গলকর তা যে বুঝতে পারি না সেটা আপাতদৃষ্টিতে মনের বিকৃত অবস্থারই পরিচয় দেয়।

সভ্যতার সাধারণ গঠনে বড় পরিবর্তন যদি না ঘটান যায় তবে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ অন্ধকারই রয়ে যাবে। কারণ যতদিন পুরাণো আচার-অনুষ্ঠানগুলির প্রভাব থাকবে ততদিন যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমাদের দুশ্চিন্তা ও মানসিক উত্তেজনার প্রকাশ হবে। সৌভাগ্যবশত গত চারশ' বছরে সমাজের পুরাতন গঠনে অনেক মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে। অতীতের নগর-কেন্দ্রিক শক্তি ভেঙে পড়েছে, তার জায়গায় প্রাচীনতার ছাপ নিয়ে ক্রেমলিন ও পেন্টাগণের মত কতকগুলি সাবভৌম ক্ষমতার দুর্গ রেখে গেছে। এর চেয়ে বড় কথা শ্রেণীগত ও গোষ্ঠীগত বাধা সরে যাচ্ছে—সাম্যবাদী রাষ্ট্রগুলির চেয়ে যুক্তরাষ্ট্রে এই বিভেদগুলি বোধ হয় আরও তাড়াতাড়ি অপসারিত হচ্ছে।

যেটা শ্রেণীর সম্বন্ধে সত্য সে বিভিন্ন জাতির সম্বন্ধেও সত্য হয়ে উঠছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান, ক্ষমতা ও পার্থিব সম্পদ কোন একটা শ্রেণীগত বা জাতিগত হয়ে থাকতে পারে না। মার্কিনদের মধ্যে যারা ভাবত যে আণবিক শক্তিতে তাদের একচ্ছত্র অধিকার তারা তাদের ভুল বুঝতে পেরেছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে আমাদের রুশদের সঙ্গে সমান হয়ে ওঠার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নাবতে হবে। বরং আমাদের গোপনতা শূন্য জগতে সকলের সঙ্গে এক হয়ে বাঁচবার কর্তব্য ও দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। আধুনিক মানুষের বাস্তব জগত অভেদ্য নয়, সেখানে যোগাযোগের বহু পথ। এই জগতের প্রতি অংশ অন্য অংশের সঙ্গে যুক্ত এবং সেইজন্য এক অপরের সহানুভূতি ও শুভেচ্ছার উপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন জাতিকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে হলে আজ সেণ্ট পলের উপদেশটা যথার্থ বলে মেনে নিতে হবে, "প্রত্যেকেই প্রত্যেকের অঙ্গ।"

ছয় হাজার বছর ধরে যে অনুষ্ঠানগুলি টিকে ছিল তা যদি আজ ভেঙে পড়ে থাকে, তবে যুদ্ধের অনুষ্ঠানটাও কি ভেঙে পড়বে না? ইতিহাসের যদি কোন যুক্তি থাকে, সঙ্গতি থাকে তবে নিশ্চয় ভেঙে পড়বে। আমাদের সামরিক নেতারাও স্বীকার করছেন যে সামগ্রিক যুদ্ধে কোনও পক্ষেরই জয় হবে না।

সত্য কথা বলতে কি এমন যুদ্ধ সুরু হলে মানবজাতির সমূল বিনাশের আগে তা শেষ হবে কিনা সে বিষয়ে এঁদের কোন ধারণাই নেই। অতএব ধরতে হবে সভ্যতা যেখান থেকে সুরু হয়েছিল আমরা সেইখানে ফিরে গিয়েছি, শুধু এখন বর্বরতা ও অযৌক্তিকতার পরিমাণটা আরও বেড়ে গেছে। আগে যেখানে একটা প্রতীক-বলির ব্যবস্থা ছিল, এখন আমাদের বিকারগ্রস্ত উদ্বেগ উপশমের জন্য সেখানে আমরা নিজেদের সমূল বিনাশের ব্যবস্থা করছি।

মোট কথা যুদ্ধের যেটা অযৌক্তিক, কুসংস্কারপূর্ণ ও ঐন্দ্রজালিক দিক তার প্রকাশের সম্ভাবনাটাই আমাদের এখন চোখে পড়ছে। যে দেবতায় আমাদের বিশ্বাস নেই তারই জন্য নর-বলির ব্যবস্থা করছি, যে নর-বলি মানব সভ্যতার ইতিহাসকেই অর্থহীন করে তুলছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের আজকের প্রধান বা একমাত্র শত্রু পুরাকাল থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া একটা সংক্রামক অযৌক্তিকতা।

এই অবস্থায় বাস্তবকে স্বীকার করার সম্ভাবনা কতটুকু, আণবিক যুদ্ধের প্রচণ্ড দুর্যোগ এড়াবার জন্য কি উপায় গ্রহণ করা উচিত আমরা মোটামুটি জানি। কিন্তু মূল প্রশ্ন হল কি করে আমরা আমাদেরই যুক্তিহীন মনোবৃত্তি ও অভ্যাসের হাত থেকে রেহাই পাব। মানুষের বুদ্ধির প্রতি আবেদন করলেই শুধু হবে না। জীবন আহুতি দেওয়ার সঙ্গে সে-অবদমিত উদ্ভট কল্পনাকে চেতনার ক্ষেত্রে প্রকাশ করতে হবে যাতে আবার তা নিজের আভ্যন্তরীণ চাপে ফেটে না পড়ে। শুধু প্রকাশের মধ্য দিয়েই এর প্রভাব আমরা কাটিয়ে উঠতে পারব।

বিকারগ্রস্ত রোগীর নিজের মধ্যে কিছুটা শৃঙ্খলা, বাস্তবতা ও সামঞ্জস্য না থাকলে, তার নিজের সহযোগিতা না থাকলে, সে যুক্তি ও আত্ম-সংযম ফিরে পেতে পারে না, রোগের বিকৃতির হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে না। ব্যক্তিত্বের ঐক্য নষ্ট করে এমন যে অভিজ্ঞতা সেগুলিকে সে যদি সাহস করে প্রকাশ করতে পারে ও সেইভাবে তার যথার্থ মূল্যটা বুঝতে পারে, তবেই তার যেটা সুস্থ অংশ সেটা কাজ করার সুযোগ পায়। সৌভাগ্যবশত আমাদের জীবনের বিস্তৃত ক্ষেত্রে এখনও মনুষ্যত্ব ও বুদ্ধি বিচারের পরিচয় পাওয়া যায়। তাছাড়া আধুনিক মানুষের হাতে তার মনের গভীর রহস্যের কথা জানার উপায় রয়েছে। বিজ্ঞান একদিকে যেমন পদার্থ-জগতের রহস্য সন্ধান করেছে, অন্যদিকে তেমনি মনের গভীরে নেবেছে। বিষাদগ্রস্ত স্বপ্ন,

বাস্তবতাহীন উদ্ভট কল্পনা, দুঃস্বপ্ন যা বার বার মানুষের কীর্তিকে খর্ব করেছে তার কারণটা এখন আমরা বুঝতে শিখেছি।

জৈব বিজ্ঞানবিদ ও মনোবিদ যে তথ্য আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন তার থেকে বোঝা যায় সভ্যতার আদিম যে ভিত্তি ও আজকের আণবিক ও মহাকাশ ভ্রমণের যে যুগ তার যা ভিত্তি তা মানুষের পক্ষে অনুপযোগী। তাপনিয়ন্ত্রিত আণবিক প্রতিক্রিয়া পদার্থ জগতের উপর আমাদের যে অপার ও চরম শক্তি তার নিদর্শন দেয়। কিন্তু প্রাচীন নর-বলির অনুষ্ঠান যে ঐন্দ্রজালিক ধর্ম অভ্যাসের স্তরে পড়ে ওই "চরম শক্তি" সেই একই স্তরের জিনিস। মানুষ সীমাবদ্ধ শক্তির যথার্থ ব্যবহার করতে পারে। "খুব বেশী" কিম্বা "খুব কম" দুটিই তার কাছে মারাত্মক। জীবদেহে কতকগুলি স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা আছে যা শক্তির ব্যবহারকে সীমাবদ্ধ করে রেখে জীবদেহে ভারসাম্য সৃষ্টি করে। এই নিয়ন্ত্রণগুলির কাজ বন্ধ হলে আমাদেব জীবনটাই বিপন্ন হয়। আমাদের জীবনের আদর্শের কথা ভুলে যখন অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রয়োগে অগ্রসর হই, তখন জীব-সংগঠনের সাম্যটা, তার সম্পূর্ণ জৈব-পরিবেশটাই নষ্ট করে ফেলি। বিচারহীন অসীম শক্তি জীবনের অগ্রগতি, তার উৎকর্ষ ও সম্ভাবনাকে বাধা দেয়। এমারসন একশ' বছর আগে লিখেছিলেন, "হে ঈশ্বর, মানুষকে আর বেশী ক্ষমতার অধিকারী কোর না যতদিন না সে তার অল্প শক্তির উপযুক্ত ব্যবহার শিখছে।"

ব্যক্তি ও জাতির পরিণতির পরীক্ষা তার আত্মজ্ঞান, আত্মসংযম, আত্ম-নির্দেশ ও আত্ম-অতিক্রমণের মধ্যে, তার শক্তি বৃদ্ধির মধ্যে নয়। পরিণত সমাজে মানুষের তৈরি যন্ত্র ও সংস্থা নয়, সে নিজেই শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

আজকের দিনের প্রধান সমস্যা হল আধুনিক ও প্রাচীন মানুষের অন্তরদেশে প্রবেশ করে তার সেই প্রবণতাগুলির অনুসন্ধান করা যা তাকে বিপথগামী করেছে। জীবনের কোন এক দিকে ক্ষমতা প্রদর্শনের মধ্যে মানুষ বড় হয় নি, সে বড় হয়েছে জীব-জগতের সকলের সঙ্গে অবিরত সংযোগ-সহযোগিতার মধ্য দিয়ে। জীবনের খাদ্যগ্রহণ ও স্বাদ রক্ষাটাই মানুষের যথার্থ উদ্দেশ্য, শক্তির লোভ নয়। মানবজাতি আজকে যে ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে তাতে তার আত্ম-নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব বেড়ে গেছে, ইন্দ্রজালগত, যন্ত্রগত, আণবিক শক্তিগত সভ্যতার ঊর্ধ্বে শক্তি-ভিত্তিক নয়, জীবন-ভিত্তিক আদর্শ গড়া তার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

মানুষ একদিন জীবনকে এক নূতন দৃষ্টিতে দেখে নিজেকে অনাচার,

স্বগোত্রভোজন ও দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে পেরেছিল। আজও কোনও নূতন দৃষ্টিভঙ্গি সে কি লাভ করতে পারবে না যাতে সে যুদ্ধ-মুক্ত হতে পারে? প্রশ্নটা হয়তো আরও আগে ওঠা উচিত ছিল যদিও তার উত্তর দেবার সময় হয় নি। দীর্ঘস্থায়ী বিকারের থেকে মুক্তির জন্য আমাদের হয়তো আঘাতের দরকার যাতে প্রলয়ের আগে আমরা জেগে উঠি। শেষ মুহূর্তেও যদি আমাদের জ্ঞান হয় তাহলেও সেটা অলৌকিক বলে মনে হবে। কিন্তু যে রোগটা এত জটিল ও চিকিৎসাটা প্রায় অসম্ভব সেখানে অলৌকিকের উপর নির্ভর ছাড়া আর গতিও নেই। জীবনে এমন অলৌকিক, অভাবনীয়, অসম্ভব ঘটনা আগেও ঘটেছে, অতএব জীবনের উপরই আমাদের নির্ভর করতে হবে।

# সঙ্গীতের আনন্দ

## আরণ্ কপ্ল্যাণ্ড

আরণ্ কপ্ল্যাণ্ডকে মার্কিন সঙ্গীত-রচয়িতাদের "যাজক" বলা হয়েছে। বাহান্ন বছর আগে ব্রুক্লিনে কপ্ল্যাণ্ডের জন্ম হয়। তিনিই প্রথম মার্কিনবাসী যিনি নাদিয়া বুলঁজের কাছ থেকে সঙ্গীত রচনা শিখতে যান। পরে আরও অনেক মার্কিনবাসীকে নাদিয়া বুলঁজে সঙ্গীত শিক্ষা দিয়েছিলেন। কপ্ল্যাণ্ডের সঙ্গীত সৃষ্টির মূল প্রেরণা এসেছে লোক-সঙ্গীত থেকে। এর মধ্যে বিশেষ করে নাম করতে হয় কতকগুলি ব্যালের, যেমন "রোডিও", "বাচ্চা বিলি" ( Billy the Kid ) ও "আপালাসিয়াঁর বসন্ত" (Appalachian Spring )। কপ্ল্যাণ্ড গানের বিষয়ে ভাল বক্তা ও সুলেখক। নিউ হ্যাম্পসায়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে "সঙ্গীতের সুখ" প্রথমে পড়া হয়।

সঙ্গীতে যে সুখলাভ হয় সেটা স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। অতএব আলোচনার বিষয় হিসাবে "সঙ্গীতের সুখকে" খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে না মনে হওয়াই উচিত। কিন্তু ওই সুখ বা আনন্দের যেটা উৎস, অর্থাৎ আমাদেব গানের সহজ প্রবৃত্তি, সেটাকে খুব সরল বলা চলে না। আসলে ওই প্রবৃত্তি আমাদের চেতনার জগতের একটি প্রধান ধাঁধা। একজন ইংরেজ সমালোচকের কথায় শব্দতরঙ্গ কানে এসে লাগলে "শিরার মধ্য দিয়ে কতকগুলি আবেগপ্রবাহ মস্তিষ্কে গিয়ে পৌছে" আমাদের মনে সুখের অনুভূতি জাগায় কেন? আরও বড কথা আমরা সঙ্গীতের ইঙ্গিত থেকে কি অর্থ পাই যাতে শব্দতরঙ্গের ঘূর্ণাবর্ত থেকে বেরিয়ে এসে মনে হয় জীবনের এক নূতন স্বাদ পেলাম। চুপ করে গান শুনতে বসে আমাদের বুকে কাঁপন ধরে কেন, পায়ে তাল দিতে সুরু করি কেন? কেন গানের সঙ্গে আমাদের মন ছুটতে সুরু করে, তার গতি ভিন্নধারায় বইলে অসুখ হয় কেন, সেই শব্দধারার সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিতে পারলে উল্লাস জাগে কেন, নিজেকে কৃতজ্ঞ বোধ করি কেন?

এর একটা আংশিক উত্তর পাই বৈজ্ঞানিকের কাছে শব্দের বাহ্য প্রকৃতির সম্পূর্ণ ব্যাখ্যার মধ্যে। কিন্তু সঙ্গীতকে যখন যোগাযোগ ও প্রকাশের বাহন হিসাবে দেখি তখন তার প্রকৃতিটা চিরকালের মত অনির্বচনীয়, অজ্ঞেয়ই থেকে

যায়। আমরা সঙ্গীতকারেরা বেশী কিছু চাই না। আমরা শুধু জানতে চাই ওই সামনের সারির চেয়ারে বসা ছেলেটি গানের সুরে তন্ময় কেন ও তার পাশে বসা মেয়েটিকে সেই গানের সুরই স্পর্শ করতে পারে না কেন? যদি কোন সজাগ-সজীব প্রজননবিদ অধ্যাপক আমাদের সুর-সংবেদনশীলতার পরীক্ষার জন্য একটা পদ্ধতি বার করতে পারতেন তাহলে গানের অভ্যাসে সঙ্গতে দীর্ঘ সময়ের অপব্যয়টা বেঁচে যেত।

গানের প্রতি মানুষের অদ্ভুত আকর্ষণের পরিচয় পেয়েছিলাম একবার এক ইলেকট্রনিক অর্গ্যান নির্মাতার দোকান দেখতে গিয়ে। একটা ঘরে আমাকে নিয়ে যাওয়া হল যেখানে গানের চর্চা হয়। গিয়ে দেখি আটজন শিক্ষার্থী আটটি অর্গ্যানে একসঙ্গে সুরের অভ্যাসে ব্যস্ত। আরও আশ্চর্যের বিষয় বাজনার কোনও আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল না কারণ প্রত্যেকটি বাদকই কানে ইয়ারফোন লাগিয়ে নিজেদের অর্গ্যানের আওয়াজ শুনছিল। সমগোত্রীয় সঙ্গীতবিদ হলেও আটজন প্রাপ্তবয়স্ক যন্ত্রবাদককে মৌন ও অদৃশ্য যেন কোন পরীর মোহে এভাবে মুগ্ধ সম্মোহিত দেখে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। সেইদিন বুঝলাম যাদের সঙ্গীতে ঝোঁক কম তাদের কাছে আমাদের মত কান-সবস্ব মানুষ কতটা সম্মোহিত জীব বলে মনে হয়।

সঙ্গীত যদি সাধারণ শ্রোতাকে এতটা প্রভাবান্বিত করতে পারে তাহলে তা যে গানে ও বাজনায় যার কিছুটা দক্ষতা জন্মেছে তাকে আরও বেশী প্রভাবান্বিত করবে তা আমরা মানতে পারি। এলিজাবেথ যুগে আশা করা হত প্রত্যেকটি মানুষ স্বরলিপি পড়তে পারবে ও ছোট ছোট প্রেমমূলক গানে গলা মেলাতে পারবে। এখনকার মত সেদিন এমন লক্ষ লক্ষ নিষ্ক্রিয় শ্রোতা ছিল না। আমাদের কালেও গান ভালবাসার অর্থ ছিল হয় গান রচনা করা নয় বহু খরচ করে ও কষ্ট করে যেখানে গান শোনান হচ্ছে সেখানে যাওয়া। এখন আর সে অবস্থা নেই। সঙ্গীত এখন এতই সাধারণ যে তাকে এড়িয়ে চলাই শক্ত। Brahms Symphony সুরমূর্ছনা শুনতে শুনতে ব্যাঙ্কে চেক্ ভাঙাতে আপনার হয়তো আপত্তি নেই, কিন্তু আমার আছে। অনেক সময় মনে হয় মহৎ সঙ্গীতের খোঁজে লোক যত ছোটে আমি তাকে পরিহার করতে ঠিক ততটাই ব্যস্ত হয়ে পড়ি। এর কারণটা অত্যন্ত সরল। সার্থক সঙ্গীত আমাদের একাগ্র মনোযোগ দাবি করে। যখন এমন সঙ্গীতের প্রয়োজন বোধ করি, যখন তাতে মনোযোগ দেবার মত মনের অবস্থা থাকে তখনই সঙ্গীত আমাকে টানে। অন্য কাজে ব্যস্ত থেকে শ্রবণেন্দ্রিয়ে একটা মধুর সুড়সুড়ির

অনুভূতি জাগানর জন্য সঙ্গীতের ব্যবহার অতরলমতি সঙ্গীতকারের কাছে অসহনীয়।

আমি যে সঙ্গীতের কথা বলছি তাতে শ্রোতার একাগ্র মনোযোগের দরকার। একেই সাধাবণত আমরা "গুরুগম্ভীর" সঙ্গীত বলি, যা হাল্‌কা সঙ্গীতের বিপরীত। সঙ্গীত সম্বন্ধে এই "গুরুগম্ভীর" কথাটার প্রয়োগ কি করে এল জানি না, কিন্তু এটা জানি যে শব্দটা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। সঙ্গীতের যে বিভিন্ন ধারা আছে "গুরুগম্ভীর" শব্দে তার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায় না। কখনও কখনও গুরুগম্ভীর সঙ্গীত সত্যই গম্ভীর, লঘুত্বের ছিটেফোঁটাও তাতে থাকে না। কিন্তু তাতে অন্যান্য রসেরও প্রকাশ ঘটে।

সঙ্গীত কৌতুকাবহ হতে পাবে, হাস্যরসোজ্জ্বল হতে পারে, তাতে বিদ্রূপ থাকতে পারে, ব্যঙ্গ থাকতে পারে, তা বীভৎস রসের উৎস হতে পারে। আসলে সঙ্গীতে নানা রসের প্রকাশ ঘটে বলেই তা গুরুত্বপূর্ণ ও সেই নানা রসেব প্রকাশ দেখেই আমরা সঙ্গীত সৃষ্টির মূল্য নির্ধারিত করি।

সম্প্রতি সাধারণ লোক গুরুগম্ভীর সঙ্গীতের দিকে ঝুঁকেছেন কিন্তু "গুরুগম্ভীর" কথাটার সঙ্গে একটা গুপ্ত ও নিষিদ্ধতার ভাব মেশান আছে। এই জন্য সাধারণ শ্রোতা সঙ্গীত স্রষ্টাকে একটা গুহ্যতত্ত্বের অধিকারী হিসাবে দেখে যে তত্ত্ব বোঝা বাইবের লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। এর চেয়ে ভুল ধারণা কিছু থাকতে পারে না। সঙ্গীত যাঁদের বৃত্তি ও যাঁদের সখ মাত্র সকলেই একইভাবে গান শোনেন—অনেকটা যেন বোবা হয়ে—কারণ সরল বা সরলতাবর্জিত সঙ্গীত শুধুমাত্র তার সুর ও মাধুর্য দিয়ে প্রথমত আমাদের আদিম প্রবৃত্তিকে আকর্ষণ করে। আমরা সঙ্গীতের গুপ্তরহস্য জানি সাধারণের এই ধারণায় অবশ্য আমরা খুশি হই। কিন্তু সত্য বলতে কি আমরা জানি যে মূলত সকল শ্রোতাই এক। গান আমাদের যেভাবে সঙ্গে সঙ্গে স্পর্শ করে, একটি সাধারণ শ্রোতাকেও সেইভাবেই প্রভাবান্বিত করে।

আমার এই প্রবন্ধের একটা বক্তব্য এই যে গান এবং সম্ভবত নাচ, আমাদের চেতনার সবচেয়ে নিচু ও সবচেয়ে উঁচু স্তরে একই সঙ্গে তার সুখের স্পর্শ এনে দেয়। অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে এমন ঘটে না। শ্রোতা নির্বিশেষে দেখা যায় গানের প্রবাহে ভেসে যাওয়ার আনন্দটা উপভোগ করতে পারে। গান ভালবাসার এক লক্ষণ এই তরঙ্গপ্রবাহে এগিয়ে যাওয়ার আনন্দ। কিন্তু ঠিক এইখানেই, ওই তরঙ্গ সৃষ্টি ও সঙ্গীতের আকৃতিগত গঠনের সঙ্গে তার সম্বন্ধ ও তার উপর তার প্রভাবটা বোঝার মধ্যেই সঙ্গীত স্রষ্টার মেধা ও বুদ্ধির পরিচয়টা

ফুটে ওঠে। সঙ্গীতের তরঙ্গ প্রবাহের দু'টি স্ববিরোধী কাজ দেখতে পাওয়া যায়। একদিকে মনে হয় একটা বিশেষ স্থান পূর্ণ করে সে সময়কে থামিয়ে রেখেছে। অন্যদিকে একই সময়ে বিরাট নদীর তরঙ্গ উচ্ছ্বাসের মত সঙ্গীত আমাদের তার স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সঙ্গীত প্রবাহকে থামাবার অর্থ সময়কেই থামিয়ে দেওয়া।

সঙ্গীতবিদ শ্রোতার কাছে এই সময়-ভবান প্রবাহেব সম্পূর্ণ অর্থটা ধরা পড়ে যখন সে বুঝতে পারে কোথায় সে চলেছে, কোন সাঙ্গীতিক মনস্তাত্ত্বিক উপাদান তাকে গন্তব্যে পৌছতে সাহায্য করছে ও সেখানে পৌছে তার কি রূপগত, সংগঠনগত সন্তোষ লাভ হচ্ছে।

সঙ্গীতের ছন্দ ও তাল তার তবঙ্গ সৃষ্টিতে সাহায্য করে। মনের বিভিন্ন স্তরে একই সময়ে এই ছন্দ ও তালেব বিশেষ কাজ আছে। আফ্রিকার কোন কোন উপজাতির কাছে ছন্দটাই সঙ্গীত, তাব বেশী কিছু তারা চায় না। কিন্তু সে কি ছন্দ! অমনোযোগীর কাছে কান-ফাটান শব্দ ছাডা আর কিছুই মনে হবে না, কিন্তু সঙ্গীতবিদের কানে ওই জটিল ছন্দের বিভিন্ন ভঙ্গিটা ধরা পড়ে। যে মন এমন ছন্দ-তালের সৃষ্টি করতে পারে তাকে আদিম বলা শুধু ভুল নয়, অন্যায়। সে মনের একটা নিজস্ব সংস্কৃতি আছে। এর তুলনায় আমাদের ছন্দ-তালের জ্ঞান অত্যন্ত ক্ষীণ বলে মনে হয়—যাকে মাঝে মাঝে সঞ্জীবিত করে তুলতে হয়।

উনিশ শতকের শেষভাগে ইউরোপীয় সঙ্গীত-কলার শব্দছন্দে কিছুটা ভাটা পড়ে। সেইজন্যই স্ট্রাভিন্‌স্কি সেই সঙ্গীতে যাকে আমি বলেছি "ছন্দের ইন্‌জেকশান" তা প্রয়োগ করতে পারেন। ১৯১৩ সালে রচিত তাঁর Rite of Spring প্রথমে শ্রোতাদের কাছে ছন্দ-বিকাব বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু আজ তা কনসার্টের একটি নিয়মিত অঙ্গ হয়ে উঠেছে। এর থেকেই বোঝা যায় যে ছন্দের জটিলতা যা আমাদের পিতৃ-পিতামহকে বিভ্রান্ত করে তুলতো তার ভাবগ্রহণ ও উপভোগের ক্ষমতা আমাদের কতখানি বেড়ে গেছে। কিন্তু এইটাই শেষ নয়। আধুনিক যুবক শিল্পী ছন্দ সৃষ্টির শেষ সীমায় আমাদের নিয়ে গেছেন যেখানে ছন্দের বিভিন্নতা ধরাটাই শক্ত। ছন্দ বৈচিত্র্য উপভোগ করার শক্তি আমাদের সীমাবদ্ধ কিন্তু তারও মধ্যে ছন্দময় জীবনের এখনও একটা বড় অংশ অতিক্রম করা হয়নি, এখনও এমন ছন্দ-রূপের সৃষ্টি হতে পারে যা "মার্চ" ও "মাজুরকার" রচয়িতার কল্পনার বাইরে ছিল।

ধ্বনি বৈশিষ্ট্য সঙ্গীতের আর একটি মূল উপাদান যা সরল বা সংস্কৃত

যে-কোনও শ্রেণীর মানুষ উপভোগ করতে পারে। বেণু ও ভেরীর স্বর-ভঙ্গির যে প্রভেদ তা বুঝতে বালকদেরও কষ্ট হয় না। বিশেষ স্বরধ্বনি বিশেষ লোককে আকর্ষণ করে। আটটি ফরাসী ভেঁপুর সম্মিলিত স্বরের প্রতি আমার নিজের একটা দুর্বলতা আছে। তার সমৃদ্ধ ও উজ্জ্বল রোমাঞ্চকর ঝঙ্কার আমাকে অন্য জগতে নিয়ে যায়। এখনকার কয়েকজন ইউরোপীয় সঙ্গীতকার দেখছি "ভাইব্রাফোনের" প্রতি অকালে আসক্ত হয়ে পড়েছেন। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের মিশ্র ধ্বনির মধ্যে নানা রঙের প্রকাশ দেখা যায়, বিশেষ যখন কনসার্টের মত সুন্দর বাদ্যযন্ত্র সমন্বয়ে বিচিত্র ঐক্যতান ওঠে। অভ্যাসরত সঙ্গীত রচয়িতার কাছে কনসার্টের একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে কারণ ঐক্যতান সৃষ্টির কাজ আধা বৈজ্ঞানিক আধা প্রেরণাময় জল্পনা।

সঙ্গীতকার হিসাবে বিভিন্ন ধ্বনির নব নূতন সংমিশ্রণে আমি আনন্দ পাই। আমার এতদিনের সঙ্গীত সৃষ্টির অভিজ্ঞতায় আমি লক্ষ্য করেছি যে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের মিশ্রিত ধ্বনি-বৈচিত্র্য সাধারণ মানুষকে যতটা রহস্যে অভিভূত করে আর কিছুতে তা করে না। কিন্তু মনে রাখা দরকার ওই মিশ্রণের আগে প্রতি বাদ্যযন্ত্রেব পৃথক ধ্বনিটা আমরা নিজের কানে শুনি। অর্কেস্ট্রার স্বরগ্রাম পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে সুরস্রষ্টারা তাঁদের যন্ত্রগুলি সমবর্গীয় শ্রেণীতে বাখেন, স্বরলিপির উপর থেকে নিচে কাঠের বাঁশী, পেতলের বাদ্যযন্ত্র, ঢাক ও তারের যন্ত্রগুলি পর পর সাজান থাকে। আধুনিক ঐক্যতানে সমবর্গীয় বাদ্যযন্ত্রকে একটা আর একটার বিপরীতে রাখা হয় যাতে তাদের বর্ণ বৈশিষ্ট্য পৃথকভাবে স্পষ্ট বোঝা যায়। এই একই নীতি একটি যন্ত্রের স্বর-সৃষ্টির ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যায় ফলে তার বিশেষ বিশুদ্ধ ধ্বনি বৈশিষ্ট্যটা পরিষ্কার ধরা পড়ে। অর্কেস্ট্রায় সঙ্গীত সৃষ্টির মূল নিয়ম হল বিভিন্ন শ্রেণীর বাদ্যযন্ত্রগুলিকে পৃথক শ্রেণীভুক্ত করে রাখা, একটা অন্যের অন্তরায় সৃষ্টি না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখা যাতে একটি যন্ত্রে যে ধ্বনি ওঠে অন্য যন্ত্রে অন্তত একই স্বরগ্রামে তার পুনরাবৃত্তি না ঘটে। এইভাবে প্রত্যেক যন্ত্রের বা শ্রেণীগত যন্ত্রের ধ্বনি বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে।

আধুনিক অর্কেস্ট্রার লক্ষ্য শব্দরূপটা পরিস্ফুট করা। কিন্তু আর এক রকম ঐন্দ্রজালিক ঐক্যতান আছে যার নির্ভরতা ধ্বনি-বৈশিষ্ট্যের কিছুটা অস্পষ্টতার উপর। ধ্বনির মিশ্রণটা কি করে ঘটেছে বুঝতে পারি না বলেই তা আমাদের আকর্ষণ করে। অসাধারণ ধ্বনির সমন্বয়ে আমি বিহ্বল হতে ভালবাসি, প্রশ্ন করতে ভালবাসি কেমন করে সঙ্গীতকার এই সমন্বয় ঘটাল?

অর্কেষ্ট্রা সম্বন্ধে যা বলছি তাতে মনে হবে যে ঐক্যতান সৃষ্টি সঙ্গীত রচয়িতার সন্তোষের জন্য একটা মজার খেলা। একথা অবশ্য সত্য নয়, ছবির মত গানের ধ্বনিগত রঙ যখন কোন ভাবকে প্রকাশ করে তখনই তার মূল্যটা বোঝা যায়। ভাবরূপের উপরেই অর্কেষ্ট্রার গঠন কেমন হবে সঙ্গীতকার স্থির করেন।

সঙ্গীতে রঙের ব্যবহারটা উপভোগ করার একটা দিক হল রঙরূপ পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে সঙ্গীতকারের ব্যক্তিত্বের কি বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠছে তা লক্ষ্য করা। ফরাসী ভাবরূপবাদের (Impressionism) যুগে যেমন বলা হত দেবুসি ও রাভেলের ব্যক্তিত্ব অনেকটা এক। এঁদের অর্কেষ্ট্রার স্বরগ্রাম দেখলে বোঝা যায় যে দেবুসির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে বিচ্ছুরিত চিত্রাভা ও অশ্রুতপূর্ব কোমল ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্বরধ্বনি সৃষ্টি করা। অন্যদিকে রাভেল একই রঙের সবগ্রাম ব্যবহার করে একটা মার্জিত ও নিখুঁত রূপ, একটা কাটা হীরের ঔজ্জ্বল সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন যার মধ্য দিয়ে তার সঙ্গীত ব্যক্তিত্বের বাস্তবধর্মিতা প্রকাশ পেত।

ব্যক্তিত্বের পরিবর্তনের সঙ্গে ধ্বনিরূপের আদর্শ বদলে যায়। আবার আইগর স্ট্রাভিনস্কির দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। তাঁর প্রথম যুগের ব্যালে সঙ্গীতে যে লাল বা রক্তনীলের তীক্ষ্ণ ছটা দেখা যেত গত দশকে তার জায়গায় পাওয়া যাচ্ছে রক্ত ঠাণ্ডা করা আশ্রমিক ধূসরতা। বিপরীত দৃষ্টান্ত দেখি রিচার্ড স্ট্রাসের অর্কেষ্ট্রায়। তাঁর সঙ্গত অতি নিপুণ কিন্তু তাঁর স্তূপীকৃত ধ্বনিরূপ জার্মান ভোজের মত অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে। সমসাময়িক বিশেষ দলভুক্ত মার্কিন সঙ্গীত রচয়িতারা অর্কেষ্ট্রা বাদনে যে স্বাভাবিকতা ও সাবলীলতা দেখিয়েছেন তাতে মনে হয় মার্কিন চরিত্রের সঙ্গে স্বরসাম্যগত ভাষার জন্মগত মিল আছে। সাধারণ লোকের পক্ষে একটা জটিল স্বরলিপির সব সূক্ষ্ম বিকাশটা বোঝা হয়তো অসম্ভব, কিন্তু এখানেও বর্ণালীর কিরণে স্নান করার জন্য তার প্রত্যেকটি বর্ণের বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় না।

এ পর্যন্ত সঙ্গীত থেকে যে সাধারণ আনন্দ পেয়ে থাকি তার বিচার করছিলাম। এবার সঙ্গীতের বিভিন্ন মূল্যবোধের পরিচয়ের জন্য আমি কয়েকজন বিশেষ সুরকারের সুর-সৃষ্টির বিশ্লেষণ করব। বোস্টন সিম্ফনির (Boston Symphony) পরিচালক স্বর্গত "সার্জ কুশোভিজকি" তাঁর বাদকদের বার বার মনে করিয়ে দিতেন যে সুরস্রষ্টা না জন্মালে তাদের বাজাবার প্রায় কিছুই থাকত না। এই প্রচলিত সত্যটা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই। পশ্চিমে সঙ্গীত

স্রষ্টার কণ্ঠে কথা বলে, তার অর্ধেক আনন্দ আসে এই বোধে যে আমরা ইতিহাসের এক বিশেষ মুহূর্তে একটি বিশেষ ব্যক্তির বক্তব্য তাঁর বিশিষ্ট কণ্ঠে শুনতে পাচ্ছি। একটি শক্তিশালী ও কৌতূহলোদ্দীপক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে এই যোগটা না অনুভব করতে পারলে সঙ্গীতের মূল আকর্ষণটাই বোঝা যায় না।

অতএব কার সঙ্গীত শুনতে চলেছি সেটা জানা বিশেষ দরকার। কিন্তু সাধারণ শ্রোতার কাছে সঙ্গীত শুধুই সঙ্গীত। যে সঙ্গীত তাদের কাছে উপস্থিত করা হচ্ছে, তার বিশেষ উপকরণ, বিশেষ ঘটনার দিকে তাদের লক্ষ্য থাকে না। কিন্তু সঙ্গীত যাদের বৃত্তি তাদের কাছে স্বরস্রষ্টার নামটার বিশেষ গুরুত্ব আছে। মঁতে ভার্দি না মাসনে, জে, এস, বাক না জে, সি, বাকের কার সঙ্গীত তাঁরা শুনতে যাচ্ছেন সেটা তাঁদেব জানা দবকার। শ্রোতা হিসাবে স্বরস্রষ্টার বিষয়ে আমরা যা কিছু জানি তা স্রষ্টার অন্তরেব সঙ্গে মিলতে আমাদের সাহাযা করে। আমার কাছে সপিন (Chopin) এক জিনিস, স্কারলাটি সম্পূর্ণ আর এক জিনিস। আমার পক্ষে একটার সঙ্গে আর একটা মিশিয়ে ফেলা অসম্ভব। আপনারা কি পারেন এমন মিশিয়ে ফেলতে? পারুন আর নাই পারুন, আমার বক্তব্যটা বদলাবে না যত স্বরস্রষ্টা আছেন সৃষ্ট সুরকে ঠিক তত রকম ভাবেই উপভোগ করা সম্ভব।

কোনও সঙ্গীতকারের রচনার প্রতি বিতৃষ্ণা প্রকাশের মধ্যে একরকম বিকৃত আনন্দ পাওয়া যায়। আমি যেমন আধুনিক স্বরস্রষ্টাদের মধ্যে একজন আদর্শ সঙ্গীতকার, সার্জ রাস্‌মানিনফের রচনাকে ঠিক সহ্য করতে পারি না। তাঁর দীর্ঘ স্বরসাম্য (symphony) বা পিয়ানো সারাক্ষণ বসে শুনতে হবে ভাবলে আমি সত্যই দমে যাই। মনে হয় এত যে শব্দ-ঝঙ্কার তার উদ্দেশ্যটা কি? মনে হয় রাসমানিনফের (Rachmaninoff) যে স্বর বৈশিষ্ট্য তাতে তাঁর আত্মকাতরতা ও বিষাদ-প্রবণ আত্ম-প্রচেষ্টা ফুটে ওঠে। মানুষ হিসাবে একজন শিল্পীর অসন্তোষটা আমি বুঝতে পারি কিন্তু শ্রোতা হিসাবে তাঁর সৃষ্ট সঙ্গীত আমি সহ্য করতে পারি না। তাঁর প্রয়োগ-কৌশলটার হয়তো প্রশংসা করতে পারি, কিন্তু সেই প্রয়োগ-কৌশলটাও পুরাতন। আমি তাঁর দীর্ঘ ও সুরেলা স্বরলিপি লেখার শক্তিটাকে স্বীকার করি, কিন্তু তাতে যে ঝালর বোনা হয়েছে তাতে তাকে অর্থহীন করে তুলেছে। অঁদ্রে গিদের ভাষায়, “আমার বলবার দরকার নেই, আমি জানি এটা শুনে আপনি খুশী হবেন না।” আসলে রাসমানিনফকে আমি সহ্য করতে পারি কি পারি না তাতে আপনাদের কিছু আসে যাবে না।

আমার বক্তব্য এই সঙ্গীত রচয়িতা যত রকম আছেন আমাদের উপর সঙ্গীতের প্রভাবটাও তত রকম, আর প্রভাবটা, ভাল বা মন্দ যাই হ'ক, জোরাল না হলে, তাকে আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি।

একটি বিপরীত দৃষ্টান্ত দেখতে পাই সঙ্গীতকারদের মধ্যে চিরকালের জনপ্রিয় গিউসেপ ভার্দির (Giuseppe Verdi) মধ্যে। তাঁর সঙ্গীত বাদ দিলেও, আমি তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করে আনন্দ পাই। যদি সততা ও সুস্পষ্টতা কোনও শিল্পীর সৃষ্টিকে উজ্জ্বল করে থাকে, তবে তা করেছে ভার্দির সৃষ্ট সঙ্গীতকে। তাঁর চিঠিগুলির মধ্য দিয়ে তাঁর সঙ্গে ও তাঁর গ্রাম্য ব্যক্তিত্বের সঙ্গে যোগসৃষ্টিতে আমি প্রচুর আনন্দ লাভ করি। এই সংযোগের মধ্যে নিজেকে সজীব করে তোলা যায়, অন্তত একটি সঙ্গীত-গুরুর ব্যক্তিত্বপূর্ণ বিকারহীন চরিত্রে বিশ্বাস করা যায়।

যখন ছাত্র ছিলাম তখন ঐক্যতান বাদকের মধ্যে ভার্দির নাম উচ্চারণ করাটা খারাপ রুচির পরিচায়ক ছিল ও সেদিনের অপেরা ঘরের দুর্দান্ত দানব রিচার্ড ওয়াগনারের সঙ্গে ভার্দির নাম করার প্রশ্ন উঠত না। ভার্দির মধ্যে যেটা সেদিনের সঙ্গীত রসিকদের শিরোমণিরা কিছুতেই ক্ষমা করতে পারতেন না তা হল তাঁর গতানুগতিকতা ও সাধারণত্ব। অস্বীকার করব না ভার্দি কখন কখনও গতানুগতিক পন্থী ও সাধারণ, ঠিক যেমন ওয়াগনার সময়ে সময়ে দীর্ঘসূত্র ও একঘেয়ে। এখানে একটা জিনিস শেখবার আছে। সৃষ্টিধর্মী শিল্পীর রচনায় যে দুর্বলতা চোখে পড়ে তার সঙ্গে কতখানি আমরা নিজেদের মানিয়ে নিই। সঙ্গীতের ইতিহাসে দেখতে পাই ব্রামসের (Brahms) পাণ্ডিত্য, শুবার্ট (Schubert) এর দীর্ঘ ভূমিকা ও মাহ্‌লেরের (Mahler) কৃত্রিমতা তাঁদের প্রথম শ্রোতারা সহ্য করেনি, কিন্তু পরবর্তী যুগের শ্রোতা ওই বিরাট প্রতিভাশালী শিল্পীদের অন্যান্য গুণগুলি উপভোগের জন্য তাঁদের দুর্বলতাগুলি মেনে নিয়েছিল।

ভার্দির সঙ্গীত মাঝে মাঝে যে অত্যন্ত সাধারণ একথা আমরা সকলেই জানি কিন্তু তাঁর জ্বলন্ত সততার সামনে আর সব কিছুই মলিন হয়ে যায়। এই সততার মধ্যে কোনও প্রতারণা নেই, ভেজাল নেই। যে স্তরেই তিনি সঙ্গীত রচনা করুন তাতে অর্থহীনতা প্রকাশ পায় নি। তাঁর বক্তব্যকে তিনি সর্বত্র স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ করে তুলেছেন, তাঁর রচনায় ধ্বনির অযথা প্রয়োগ ঘটেনি ও উদ্দেশ্য কখনও অসার্থক হয় নি। ভার্দির সঙ্গীতের উপাদানগুলি যে সর্বত্র উৎকৃষ্ট এ কথা বলা যায় না, তাঁর সঙ্গীতের

সার্থকতা সেখানে নয়। কিন্তু যখন সেই উপাদানগুলি উৎকৃষ্ট ও ভাব-প্রণোদিত হয় তখন তাঁর স্বরলিপিটা স্বাভাবিক গুণের সঙ্গে মিশে তা ভার্দির সঙ্গীতের মূল্য বাড়িয়ে দেয়।

কেউ যদি জিজ্ঞাসা করেন কোন্ সঙ্গীতকারের রচনা প্রায় ত্রুটিহীন তবে জোহান সেবাটিয়ান বাকের ( Johann Sebastian Bach ) নামটাই সকলের আগে মনে পড়বে। অষ্টাদশ শতকের এই জর্মান সঙ্গীত-গুরু যে সার্বজনীন বন্দনা লাভ করেছিলেন তা অল্প সঙ্গীতকারের ভাগ্যেই জুটেছে। তাঁর রচনায় এমন কি আছে যা আমাদেব এতটা মুগ্ধ করে? বহুদিন ধবে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছি। কিন্তু মনে হয় এর একটা সম্পূর্ণ সার্থক জবাব দেওয়া বোধহয় সম্ভব নয়। অন্তত একটা বিষয় নিশ্চিত যে তাঁব সঙ্গীতেব কোনও বিশেষ অঙ্গের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেই সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা যাবে না। এ বিভিন্ন নিখুঁত উপাদানেব যোগফল, যে উপাদানগুলি সেদিনের সঙ্গীতকারেরা প্রত্যেকেই ব্যবহাব করতেন।

বাকের প্রতিভা তাঁর সঙ্গীত রচনার গতানুগতিক পরিবেশ থেকে অনুমান করা যায় না। সারা জীবন ধরে যে যে কাজের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন সেই কাজের উপযোগী সঙ্গীত তিনি সৃষ্টি করে গেছেন। তাঁর মেলডি উপাসনা সঙ্গীত থেকে ধার কবা, তাঁর অর্কেস্ট্রার আঙ্গিক বিন্যাস তার উপকরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তাঁর রচনার আকৃতি সেদিনের অন্যান্য সঙ্গীতের আকৃতি থেকে ভিন্ন নয়। এই সূত্রে মনে রাখা দরকার যে বাক তাঁর সমসাময়িকদের রচনাগুলি সযত্নে অধ্যয়ন করেছিলেন। পরবর্তী যুগের উপর বাকের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতগুলির যে প্রভাব তার ব্যাখ্যা অবশ্য এর কোন তথ্যের মধ্যেই পাওয়া যায় না।

বাকের সৃষ্টির মধ্যে যেটা সবচেয়ে লক্ষ্য করবার বিষয় তা হল তাঁর অপূর্ব ত্রুটিহীনতা। এই অভ্রান্ত রচনা শুধু বাকের বৈশিষ্ট্য নয়, সেদিনের সকলের বৈশিষ্ট্য। ঐতিহাসিক উন্নতির এক চরম যুগে বাকের আবির্ভাব ঘটেছিল। পূবগামী বহু রচয়িতার রচনার ঐতিহ্য বাকের পিছনে ছিল। সেদিনের পরে সঙ্গীতে ধ্বনি-সঙ্গতির বিধির ও রচনা-নৈপুণ্যের এমন সার্থক সমাবেশ আর কখন ঘটেনি। মেলডি ও ঝঙ্কারের মিশ্রণ, লম্বভাবে সাজান কতকগুলি মূল স্বরসাম্যের ছাঁচের মধ্যে পৃথক সুরের রেখায়িত কল্পনা বাকের বিরাট সৃষ্টির কাঠামো গড়েছে।

ওই সৃষ্টির মধ্যে একটা সম্পূর্ণ যুগের নির্যাসের সমাবেশ ঘটেছে, সে যুগের

সহনীয়তা, মহত্ত্ব ও অন্তরের গভীরতা ফুটে উঠেছে। বাকের সঙ্গীত কেন একটা আধ্যাত্মিক সমগ্রতা বোধ, এক অতি গভীর আদর্শময় দুঃখের প্রত্যক্ষতা বোধ জাগায় তা ব্যাখ্যা করা একরকম অসম্ভব। আমরা শুধু কথার পর কথা জড়ো করতে পারি, কিন্তু সঙ্গীতের অপার্থিব মহত্ত্ব, বিশেষ করে বাকের সঙ্গীতের মহনীয়তার বর্ণনা করতে পারি না।

সুরস্রষ্টা ও তাঁর রচনার সম্বন্ধ নির্ণয়ে যাদের আগ্রহ তাদের বাকের পরবর্তী শতকের দিকে তাকিয়ে দেখতে হবে, বিশেষ করে লুডুইগ ভন বেটোফেনের জীবন ও সঙ্গীতের আলোচনা করতে হবে। সম্প্রতি ইংরেজ সমালোচক উইলফ্রিড মেলার্স বেটোফেন সম্বন্ধে বলেছেন, "মানুষ ও শিল্পী বেটোফেনের ব্যক্তিত্বের যে সারবত্তা তার ব্যাখ্যা সঙ্গীতের সাঙ্কেতিক ভাষায় করা চলে না।" মেলার্সের বক্তব্য ওই ব্যাখ্যায় মানুষের অধিকার, তার ইচ্ছার স্বাধীনতা, নেপোলিয়ান, ফরাসী বিপ্লব ও প্রাসঙ্গিক আলোচনার কথা এসে পড়বে। ঐতিহাসিক ঘটনার আলোড়ন বেটোফেন চিন্তাকে ঠিক কি ভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল এখন জানা অসম্ভব। কিন্তু একথা ঠিক তিনি যে সঙ্গীত সৃষ্টি করেছিলেন তা উনিশ শতকের গোড়ায় তাঁর ধারণায় আসতো না যদি না তাঁর সঙ্গে সেদিনের বৈপ্লবিক মনোভাবের যোগ থাকতো ও যদি না সেই সংযোগের ফলটিকে তিনি তাঁর অসাধারণ সঙ্গীত কল্পনার মধ্যে প্রকাশ করতে পারতেন।

বেটোফেন সঙ্গীতে তিনটি চমকপ্রদ উদ্ভাবনের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমত শব্দের ভাষার সঙ্গে মনের উপকরণের যে যোগ আছে সেই উপকরণকে তিনি তাঁর রচনায় প্রাধান্য দেন। তারই জন্য সঙ্গীত তার কিছুটা সারল্য হারায়, কিন্তু অন্যদিকে সে মানসিক গভীরতা লাভ করে। দ্বিতীয়ত তাঁর মনের ঝঞ্ঝা ও বিক্ষোভ "সঙ্গীত কলার নাটকীয় রূপের" জন্য আংশিকভাবে দায়ী। গুরুগম্ভীর গুরুগুরু শব্দের কম্পন, অপ্রত্যাশিত স্থানে স্বর-ভঙ্গীর তীব্রতা, অশ্রুতপূর্ব ছন্দের পুনরাবৃত্তি ও শব্দ তরঙ্গের জীবন্ত বিরোধীতা এ সবের মধ্যেই অন্তরের নাটকের বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় যা তাঁর সঙ্গীতকে নাটকীয় করে তুলেছিল।

আমার ধারণা এই দুটি উপাদান মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী ও নাট্য আবেগ—তাঁর তৃতীয় ও খুব সম্ভবত সব থেকে বড় মৌলিক অবদানের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এই অবদান হল বিস্তৃত ক্ষেত্র জুড়ে একটা গতিশীল সঙ্গীতের রূপ-চিন্তা, যে বিস্তার তাঁর আগে কেউ কল্পনা করেনি ও যে রূপচিন্তার

অনিবার্যতাকে ঠেকিয়ে রাখা অসম্ভব ছিল। বেটোফেনের সঙ্গীতে এই অনিবার্যতা-বোধটা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। ধ্বনি ভাষা নয়, তার মধ্যে যুক্তির সাক্ষ্য নেই। এইজন্য প্রতি যুগের সুরস্রষ্টা এই বাধাটাকে কাটিয়ে উঠতে সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে একটা দিকের ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা করেছেন। বেটোফেনের মধ্যে এই সমস্যা সমাধানের একটা চরম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। শব্দের ভাষাব এমন দিক-দর্শন এমন অনিবার্যতা আর কখনও দেখা যায়নি।

বেটোফেনের সঙ্গীত তাঁর প্রথম শ্রোতাদের কতটা অসহনীয় আঘাত দিয়েছিল তা বুঝতে ইতিহাসের জ্ঞানেব দরকার হয় না। এখনও পর্যন্ত তাঁর কয়েকটি বিশেষ রচনা কি করে সঙ্গীতপ্রেমিক জনতা গ্রহণ করেছিল তা আমি বুঝতে পারি না। একদিকে যে কথা লোকে শুনতে চায় তাই তিনি শুনিয়েছেন। কিন্তু একটু মনোযোগ দিয়ে শুনলে তাঁর সঙ্গীতের ভাষাকে যে স্বীকার করাও সম্ভব নয় তা স্পষ্ট বোঝা যায়। শুধু শব্দ হিসাবে তাঁর সঙ্গীত রসঘন তো নয়ই বরং শুষ্ক। শ্রোতাদের তুষ্ট করতে বেটোফোন মোটেই রাজী নন, তারা কি চায় না চায় সে বিষয়ে তাঁর কোন গ্রাহ্য নেই। তার সঙ্গীতের বিষয়ের মধ্যে তেমন কিছু লক্ষ্যণীয় নেই, তেমন কিছু মধুরতা নেই। তাঁর রচনায় বক্তব্যের স্পষ্টতা যত আছে, সৌন্দর্যের আল্পনা তত নেই। বেটোফেনের ভাষা রুক্ষ ও লৌকিকতাহীন। তাঁর বিষয়-বস্তুর গুরুত্ব এতই বেশী যে শহুরে ভদ্রতা ও কূটনৈতিক ভাষা ব্যবহারের যেন কোনও প্রয়োজনই হয় না। তার প্রকাশের ভঙ্গিটা এতই কর্তৃত্বপূর্ণ যে মনে হবে তাঁর সঙ্গীত না শুনে অন্য উপায় নেই। বেটোফেনের সঙ্গীতের অর্থ ঠিক এই, আপনাকে তা শুনতে হবে।

সমস্ত কিছুর উপর বেটোফেনের একটা গুণ বিশেষ করে আছে, সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে অন্যকে বশীভূত করা, তাঁর ভাবনা গ্রহণে বাধ্য করা। কিন্তু তাঁর এত জোর কিসের জন্য? এমন এক মানুষের নৈতিক উদ্যম ও বিশ্বাসে বশীভূত না হয়ে, মুগ্ধ না হয়ে উপায় কি? বেটোফেনের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি বিজয়োল্লাসের মূর্ত প্রকাশ, আর এই বিজয় ঘোষণা মানুষের অবস্থার সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে সত্যের সমর্থন। সৃষ্টিধর্মী শিল্পীর মধ্যে বেটোফেন একজন বিরাট অস্তিত্ববাদী। দুঃখজড়িত এই জীবনকে তাঁর সঙ্গে মুক্ত দৃষ্টিতে দেখে আমরা উল্লসিত না হয়ে পারি না। তাঁর সঙ্গীত আমাদের প্রকৃতিতে যা কিছু ভাল তাকে টেনে বার করে। বিশুদ্ধ সঙ্গীতের ভাষায় তিনি যেন আমাদের মহৎ হতে, শক্তিশালী হতে, হৃদয়বান হতে ও সহানুভূতিশীল হতে আবেদন করেন। এই নৈতিক উপদেশগুলি তাঁর সঙ্গীতের অন্তর্গত বলে আমরা ধরে নিই, কিন্তু তাঁর সেই

সঙ্গীতটাই—তাঁর নয়টি সিম্‌ফনি, ষোলটি তারের চতুষ্পদী ( quartets ) ও পিয়ানোর বত্রিশটি সোনাটা ( sonata )—আমাদের মনকে একাগ্রভাবে আকর্ষণ করে আর সেই আকর্ষণবোধ যতবারই তাঁর সঙ্গীত শুনি ততবার একই ভাবে আমাদের মনে জাগে। বেটোফেনের সঙ্গীতের সারবস্তু যেন কখনও নষ্ট হয় না, শব্দের অস্থায়িত্ব তাঁর গানের অদ্ভুত পরিবর্তনহীন বস্তুসত্তার হানি করে না।

আমি এখানে শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকারদের সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। তার অর্থ কিন্তু এই নয় যে আপনি সেরা ওস্তাদ ও তাদের সেরা সঙ্গীত বাদে আর কিছুতে মন দেবেন না। অতীতের গৌরব সম্বন্ধে বদ্ধমূল ধারণা ও শুধু সেরা সঙ্গীত-গুলিকে নিয়ে ব্যস্ত থাকা আমাদের আধুনিক সঙ্গীত-কলার পক্ষে হানিকর হয়েছে। এতে আমাদের সঙ্গীত-জগতের অভিজ্ঞতা সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়ে ও বর্তমান সম্বন্ধে আমাদের আগ্রহ খর্ব হয়। উৎকৃষ্ট স্বরস্রষ্টার পূর্ণ বিকাশের আমরা সুযোগ দিই না। আমরা মুখে স্বীকার না করলেও এ কথা সত্য মানুষের সব জিনিসেই অরুচি জন্মায়, শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতও এর থেকে বাদ পড়ে না। আমার মনে হয় বাকের পূর্বগামীদের মধ্যে একটা অপটুতার আকর্ষণ ও সহজ সরল সৌষ্ঠব ছিল যা বাকের সর্বাঙ্গসুন্দর, নিখুঁত রচনার মধ্যে পাওয়া অসম্ভব। চিত্রশিল্পী দেলাক্রোয়া ( Delacroix ) এই একই কথা বলেছেন নাট্যকার রাসিন সম্বন্ধে, "তাঁর নিখুঁত সৃষ্টিতে, যাতে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি নেই, সেই রসানুভূতিটা পাওয়া যায় না যা পাই অন্য শিল্পীর ত্রুটিপূর্ণ সুন্দর সৃষ্টির মধ্যে।"

শিল্পচর্চার যে আনন্দ তার কতকটা আসে সমসাময়িক শিল্প-জগতের মধ্যে অভিযানের উত্তেজনা থেকে। কিন্তু সঙ্গীতের ক্ষেত্রে অন্য মনোভাব দেখি। একই লোক যাঁরা মনে করেন যে আধুনিক বই, নাটক ও চিত্র-শিল্প বিতর্কমূলক হওয়া স্বাভাবিক, তাঁরাই সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বিতর্ক ও সংশয়কে কাটিয়ে চলতে চান। এক্ষেত্রে যা পুরাতন ও পরিচিত তার প্রতি একটা অদম্য ঝোঁক দেখা যায় এবং নূতন স্রষ্টার রচনা সম্বন্ধে কোন আগ্রহই দেখা যায় না। এমন সঙ্গীত-প্রেমিক, আমার মতে, গান যথেষ্ট পরিমাণে ভালবাসেন না। তা যদি হত তবে এ যুগের নূতন ও অপরিচিত সঙ্গীত সম্ভাবনার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তিনি চোখ বুঁজে থাকতে পারতেন না। চার্লস আইভ ( Charles Ives ) বলতেন যে কান স্বর-বৈষম্য সহ্য করতে পারে না তা মেয়েলি কান, মোমের কান। সৌভাগ্যবশত সব দেশেই

এমন কয়েকজন সাহসী পুরুষের দেখা পাওয়া যায় যাঁরা তাঁদের আনন্দের জন্য মাটি খুঁড়ে দেখতে রাজি, যাঁরা যে শিল্পীর গুণপনা বিতর্কের বিষয় তার সম্মুখীন হতে খুশী হন।

এমন অভিযান-প্রিয় শ্রোতাদের সহজে ভয় দেখান যায় না। আমার নিজের সম্বন্ধেও বলতে পারি, যখন কোন রচনার অর্থটা আমি তখনই ধরতে না পারি, আমি মনে মনে বলি, "এর ভিতরে ঠিক ঢুকতে পারলাম না, আরও দু' একবার চেষ্টা করে দেখতে হবে।" সমসাময়িক কোন সঙ্গীত শুনতে আমার ভাল না লাগতে পারে, কিন্তু যতক্ষণ না ভাল না লাগার কারণটা বুঝতে পারি আমি স্বস্তি পাই না, কাজটাকে অসম্পূর্ণ রাখলাম বলে মনে হয়।

এতে অবশ্য সহৃদয় সঙ্গীত প্রেমিকের সমস্যার সমাধান হল না। এঁরা আধুনিক সঙ্গীতকে ভালবাসতে চান, কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব বুঝে উঠতে পারেন না। সত্য বলতে কি যা অপরিচিত তাকে মনোমত ভাবে পরিচিত করে তোলার কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই, অলৌকিক সূত্র নেই। একমাত্র সহজ হওয়ার উপদেশ এই দেওয়া যেতে পাবে। সেইটাই প্রথম দরকার। সহজ হয়ে বসে একই গান বার বার শুনতে হবে যতক্ষণ না তার পূর্ণ অর্থটা ধরা পড়ে। সব নূতন গানই যে বোঝা শক্ত তা নয়। একবার আধুনিক স্বরস্রষ্টাদের তাঁদের বোধগম্যতার পরিমাপ মত বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে দেখেছিলাম বেশীর ভাগ স্রষ্টা সহজ বোধগম্যের পর্যায়ে পড়েন।

নূতন সঙ্গীত নিয়ে চর্চা করার একটি আকর্ষণ হল ওই চর্চার মধ্য দিয়ে কোন যুবক শিল্পীর গুরুত্বপূর্ণ রচনার আবিষ্কার করা। নূতন প্রতিভার আবিষ্কার সম্বন্ধে ফরাসী সমালোচক সাঁত ব্যোভ (Sainte Beuve) বলেছেন, "নূতন প্রতিভাকে তার সজীবতা, উন্মুক্ততা ও আদিমতার মধ্যে চিনতে পারা, অর্জিত ও উৎপাদিত গুণে সে মার্জিত হয়ে ওঠার আগে তাকে বুঝতে পারায় যে আনন্দ সমালোচকের পক্ষে তার চেয়ে বড় আনন্দ আর কিছুতেই নেই।"

সঙ্গীতের এক নূতন আদর্শ খাড়া করে আজকের কনিষ্ঠ সঙ্গীত-শিল্পীরা চিরাচরিত প্রথায় তাদের জ্যেষ্ঠদের মনে ধাঁধার সৃষ্টি করেছে। তারা এমন সঙ্গীত সৃষ্টি করতে চেয়েছে যা সর্বতোভাবে নিয়ন্ত্রিত। যা তারা সৃষ্টি করেছে তা স্বরলিপির পাতায় শৃঙ্খলাযুক্ত বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃত অনুষ্ঠানের সময়ে তা খাপছাড়া ও একই রকম সুরের পুনরাবৃত্তি বলে ধারণা হয়। এমন

একটি রচনা প্রথমবার শুনে আমি এই মন্তব্য টুকে রেখেছিলাম: "মনে হয় এই ছেলেগুলি পৃথক স্বর ও পৃথক ধ্বনি নিয়ে প্রথম থেকে আবার সুরু করতে চায়। এদের সুরগুলি বিভক্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মত চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। পুরানো ধারাবাহিকতা ছিন্ন হয়েছে, বিষয়গত সম্বন্ধও নষ্ট হয়ে গেছে। এই সঙ্গীতে পরে কি ঘটবে সে বিষয়ে কিছু না জেনেই তার জন্য আমারা অপেক্ষা করি এবং ঘটনাটি শেষ হবার পরেও বুঝতে পারি না কেন এমন হল। পল ক্লি স্কুলের চিত্র-শিল্পের প্রভাব এই নূতন সঙ্গীতকারদের উপর বোধহয় এসে পড়েছে। এর একমাত্র বর্ণনা বোধহয় সম্বন্ধশূন্য সুরের আপাতদৃষ্টিতে বিভেদ। এর কোথায় শেষ হবে কেউ বলতে পারে না, আমিও জানি না। শ্রোতারা যাই ভাবুন একথা নিশ্চয় যে এমন নিরাশার সঙ্গীত এর আগে সৃষ্টি হয়নি।"

ইউরোপের কয়েকজন যুবক সুরস্রষ্টা তড়িৎ-চালিত উপায়ে সঙ্গীত সৃষ্টির প্রাথমিক পরীক্ষায় নেবেছেন। এখানে বাদ্যযন্ত্রের বাদকের বা মাইকের প্রয়োজন নেই। এর জন্য দরকার টেপ্ রেকর্ডারে তড়িৎ-চুম্বক কম্পনের ছাপ তোলা। এর ফলটাকে শুনে মনে হয় সঙ্গীতের আনন্দ বলতে যা বুঝতাম তাকে আরও বড করে দেখতে হবে, বিস্তৃত জায়গায় তার সন্ধান করতে হবে। সঙ্গীতের গঠনে যে সব শব্দের ব্যবহার আমরা দেখছি তার বাইরে থেকে আরও শব্দকে আমাদের স্বীকার করতে হবে। না করারই বা কি কারণ আছে? আমাদের অনেক ধারণারই পরিবর্তন ঘটেছে, শুধু সঙ্গীতের বেলায়ই বা তার ব্যতিক্রম আশা করব কেন? যুবক সঙ্গীতকারের সম্বন্ধে আমরা যাই কেন না ভাবি, তাদের আরও সময় দিতে হবে। তাদের নূতন দেশে অভিযান শেষ হওয়ার আগেই তাদের প্রচেষ্টার মূল্য যাচাই করাটা ভুল।

আনুষ্ঠানিক "জাজের" সম্বন্ধে কিছু না বলে সঙ্গীতের আনন্দের আলোচনা শেষ হতে পারে না। কিন্তু কেউ কেউ হয়তো জিজ্ঞাসা করবেন এই আলোচনার অন্তর্গত হবার গুরুত্ব কি "জাজের" আছে? "জাজের" গুরুত্ব কতখানি জানি না কিন্তু ওই প্রশ্ন নিয়ে তর্ক করার সময় পার হয়ে গেছে। "জাজ" সঙ্গীত জগতে স্থান করে নিয়েছে ও তা আমাদের আনন্দ যোগাচ্ছে। আসলে গোলযোগের সৃষ্টি হয় যখন "জাজ" শব্দের প্রয়োগটাকে একটা বিধিবদ্ধ ক্ষেত্রের বাইরে টেনে নিয়ে যাই। ভাব প্রকাশের বিস্তৃতি, অনুভূতির গভীরতা ও ভাষার সার্বজনীনতা যা গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গীতে পাই তা "জাজের"

মধ্যে পাওয়া সম্ভব নয়। ("জাজের" একটা সার্বজনীন আবেদন আছে, কিন্তু সেটা অন্য কথা।) কিন্তু "জাজে" যা পাই তা আবার গুরুগম্ভীর সঙ্গীতে পাই না। তার মধ্যে সঙ্গীতের কথ্য ভাষার পরিচয় পাই, যা আমাদের একরকম পরিচয়ের আনন্দ দেয়। ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের স্থায়িত্ব না থাকলেও "জাজের" মধ্যে একটা বর্তমানের উপস্থিতি বোধ, সাক্ষাৎ বোধ আছে যা পৃথিবীর সর্বত্র শ্রোতাদের মধ্যে উল্লাসের সৃষ্টি করে।

ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীন, মুক্ত "জাজের" সুর আমার ভাল লাগে যদি তা নিয়মিত পরিবেশিত পণ্যদ্রব্য না হয়। সৌভাগ্যবশত প্রগতিশীল "জাজ" স্রষ্টারা "জাজের" চিরাচরিত প্রথা থেকে মুক্ত হতে চেষ্টা করেন যাতে আমাদের ধারণার সঙ্গে তাঁদের ধারণার পার্থক্য ক্রমশই মুছে যায়। আমার বক্তব্য হল এই যে সম্প্রতি গুরুগম্ভীর সঙ্গীতে যে ধ্বনি ও আকৃতির স্বাধীনতা দেখা গেছে তা আজকের "জাজ" বাদকদের বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেছে। ফলে "জাজ" রচয়িতা ও অন্যান্যদের মধ্যে পার্থক্যটা ক্রমশই বোঝা শক্ত হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই দুই জগতের সংযোজন ভবিষ্যতের এক নূতন সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

মনোযোগী শ্রোতা তাই সঙ্গীতের নানারূপ আনন্দের মধ্যে একটা সাধারণ ঐক্য খুঁজে পাবে। বিষয়বস্তু ও অর্থ বাদ দিলেও সঙ্গীতকলা আমাদের আত্মার উপর সুখের প্রলেপের কাজ করে। সঙ্গীত আমাদের অস্তিত্বের বাস্তবতা ভোলবার উপায় নয় বরং তার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হবার পথ পাই। জীবনের এ এক অফুরন্ত নির্ঝর যার থেকে আমরা আমাদের প্রাণের পাত্র পূর্ণ করে নিতে পারি।

# মানুষের নানাপ্রকার প্রেম

## মার্টিন সিরিল দারসি, এস. জে

বহু বছর ধরে রেভারেণ্ড মার্টিন সিরিল দারসি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপনা করেন ও ১৯৩২ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি ক্যাম্পিয়ন হলের অধ্যক্ষ ছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে তিনি গ্রেট্ ব্রিটেনে জেস্যুট দলের নেতৃত্ব করেন। ব্রিটেনের বেতার সংস্থা, ব্রিটিশ ব্রডকাষ্টিং কর্পোরেশনে তিনি ক্যাথলিক সভ্য পদটিও পান। রেভাঃ দারসি প্রায়ই যুক্তরাষ্ট্রে পরিভ্রমণে যান। সেখানে নোতর ডামের ফোর্ডহামে, প্রিন্সটনের উচ্চশিক্ষার ইন্‌স্টিটিউটে ও জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষকের কাজ করেছেন। তাঁর বহু বইএর কতকগুলির নাম, The Nature of Belief, সম্প্রতি প্রকাশিত Communism and Christianity ও যন্ত্রস্থ The Meaning and Matter of History: A Christian View.

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ দ্বারেব উপর এই কথাগুলি লেখা আছে, "যখন আমাদের বর্তমান যাজকেরা স্বর্গত হবেন তখন গির্জা যাতে অশিক্ষিত যাজকের হাতে না পড়ে সেই ভয়ে……।" এই কথাগুলি থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতাদের উদ্দেশ্য যে ছাত্রদের "জ্ঞান ও ধর্মে" শিক্ষা দেওয়া তা বোঝা যায়। এ যুগের পূর্ব পর্যন্ত ধর্ম ও সংস্কৃতি হাত মিলিয়ে চলত। প্রাচীন সমাজে রাজাই হতেন প্রধান ধর্মগুরু ও জ্ঞানী লোকেরা হতেন দ্রষ্টা ও ধর্ম-প্রচারক। বেনিডিকটাইন ও যাজকদের বিদ্যালয়ে সংস্কৃতির সূচনা হয়। মধ্যযুগে পণ্ডিতরা ছিলেন মুণ্ডিত মস্তক যাজকের দল। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ বাণী হল "ঈশ্বরই আমার আলো।" আজও পর্যন্ত পশ্চিমের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির উপর খৃষ্টীয় দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব কতখানি তা দেখা যায়। এর ঠিক বিপরীত ছবিটাই অথচ জগতে দেখতে পাচ্ছি। পৃথিবীর একভাগ আজ ঘোর নিরীশ্বরবাদী, অন্যভাগ ধর্ম-নিরপেক্ষ, তা ধর্মের বিরোধী হতে, সহায়ক হতে পারে বা ধর্ম সম্বন্ধে পক্ষপাতশূন্যও হতে পারে।

অতএব একথা মানব যে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ধর্মের আর সেই পুরানো স্থানটি নেই। শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে নির্দেশ দেওয়ার অধিকার থাকায়,

খ্রীষ্টীয় ধর্মতত্ত্ববিদেরা তাঁদের কয়েকটি ধারণা ছাড়তে ইতস্তত করেছিলেন। ফলে কতকগুলি বিতর্কযোগ্য বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে বৈজ্ঞানিকদের সংঘর্ষ বাধে। সেই থেকে ধর্ম ও বিজ্ঞানের চিরাচরিত শত্রুতাটাকে আমরা মেনে নিয়েছিলাম। এখন কিন্তু বিজ্ঞান তার স্বাধিকারে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং আজকের যেটা প্রশ্ন তা হল বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে একটা নূতন সম্প্রীতি সৃষ্টির, যোগসৃষ্টির সময় এসেছে কিনা। গণতন্ত্রের একটা ঐক্যপূর্ণ ও শক্তিশালী দর্শনের দরকার। অন্যদিকে বিশ্বাসহীন মানুষ দুঃস্বপ্ন রোগে ভোগে। খৃষ্টধর্ম যদি তার ভাণ্ডার থেকে নূতন অথচ প্রাচীন কিছু বার করতে পারে, যদি তার সম্পদকে আধুনিক অবস্থায় কাজে লাগাতে পারে, তবে একটা নূতন ও প্রাণপূর্ণ সংস্কৃতির সম্ভাবনা দেখা যেতে পারে।

ধর্ম ও দর্শনের অগ্রগতি যে নীতিতে ঘটে তা বিজ্ঞানের অগ্রগতির নীতি থেকে ভিন্ন। জড়প্রকৃতির অনুশীলন কি পদ্ধতিতে করা উচিত সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিকেরা একমত নন। বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও প্রকৃতির মধ্যে যে সম্বন্ধ ও যে প্রকল্পগুলির উপর নির্ভর করে আবিষ্কার ঘটেছে তার প্রকৃত কাজ কি সে নিয়ে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। এটা কিন্তু নিঃসন্দেহে বলা যায় যে যতদিন প্রকল্পগুলি তথ্যকে একসূত্রে গাঁথতে ও ভবিষ্যৎ নির্ধারণে সাহায্য করে ততদিন বৈজ্ঞানিকেরা ওই প্রকল্প ব্যবহার করেন। নূতন তথ্যের সঙ্গে প্রকল্পের মিল না হলে বৈজ্ঞানিকেরা অন্য প্রকল্পের আশ্রয় খোঁজেন।

ধর্ম ও দর্শনে প্রকল্পের কাজ অন্য রকম। এখানে জ্ঞানের বিস্তার ঘটে এক রকম জল্পনার মধ্য দিয়ে যার কাজ একটি প্রচলিত সত্যের একাগ্র অনুধাবন, সেই সত্যের নূতন পরিধির কল্পনা ও বিভিন্ন সত্যের মধ্যে অজ্ঞাত সম্বন্ধের নির্ণয়। এখানে যা স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ তাই ক্রমাগত আমাদের বিস্ময়ের কারণ হয়ে দেখা দেয়। কখনও কেম্ব্রিজের জর্জ এডওয়ার্ড মুরের মত একজন বিশ্লেষণকারী দার্শনিক হয়তো দেখান "সাধুতা"র মত একটা সহজ ধারণা সম্বন্ধে আমাদের চিন্তা কতটা আল্‌গা। অধিবিদ্যাবিদ্ স্বর্গত এল্‌ফ্রেড্ নর্থ হোয়াইটহেড্ এমন সব বস্তু ও ধারণার সংশ্লেষণ ঘটান যা আমরা এতদিন সম্পূর্ণ সম্বন্ধহীন বলে ধরে রেখেছিলাম। দর্শনের কাজ হল চিরাচরিত সত্যকে নিয়ে আর ধর্মের বিষয় হল ঈশ্বর ও মানুষ, বিবেক, আদর্শ ও অভিজ্ঞতা, ভাগ্য ও মৃত্যু-পরবর্তী জীবন।

মানুষের মন, তার সংবেদনশীলতার মত, কতকগুলি রেওয়াজ মেনে চলে, একটা কোন ধারণা নিয়ে বেশিদিন সে থাকতে পারে না। প্রতিভার কাজ

হল সেই ধারণাকে ত্যাগ করে তার জায়গায় একটা নূতন বা কৃত্রিম ধারণার সূত্রপাত করা নয়, সেই একই ধারণার একটা নূতন দিকের পরিচয় তুলে ধরা ও তার সঙ্গে এমন সব বস্তু বিষয়ের সংযোগ আবিষ্কার করা যা আগে কারও চিন্তায় আসেনি। মামুলি কথা যা প্রত্যক্ষবাদী অগ্রাহ্য করেন মনীষার কাজ সেই মামুলি বিষয় নিয়েই। সুন্দরের মত সত্যকে তাই "সদা প্রাচীন ও সদা নূতন" হতে হয় ও যিনি প্রেমিক তাঁর পক্ষে শুধু "প্রেম" এই একটি কথা ব্যবহার করাই যথেষ্ট হতে পারে, তার আর পুনরাবৃত্তির দরকার হয় না।

যে কোন প্রকৃত দার্শনিক বা ধর্মগত ভাবের মধ্যে এর উদাহরণ পাওয়া যায়। "প্রেম" বা "মানুষের ব্যক্তিত্ব" এ নিয়ে যদি একটুখানি বসে চিন্তা করি, দেখতে পাব শত শত বছর ধরে ওই শব্দটির অর্থ এক থাকলেও তা ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, পূর্ণতা লাভ করেছে। খৃষ্টধর্ম অতি প্রাকৃত উপায়ে উদ্ঘাটিত সত্য প্রচারের দাবি করে। এইজন্য বলা হয় খৃষ্টধর্মে কোন প্রকাশিত বা বাহ্য দ্বন্দ্ব থাকতে পারে না।

আজকের শিক্ষিত জনসাধারণ এই দাবির অর্থটা বুঝতে পেরেছেন। ফলে বিজ্ঞান ও ধর্মের যে কলহ তা কমে এসেছে। ধর্ম ও বিজ্ঞানের বিষয়-বস্তু এক এই ভুল ধারণা থেকে বিরোধের সূত্রপাত হয়। এ ভ্রান্তি দু'পক্ষেরই। বৈজ্ঞানিক বুঝতে পারেন নি যে, যে মাপকাঠি তিনি ব্যবহার করেন তা তার বিষয়-বস্তুকে সীমিত করে। অন্যদিকে খৃষ্টধর্মী লক্ষ্য করেন নি যে তাঁর ধর্ম-বিশ্বাসের বস্তু বা বিশিষ্ট দিকের নির্ভর একটা বিশেষ অন্তর দৃষ্টির উপর। এক বিঘা চাষের জমির দিকে একজন কৃষক, একজন বৈজ্ঞানিক ও চিত্রকর যে বিভিন্ন দৃষ্টিতে তাকান তার বিশ্লেষণ করলেই যা বলছি তার অর্থটা পরিষ্কার হয়ে উঠবে। তেমনই বেহালা থেকে যে আওয়াজ বার হয় তাকে কেউ বলতে পারেন মরা ঘোড়ার চুলের সঙ্গে মরা বেড়ালের অন্ত্রের ঘর্ষণের শব্দ, আবার কেউ বলতে পারেন তা বেটোফেনের সঙ্গীত। সেণ্ট আগাষ্টিন বলেছিলেন, ক্রুশকে ঘিরে যারা দাঁড়িয়েছিল তারা এক অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড দেখেছিল; খৃষ্টানের চোখে সেই একই দৃশ্যের অর্থ মানুষের উদ্ধারের জন্য ঈশ্বরের জীবন উৎসর্গ। এখানে একই তথ্যের দু'রকম ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে যথার্থ কোন্‌টি বুঝতে হলে দেখতে হবে কোথায় তথ্যগুলি পরস্পর বেশি সম্বন্ধযুক্ত ও তথ্য কি নির্দেশ করে। ঠিক এইভাবেই আদালতে বা ডিটেকৃটিভ বইতে একটা বিচ্ছিন্ন সাক্ষ্য-সমাধানে সূত্র হয়ে ওঠে।

ধর্ম ও বিজ্ঞানের সম্পর্কটা বুঝতে হলে পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গির এই বিভিন্নতাটা

আগে জানা দরকার। বৈজ্ঞানিকের নির্ভর দেখা ও পরীক্ষার উপর। এর জন্য অতি উন্নত প্রয়োগ-পদ্ধতির ব্যবহারে পরিমাপ করাটাই একমাত্র প্রয়োজন। প্রকৃতির মধ্যে কার্যকারণ নিয়মের একটা ঐক্য আছে এই সহজ বুদ্ধিগত দার্শনিক মতবাদকে কিন্তু পরীক্ষণমূলক বিজ্ঞান এতদিন অস্বীকার করেনি। এখন অবশ্য বিজ্ঞান তার সীমা স্থির করে নিয়ে শুদ্ধ হয়ে উঠেছে। কার্যকারণেব ভাষার মধ্যে জড়িয়ে না পড়ে বিজ্ঞান এখন গাণিতিক সমীকরণে লিপ্ত, ও তার ভবিষ্যৎ বিচারের নির্ভর গাণিতিক সম্ভাব্যরূপের উপর। এমন বিচারে অবিশ্বাস্য সাফল্য লাভ করা গেছে, কিন্তু তার জন্য দাম দিতে হয়েছে। কারণ আজ যদি কোন গুণী, বিখ্যাত বৈজ্ঞানিককে জিজ্ঞাসা করা হয় তাঁর বক্তব্যটা কি তবে তিনি তাঁর জবাব দেওয়ার অক্ষমতাটাই স্বীকার করবেন। অনেকে বলবেন বস্তুর অস্তিত্বে ও চেতনায় বিশ্বাসটা জৈব-প্রকৃতিগত। কিন্তু সেই বস্তুগুলিকে ভেঙে পরিমেয় সংখ্যা হিসাবে আবাব যদি গঠন করি তবে সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের দেখা পাই।

এ কথাও ঠিক যে গাণিতিক জগত এই অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় গুণের জগতের সম্পূর্ণ প্রতীক হতে পারে না, যেমন তুলাদণ্ডে ওজন করা খবর আমাদের মনুষ্যত্বের সব খবরটা দিতে পারে না। বিজ্ঞানমাত্রই একটা না একটা মাপকাঠি ব্যবহার করে ও তার ফলাফল ওই মাপকাঠির যেটুকু শক্তি তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। প্রাচীনকাল থেকে অঙ্কশাস্ত্রের বা পরিমেয়তার সুদূরপ্রসারী ব্যবহার দার্শনিকদের একাধারে মুগ্ধ করেছে ও সহায় হয়েছে। অঙ্কশাস্ত্রের প্রয়োগে মানুষের সবকিছু কাজকর্মেরই যেন বিচার সম্ভব। জৈব ও জড় পদার্থের মধ্যে মূলগত পার্থক্য থাকলেও, দুটি ক্ষেত্রেই বৈজ্ঞানিক নীতির প্রয়োগ সম্ভব। সঙ্গীতের একটা নিজস্ব মূল্য আছে ও মাপকাঠি আছে, কিন্তু তবু সেই সঙ্গীতকেই সংখ্যা-নির্ভর গাণিতিক ভাষায় ব্যাখ্যা করা যায়। তেমনই অর্থনীতি, সমাজনীতি ও কিছুটা পরীক্ষামূলক মনস্তত্ত্বে পরিসংখ্যান পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয়।

বিজ্ঞানের দার্শনিক ও প্রত্যক্ষবাদীর কয়েকটি দল মনকে কতকগুলি আচরণের সমষ্টি হিসাবে বুঝতে চেয়েছেন।

এইভাবে যা কিছু আপনা থেকেই স্পষ্ট তাকে গণিত ও পরিমেয়তার অন্তর্গত করার চেষ্টা হয়েছে। সময়ের পরিমাণ হচ্ছে দূরত্বে। আলোকে বলছি তরঙ্গ।

বার্টরাণ্ড র‍্যাসেল লিখেছেন, "চক্ষুষ্মান্" লোকের যে আলোর অভিজ্ঞতা

ঘটে ও দৃষ্টিহীন মানুষ যার থেকে বঞ্চিত হয়, সেই আলোকও বিজ্ঞানের মতে আমাদের জগত-ছাড়া, ইন্দ্রিয়াতীত কিছু নয়।" বৈজ্ঞানিকেরা জীবের বৃদ্ধির ব্যাখ্যা করেন জড়ের যোগের মধ্য দিয়ে। কিন্তু একটা কথা তাঁদের ভুলে থাকাতে হয় যে কতকগুলি পদার্থের সংযোগে জীবদেহের বৃদ্ধি ঘটে না। যে পরমাণু কণা একটা সমষ্টির সৃষ্টি করে তা পরমাণুই রয়ে যায়। কিন্তু জৈব পদার্থের বৃদ্ধিতে যা প্রথমে ছিল তা শেষ পর্যন্ত থাকলেও, তাব একটা পরিপূর্ণতা লাভ হয়, কুৎসিত হাঁসের ছানা রাজহংস হয়ে ওঠে। অতএব যদি সংখ্যাবাচক ও গুণবাচক, অজৈব ও জৈবকে, তাদের পার্থক্য সত্বেও কোন বিশেষ কার্যসিদ্ধির জন্য একইভাবে দেখা হয় তাহলে বুঝতে হবে বাস্তব জগতকে আমরা বিভিন্ন দিক থেকে দেখতে পারি, সেই জগতের একটা ব্যাখ্যা অপর ব্যাখ্যার বিরোধী হবেই এমন কোনও কথা নেই। একটা ত্রিকোণে কোণ আছে ও কর্ণযুক্ত চতুষ্কোণে ত্রিকোণ ও কোণ দুই আছে।

এই সমন্বয়েব সম্ভাবনা থাকায় আমরা এখন আবার বৈজ্ঞানিক ও ধর্মতত্ত্বেব দার্শনিকদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও অন্তর্দৃষ্টির কথায় ফিবে আসতে পাবি। তাঁরা যে শুধু একই বস্তুকে বিভিন্ন স্বার্থে, বিভিন্ন মাপকাঠি নিয়ে দেখেন তাই নয়, যা স্থির ও সত্য তার বিচারেও তাঁদের মধ্যে বিভিন্ন মনোভাবের পবিচয় পাওয়া যায়। আধুনিক বৈজ্ঞানিক তাঁর পূর্বগামীদের অন্ধ বিশ্বাসগুলি ত্যাগ করেছেন, বাস্তবের প্রকৃতি উদ্ঘাটন করার দাবি তিনি আর করেন না। বিজ্ঞানের বিষয়ের থেকে বাস্তবেব অন্তত কিছুটা তফাৎ আছে। এখন বৈজ্ঞানিক শুধু দেখতে চান, যাতে তাঁদের মৌলিক স্বীকৃত নীতি ও পরবর্তী সিদ্ধান্তের মধ্যে অমিল না হয়। আধুনিক বিজ্ঞান ব্যবহারিক ও প্রয়োগমূলক, বিরাট প্রকল্প নিয়ে সুরু করে পরে সেখানে অন্য নিশানার ব্যবহার করে। অন্যদিকে ধর্ম ও দর্শনের বৈশিষ্ট্য হল একই মূলগত বা চরম সত্যের উপর দৃষ্টি স্থির রেখে মানুষের উৎপত্তি ও নিয়তি, সাধুতা ও স্বাধীনতার প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে ঈশ্বর ও প্রকৃতির সম্বন্ধ বিষয়ের বিচারে লিপ্ত থাকা।

খৃষ্টধর্মীয় ধর্মতত্ত্ববিদেরা বিশেষত তাঁদের ধর্ম বিশ্বাসের অন্তর্গত মতবাদ-গুলির জন্য একটা সুসঙ্গত ও যথোপযুক্ত বিন্যাস রচনায় ব্যস্ত। তাঁদের মতে এই আবহাওয়ায় বেঁচে থাকার ও পূর্ণ ও বাস্তব জীবনলাভের উপকরণ পাওয়া যায়।

খৃষ্টধর্মাবলম্বী তাই মানুষের অধিকার, স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত দায়িত্ব

অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য মানবিকতাবাদের সমর্থন করেন। এই জন্যই বিংশ শতাব্দীর দীর্ঘকাল ব্যাপী সঙ্কটের সময়, যখন সভ্যতার বহু প্রাচীন ধারার বিলয়ের সম্ভাবনা দেখা গেছে, উচ্চ আদর্শ ধ্বংস হয়ে যেতে বসেছে, যখন মানব-গোষ্ঠীর একটা বিরাট অংশ আধা-মানবিক অবস্থা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে, তখন ধর্মতত্ত্ববিদ তাঁর নিজের স্বপক্ষে যুক্তি সংগ্রহের চেয়ে, যে সত্য মানুষের সহায় হতে পারে তার জন্যই কাজ করতে বেশী উৎসুক।

খৃষ্টধর্মকে প্রাণধর্মী হতে হলে বৃদ্ধিশীল হতে হবে। এর জন্য নিজের পরিচয় বজায় রেখে আধুনিক জগতের যা কিছু ভাল তাকে তা গ্রহণ করতে হবে। পশ্চিমে আমরা এখনও খৃষ্টধর্মগত সংস্কৃতির আওতায় জীবন-যাপন করছি। এমন কোন অবরোহী কারণ নেই যার জন্য আধুনিক সমাজে এই ধর্ম চিন্তাগত ঐক্য ফিরিয়ে না আনতে পারে। অন্ধকার যুগে এই দায়িত্ব তারা সাধন করেছিল, আজ শুধু তাদের আরও জটিল ও সমৃদ্ধি উপকরণ নিয়ে কাজ করতে হবে।

দার্শনিকের আর এক কাজ হল বাস্তবের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা আবিষ্কার করা, যার ভিত্তি হবে সেই নীতি যা আমাদের জ্ঞাত সমগ্র বাস্তব জগতকে নিয়ন্ত্রিত করে। এর জন্য আমাদের মনের যে আগ্রহ তা সমন্বয়ী। এই আগ্রহ জীবনে যে ঐক্যভাব আনে তার সঙ্গে চিত্রশিল্পী, লেখক ও সঙ্গীতকারের কাজের তুলনা করা যায়। অতীতে তত্ত্ববিদ্‌দের মধ্যে মত বিরোধের পরিচয় দেখেছি, এরিস্টটল ও প্লেটোর মধ্যে হেগেল ও মার্কসের মধ্যে বিভেদটা লক্ষ্য করেছি। এরিস্টটল মনে করেছিলেন বস্তু ও বস্তুরূপ, সামর্থ্য ও কার্যের মধ্যে যে পার্থক্য তিনি দেখেছিলেন তা তাঁকে বস্তু শৃঙ্খলার একটা ছবি আবিষ্কারের সাহায্য করেছে। সেই শৃঙ্খলার ধারণা জড় বস্তু থেকে স্থুরু করে বিশুদ্ধ চিন্তার জগত পর্যন্ত নিয়মের একই নিক্তি ব্যবহার অনুমোদন করবে। হেগেল বিরোধী সত্তার দ্বন্দ্বে একটা সমন্বয়ী সত্যে পৌছানর রীতি আবিষ্কার করেছিলেন। বিজ্ঞান-নির্ভর দার্শনিক কিন্তু সাধারণ বিবর্তন নীতির উপর নির্ভর করতে চান, যে নীতি থেকে শৃঙ্খলার গঠনটার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

বর্তমানে প্রচলিত কতকগুলি ধর্ম সম্বন্ধীয় ধারণা ও তার নির্ভীক প্রতীতি দেখলে মনে হয় যে একটা নূতন সমন্বয় কিম্বা পুরাতন সমন্বয়ের নূতন রূপ সৃষ্টির চেষ্টা চলেছে। এইভাবেই একমাত্র স্বর্গত পের টেইআর্দ দ্য সারদার (Pere Teilhard de Chardin) বিবর্তনবাদের সঙ্গে খৃষ্টধর্মের

যোগ-সাধনের নির্ভীক প্রচেষ্টাকে ব্যাখ্যা কবা সম্ভব। অন্যান্য আরও লেখক "মানুষের পতন" ও প্রকৃতির কথা বিবর্তনবাদের মধ্য দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু পের টেইআর্দ আরও অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। তাঁব মতে মানুষের বিবর্তন এখনও চলেছে ও খৃষ্টধর্মের নির্দেশে মহামানবের সৃষ্টি হতে চলেছে।

একদিকে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও অন্যদিকে ক্যাথলিক শ্রেণীব মাননীয় যাজক হিসাবে পের টেইআর্দ বৈজ্ঞানিক ও খৃষ্টান দুই ভাবেই কথা বলতে পারেন। তাঁর মতে দুনিয়ার গুপ্ত রহস্যের ব্যাখ্যা বিবর্তনবাদেব মধ্যে নিহিত। বিবর্তন হয়ে চলেছে "অবিরত, নিয়মিত ও সাময়িকভাবে।" তাঁর যুক্তিতে জড থেকে জৈব, জৈব থেকে মানব ও মানব থেকে মহামানব এইভাবে ক্রমোন্নয়নের ধারা বয়ে চলেছে। এ পর্যন্ত মানুষ প্রকৃতির শেষ অবদান, এবং সেই জন্য প্রকৃতি ও মানব সত্তার সত্যটিকে নিয়ে সে চিন্তা করতে পারে। মানব জাতি এক কিন্তু অপরিবর্তনীয় নয়। বিচার ক্ষমতা, চিন্তা শক্তি আছে বলে মানুষ তার চেয়েও উন্নত জীবের সৃষ্টি করতে চলেছে। এই উন্নত মানবাতীত জাতি ব্যক্তিগতভাবে ও সঙ্ঘবদ্ধভাবে বাস্তবের ছবি নিজেদের মনে প্রতিফলিত করতে পারবে। এরা সহ-চেতনাযুক্ত হবে ও প্রেমে ও সত্যে এক হবে। পের টেইআর্দের নিজের ভাষায়, "একটি মাত্র বিজ্ঞান, একটি মাত্র নীতি, একটি মাত্র আবেগ থাকবে, অর্থাৎ একটি মাত্র রহস্যের পরিচয় পাওয়া যাবে।" বর্তমান যুগে আপাতদৃষ্টিতে সব কিছুকেই অস্থির, অস্থায়ী বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এরই মধ্যে "মানুষ নূতন জীবন লাভ করতে চলেছে, প্রাকৃতিক জগতের শীর্ষে তার স্থান করে নিতে চলেছে। সমকেন্দ্রাভিমুখী বিশ্ব-সৃষ্টির প্রবাহে পড়ে, মানুষ দেশ-কালের মধ্যেই বিশ্বের সার বস্তুকে একটি কেন্দ্রে জড়ো করার ক্ষমতা লাভ করেছে।" প্রেমের ও জ্ঞানের এই বিশ্বকে কোন "এক" সত্তার মধ্যে কেন্দ্রীভূত হতেই হয়। এই "এক" সত্তাই হচ্ছে "শব্দ" যার দ্বারা ও যার মধ্যে সমস্ত কিছু সৃষ্টি হচ্ছে, সমস্ত কিছু অর্থপূর্ণ হয়ে উঠছে।

বহু দেশের বৈজ্ঞানিকেরা যে পের টেইআর্দের মতবাদ সমর্থন করেছেন তা থেকে বোঝা যায় তাঁর মতামত সাধারণের শ্রদ্ধা পেয়েছে। পের টেইআর্দের সঙ্গে অবশ্য সম্পূর্ণ একমত অল্প লোকই হবেন। ক্যাথলিক ধর্মতত্ত্ববিদেরা যেমন তাঁর যথেষ্ট সমালোচনা করেছেন, টেইয়ার্দের বিষয়-বস্তু তাঁদের কাছে অপ্রীতিকর বলে নয়, তাঁর যুক্তির ত্রুটির জন্য। আমার মনে

বিবর্তনবাদকে একটা প্রকল্প থেকে দার্শনিক তত্ত্বে উন্নীত করতে হলে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক দু'জনকে আরও কাজ করতে হবে।

ধারণাটার পের টেইআর্দের লেখায় বিবর্তনবাদের অস্পষ্টতা ধরা পড়ে। তিনি জীববিদ্যাবিদের সীমানা পার হয়ে তাঁর প্রকল্পকে মন, জড় পদার্থ ও জৈব জগতে প্রসারিত করতে চেয়েছেন। ফলে তাঁকে সামান্যতম জড পদার্থের মধ্যেও এক রকম মনের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়েছে। এ এক চরম উপায়ের অবলম্বন। একে সত্য বলে প্রমাণ করা যায় না, এর কোনও প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য নেই, সহজ বুদ্ধির এ বিরোধী। যে সব পার্থক্য নিয়ে মানুষে মানুষে ভাবের আদান-প্রদান সম্ভব হয় এই প্রকল্প তাকে অর্থহীন করে তোলে। চাঁদেব দিকে উৎক্ষিপ্ত রকেট, লেখবার টেবিল ও জানালায় জমা ধুলা সবেতেই যদি চেতনা থাকে, তাহলে চেতনা যাকে বলি তা অর্থহীন হয়ে পড়ে ও আমাদের কথাবার্তার মধ্যে কোনও সামঞ্জস্য থাকে না।

তবু বিবর্তনবাদে সঙ্গতির অভাব যাতে না ঘটে তার জন্য যতদূর সম্ভব প্রাথমিক অবস্থায় চেতনার অস্তিত্ব দেখতে হবে, না হলে ধারাবাহিকতা ছিন্ন হবে, কোন একটা জিনিসের বিবর্তন হচ্ছে এ কথা বলা যাবে না। ডারউইন সমর্থক জন টিন্‌ড্যাল বলেছেন, সূর্যের আগুনের মধ্যে তিনি প্লেটো সেক্সপিয়ার, নিউটন ও র‍্যাফেলের সম্ভাবনা দেখেছেন। অর্থাৎ জড় পদার্থ ও মনের মধ্যে তিনি একটা অবিচ্ছেদ্য ধারা দেখতে চান। যদি সব কিছুই বিবর্তনের অধীন হয়, তা হলে অসম্পূর্ণ জড ও অপরিণত জীবের মধ্যে এমন কিছু গুপ্ত ছিল যার পরে প্রকাশ ঘটেছে। অন্য দিকে জীববিদ্যাবিদ্ মন ও প্রাণশক্তির আলোচনায় নাবতে নারাজ, কেননা তাতে শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ মানতে হয়। তিনি তাঁর পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন বিদ্যার নীতিগুলি নিয়েই থাকতে চান। তাঁর মতে জীবকোষের অবিরত প্রজননের মধ্যে একটা পদার্থ বা পদার্থ সমষ্টি বরাবর আপন প্রকৃতি বজায় রাখে। কিন্তু ডিম্বের গভাধানে জীবের সৃষ্টিতেই হ'ক বা ভিন্ন বর্গের ও সুদূর পূর্ব পুরুষের থেকে ব্যক্তির উদ্ভবেই হ'ক কোন একটি জড়বস্তুর পুনরাবর্তন ঘটে না। নানারকম সংযোগের মধ্যে ইলেকট্রনের কোন পরিবর্তন না ঘটতে পারে কিন্তু সে ক্ষেত্রে ইলেকট্রনের ক্রমবর্ধনও হয় না। জীব-বীজের ছাঁচ পরীক্ষা করে দেখা গেছে বংশ পরম্পরায় কোন জড় পদার্থের অবিচ্ছেদ্য ধারা বজায় থাকে না। এই সমস্যার সামনে পড়ে জীববিদ্যাবিদেরা রূপকের আশ্রয় নেন ও বলেন, "অণুর মধ্য দিয়ে জড়ের বা প্রাণীর বৈশিষ্ট্য এক

থেকে অন্য পুরুষে সংক্রমিত হয়।" এই একইভাবে কি বলব যে জলভরা মেঘ ক্রমবর্ধনময়, কারণ সেখানেও যে জলবিন্দুর সমষ্টি সেই মেঘের সৃষ্টি করেছে তার মধ্যে অনবরত পরিবর্তন ঘটছে। এর উপর বারট্রাণ্ড রাসেলের প্রশ্ন করতে পারি, "বৃষ্টির অর্থ কি এক জলবিন্দুর অন্য জল বিদ্যুতে একটি গতি ?

এ সত্ত্বেও পের টেইআর্দ মনের আবির্ভাবে সংযোগ ও ঐক্যের যে নূতন জগত সৃষ্টি হয়েছে তার উপর জোর দিয়ে একটি মূল্যবান কথাই বলেছেন। অতীতে এক জাতি অন্য জাতি থেকে পৃথক হয়েছিল ; অপরিচিতকে শত্রুভাবে দেখা হত। তারপর কথাবার্তা, লেখালেখি ও ভ্রমণের মধ্য দিয়ে যোগাযোগের স্নরু হয়। এখন দূরত্ব ঘুচে গেছে, বিভিন্ন মানুষের ছোট ছোট জগতের বদলে এখন একই জগতে সমস্ত মানুষ জ্ঞানের বিনিময় করতে পারে। পের টেইয়ার্দ যে বলেছেন মানুষ জীবনের একটা নূতন রূপ সৃষ্টি করেছে ও একটা সহচেতনার উদ্ভব করতে চলেছে সেটা অতিরঞ্জিত কথা নয়।

পের টেইআর্দ এও বুঝেছিলেন যে ভবিষ্যতের সমস্যা হল সমাজ ও রাষ্ট্রের এবং ব্যক্তির স্বাধীনতা ও উৎকর্ষতা। মার্কসের শ্রেণীহীন সমাজের বিপরীতে পূর্ণ সচেতন ও আধ্যাত্মিক জীবন-যাপনরত মানুষের ছবি এঁকে তিনি খৃষ্টীয় ধর্মতত্ত্বের আধুনিক ধারণাটারই অনুসরণ করেছেন। এই ধারা ব্যক্তি স্বাধীনতা ও প্রেমের সমর্থক।

কয়েকজন নৃতত্ত্ববিদের কথা বিশ্বাস করতে হলে আদিম উপজাতির সভ্যেরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে ও সহচেতনার সঙ্গে চিন্তা করত ও কাজ করত। ভেড়ার দল যেমন একটা ফটকের মধ্য দিয়ে একসঙ্গে বেরিয়ে আসে তেমনই মানুষ যেন স্বপ্নাদেশে প্রতিদিনের নিয়মিত কাজগুলি করে যেত। একটা সম্পূর্ণ ও স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও চেতনার উদয় ক্রমশ ঘটতে পারে। যখন শুধু স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির বিকাশ ঘটে, তখনও মন সাধারণ ও সার্বজনীনের মধ্য দিয়ে সত্যে পৌছতে চায়। গ্রীক দর্শনেও ব্যক্তির সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না, স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির কাজটা ভাল বোঝা যায় না। গ্রীক দার্শনিকদের আগ্রহ দেখা যায় যা সার্বজনীন ও প্রয়োজনীয় তাকে নিয়ে। খৃষ্টধর্মের অভ্যুদয়ের পরে শুধু ব্যক্তির মূল্যটা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

খৃষ্টমতাবলম্বী পবিত্র এক সম্প্রদায়ের মানুষ। কিন্তু এই পবিত্র সম্প্রদায়ের প্রত্যেকটি সভ্য আরও পবিত্র। তাদের প্রত্যেককে স্বাধীন দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসাবে গণ্য করা হয় ও তাদের উপর প্রতিবেশীকে ভালবাসার নির্দেশ রয়েছে। অতএব একটা আদিম সম্প্রদায়গত সহচেতনার বদলে খৃষ্টধর্মের

আবির্ভাবের পরে ব্যক্তিগত স্বাধীন জীবনের বৈচিত্র্য ও বিপদ আমরা পেয়েছি। এর উপর, মানুষের ইতিহাসের পূর্ণ পরিণতিতে, একটা উচ্চ স্তরের সহচেতনার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। জীবনের এই নূতন রূপ মানব-জাতির ঐক্যকে সম্পূর্ণ করবে ও সেই সঙ্গে ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটাবে। এই যে ঐক্যের চিত্র তার গঠন হয়েছে ব্যক্তি-মানুষ দিয়ে ও তার মাথায় আছে খৃষ্ট।

এই ঐক্য এই জীবনে স্থরু হলেও তার পূর্ণ পরিণতি দেখা যাবে মৃত্যু পরের জীবনে। এ বিষয়ে ধর্মতত্ত্ববিদরা যা বলেন তার সঙ্গে নূতন প্রাণিবর্গের স্বষ্টির ধারণার মিল আছে। ধর্মতত্ত্ববিদের শিক্ষায় খৃষ্ট ঈশ্বর ও মানুষ দুই। অতএব তাঁর জীবনের সঙ্গে মিশতে পারলে সীমার মধ্যে ঐশী জীবনের স্বাদ গ্রহণ সম্ভব হবে।

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের ক্রমবিকাশের ধারাটার বিচার করলে পুনর্জীবন প্রাপ্তির একটা ছন্দ দেখা যায়। আর একটি জীবদেহে মাতার গর্ভে প্রথমে জ্রূণের স্বষ্টি হয়। সেই জ্রূণ জন্মলাভের জন্য কতকগুলি কাজ করে। জন্ম অন্যের জীবনের উপর আদিম নির্ভরতা থেকে মুক্তি এনে দেয় এবং স্বাধীনতার ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার প্রথম ধাপে আমাদের পৌছে দেয়। কিন্তু খাদ্য, ভাষা ও জাতির উপর একটা সামগ্রিক নির্ভরতা থেকেই যায়। যৌবন লাভের পর এই নির্ভরতা কেটে গিয়ে আমরা পুরোপুরি আত্ম-নির্ভর হয়ে পডি। বিবাহ ও সহবাসের সময় আত্মা ও শরীরের নূতন সংগ্রাম স্থরু হয় ও সং সঙ্কল্প থাকলে আত্মা ও শরীরের মধ্যে একটা সমন্বয় ঘটে, দেহ আত্মার মুক্তির সহায়তা করে ও তার পুনর্জন্মের জন্য তাকে তৈরি করে। অবশেষে এই পুনর্জন্মের অবস্থা থেকে আত্মা আর এক আত্মশক্তিতে বিকশিত হওয়ার স্বযোগ পায় ও খৃষ্টের মধ্যে একটা নূতন মানবত্বের সহচেতনা লাভ করে।

এখানে ও এখনি এই নূতন জীবনের ক্রমবিকাশ চলেছে। আমরা অন্যের ভাবনার কথা জানি, আরও জানি অন্যের ভাবনার অভিজ্ঞতাটা নিজের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে, অপরকে আপন করে তুলতে। যেখানে দুটি মনের এমন মিল ঘটে সেখানে দু'জনার স্পর্শ নয়, অসীমের ছোঁয়া পাওয়া যায়। এই অসীম আমাদের মানুষ ছাড়া করে তোলে না বরং আমাদের মনুষ্যত্বের আরও প্রসার ঘটায়। খৃষ্টান দার্শনিকদের বর্তমান চিন্তার ধাপ এই রকম। তাঁরা বুঝতে পারছেন বড় রাষ্ট্র, বৃহৎ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, জটিল যন্ত্রপাতি

ব্যক্তিগত জীবনের সম্পূর্ণ পরিণতির অন্তরায় সৃষ্টি করছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বৈজ্ঞানিকের চোখে কতকগুলি সংখ্যা, কতকগুলি পণ্যদ্রব্য ও বস্তু হয়ে উঠছে। ধর্মতত্ত্ববিদ মার্টিন বুবার ও গ্যাব্রিয়েল মার্সেল "আমি-ইহা" সম্বন্ধ ও "আমি-তুমি" সম্বন্ধের মধ্যে যে বৈষম্য দেখিয়েছেন তার পিছনে এমনই চিন্তাধারার আভাস রয়েছে। বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক, মালিক ও অর্থনীতিবিদের মানুষকে ব্যক্তি হিসাবে দেখলে চলে না। একেই বলা হয়েছে "আমি-ইহা" সম্বন্ধ। কিন্তু আমি যখন অন্যের সম্মুখীন হই, তখন তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়, এবং সাক্ষাতের মধ্যে আমি ব্যক্তি "আমি" হয়ে উঠি। মার্সেল দুটি ব্যক্তির মধ্যে প্রেমের অশেষ ক্ষমতার কথাও বলেছেন। এই প্রেমে অন্যের উপর আমার অধিকারের কথা ভাবি না, তার সঙ্গে মুক্ত চিত্তে এক হয়ে কাছাকাছি থাকতে চাই।

মার্কসের দ্বন্দ্বাত্মক জড়বাদ ও ফ্রয়েডের যৌন-ভালবাসার সঙ্গে আধ্যাত্মিক প্রেমের সমীকরণ দেখে এক সময়ে মনে হয়েছিল অতীতের সত্য প্রেমের বুঝি আর স্থান রইল না। কিন্তু সে ভয় দূর হয়েছে। ফরাসী দার্শনিক জঁা গ্যীটঁ বলেছেন যে তিনি ভেবেছিলেন প্রেমের আদর্শ ও প্রজননের উপায়—এ দুয়ের মধ্যে নিকট সম্বন্ধটা অত্যন্ত জঘন্য। জীববিদ্যাবিদেরাও প্রেমের আদর্শের কথায় কিছুটা অস্বস্তি বোধ করেন কারণ বিবর্তনবাদের সহজ ও শ্রম-পরিহারী ক্রমবিকাশের সঙ্গে এর ঠিক মিল হয় না। সহবাস ঋতু ও পর্বের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলে কত ভাল হত!

তবু মানুষের প্রেমের নানা প্রকাশকে নিবিড় করে দেখলে আধ্যাত্মিক প্রেম ও যৌন আকর্ষণের সঙ্গতিটাই ক্রমশ চোখে পড়ে। গ্যীটঁর মতে প্রেমের ওই বিভিন্ন প্রকাশ বিক্ষিপ্ত, বিশৃঙ্খল নয়, বড় ওস্তাদের সুর-সৃষ্টির মত ওই প্রকাশের অনুক্রমটি ঐক্য ও অগ্রগতির তারে বাঁধা। মনে হয় মানবজাতির কোন নিয়ন্ত্রক উপর থেকে মানুষের প্রেমের প্রকাশ ও জোড় নির্বাচনের লটারিটা নিয়ন্ত্রণ করছেন। যৌন আকর্ষণই প্রেমের সৃষ্টির ও স্থিতির নিশ্চিত উপায়। এর ফলে জাতির স্থায়িত্ব অব্যাহত হয় ও ব্যক্তিত্বের নানা বিকাশ ঘটে। প্রাণশক্তি আধ্যাত্মিক শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে। কাম প্রবৃত্তি থেকে যার সুরু তার শেষ হয় স্বর্গীয় অনুভূতির মধ্যে। যার মধ্যে পশুত্বের পরিচয় দেখা গিয়েছিল সেখানেই আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা জাগে। যাকে প্রথমে একটা দৈহিক ক্রিয়াকলাপ বলে মনে হয়েছিল তার মধ্যে এমন একটা মূল্য দেখি যা জ্ঞানের চেয়ে বড়

এই জন্যই জৈব প্রাণশক্তিকে আত্মার বিকাশের কাজে লাগান যায় এবং যারা প্রকৃতির নিয়ম মেনে চলে তাদেরই সর্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা লাভ হয়। প্রেমিকের শিল্প বলতে যা বুঝি তার সঙ্গে উচ্ছৃঙ্খল মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির অনেক তফাৎ। প্রেমের কৌশল হল যৌবনের ক্ষণস্থায়ী ভালবাসাকে স্থায়িত্ব দেওয়া, মানুষের দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা তরঙ্গে তাকে বাড়িয়ে তোলা। প্রেম জীবনের একটা পর্ব মাত্র নয়। নিয়ন্ত্রণকারী প্রেরণাময় ঐশী শক্তির মত প্রেম আমাদের প্রভাবিত করে, অপ্রত্যাশিত পূর্ণতা লাভের আশা দেয়।

পরিশেষে দুটি বিভিন্ন রূপ প্রেমের দর্শনের কথা ওঠে, যে প্রেম সমগ্র জীবন, অনন্ত জীবন ও কাল, স্বর্গ ও নরক, সব কিছুকেই নিয়ন্ত্রিত করে। সেণ্ট অগাষ্টিন এই দুই প্রেমের কথা বলেছেন যা দুটি জগতের সৃষ্টি করেছে, এক ঈশ্বরের জগত ও অপরটি অসংস্কৃত মানুষের জগত। এই দুই প্রেমের মধ্যেই যৌন প্রেম ও ব্যক্তিগত প্রেমের চরম বিকাশের পরিচয় পাওয়া যাবে। সেই সঙ্গে এই প্রেমের মধ্য দিয়ে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের মহৎ আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ধর্ম প্রেমের মিলন ঘটান যেতে পারে। এই মতে দুটি বিভিন্ন রূপ প্রেম আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। ধর্মতত্ত্বের ভাষায় একটিকে বলা হয় "রতি" ( Agape ) ও দ্বিতীয়টিকে বলা হয় "মদন" ( Eros )। মনস্তত্ত্বের ভাষায় একে সকলের জীবনের "নারী" ও "পুরুষ" উপকরণ বলা হয়। "মদন" দাবি করে, আধিপত্য চায়, তার লক্ষ্য আত্ম-উপলব্ধি, তার বিশেষ গুণ মর্যাদাবোধ, স্বাধীন মনোভাব ও আত্ম-সম্মানবোধ। "রতি" নম্র ও পরবশ। গোষ্ঠীগত ভাবাবেগে, ধর্ম বিশ্বাসের উল্লাসে, মৃত্যু ও আঁধারের আনুগত্যে ও প্রেমের জন্য আত্মাহুতির মধ্যে সে নিজেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে, সেখানে বিচার-বুদ্ধি ও সম্ভ্রম-সঙ্গতির বাধাকে স্বীকার করে না।

সাধারণ জীবনের এ প্রেম টানা-পড়েন, জোয়ার-ভাটা। এর অন্ধকার দিক আছে কিন্তু আবার সাম্যের দিকও আছে। দুটি আত্মার প্রেম দেওয়া-নেওয়ার মধ্যে এর কোমল প্রকাশ দেখি। কিন্তু মানুষ সর্বাঙ্গসুন্দর হতে পারে না। তার আসা-যাওয়া আছে, অন্তরতম প্রদেশে একটি নিঃসঙ্গতা আছে যাকে ভেদ করা যায় না। এই অসম্পূর্ণতাই একটা বড় পূর্ণতার ইঙ্গিত দেয়, এমন প্রেমের আভাস দেয় যাতে ভুল বোঝাবুঝির স্থান নেই, সেখানে একে অন্যের জীবনের মধ্যে বেঁচে থাকে। এই অবস্থাটাই চরম "রতির" অবস্থা। কিন্তু এই ঐশী "রতি" প্রতিমা বা ছায়া নয়। তা হল আকাশের রামধনু ও হৃদয়ের সূর্য-রশ্মি।

# আয়েনস্টাইনের মহান মানস চিত্র

**জেমস, আর, নিউম্যান**

জেমস্, আর, নিউম্যান আইন ও গণিতের ক্ষেত্রে সমান স্থনাম অর্জন করেছেন। গাণিতিক হিসাবে তিনি এলের ( Yale ) আইন স্কুলে শিক্ষকতা করেন, বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় আইন তৈরির ব্যাপারে তিনি হোয়াইট হাউসের উপদেষ্টার কাজ করেন ও আণবিক শক্তি বিষয়ে সেনেটের বিশেষ সমিতিতে তিনি আইনজ্ঞ হিসাবে নিযুক্ত হন। তাঁর বইগুলির মধ্যে একটি, "গণিত ও কল্পনা" ( Mathematics and Imagination ), এডওয়ার্ড কাসনারের সঙ্গে লেখা। সাম্প্রতিক বিরাট কাজ তাঁর চার খণ্ডে প্রকাশিত, "গণিতের জগত" ( World of Mathematics )। এখন তিনি মাইকেল ফ্যারাডের একটি জীবনী লিখছেন।

To the eyes of the man of imagination,
Nature is imagniation itself.

—উইলিয়াম ব্লেক

চার বছর হল আয়েনস্টাইন মারা গেছেন। তার পঞ্চাশ বছর আগে, যখন তার বয়স ছাব্বিশ, তিনি তাঁর একটি ধারণার কথা প্রকাশ করেন যাতে জগতের রূপটা আমাদের চোখে বদলে যায়, যার ফল আমাদের সমাজকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়ে যায়। সতেরো শতকে বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ের পর একমাত্র নিউটন ও ডারউইন ছাড়া চিন্তার জগতে এত বড় আলোড়ন জাগাতে আর কেউ পারেন নি।

সকলেই জানি আয়েনস্টাইন একটা বড কিছু করেছিলেন। কিন্তু সেটা কি? শিক্ষিত নর-নারীর মধ্যেও অনেকেই এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন না। আয়েনস্টাইনের সিদ্ধান্তের গুরুত্বটা আমরা বুঝি কিন্তু তার ধারণাটা স্পষ্ট হয় না। আধুনিক বিজ্ঞানের সাধারণ জীবন থেকে বিচ্ছেদের জন্য এই অবস্থা প্রধানত দায়ী। সাধারণের পক্ষে ও বিজ্ঞানের পক্ষেও এটা শুভ সূচনা নয়। আয়েনস্টাইনকে না বোঝায় শুধু আমাদের কৌতূহলটাই

যে চরিতার্থ হচ্ছে না তাই নয়, আমাদের আরও বড় কিছু লোকসান হচ্ছে।

আপেক্ষিকতাবাদের ধারণাটা দুরূহ, গণিত-জর্জর। সাধারণের উপযোগী এর অনেকগুলি ব্যাখ্যার মধ্যে কয়েকটি যে ভাল নেই তা নয় কিন্তু তা আমাদের বেশীদূর নিয়ে যেতে পারবে বলে আশা করাটা ভুল। পাল্কি-শায়িত রাজপুত্রের মত এক্ষেত্রে অন্যের কাঁধে চেপে চলার উপায় নেই, আপেক্ষিকতাবাদকে বুঝতে হলে নিজের চেষ্টার দরকার। কিন্তু তবু এই তত্ত্ব তার আগের সিদ্ধান্তগুলি থেকে অনেক হিসাবে সহজ। এর মধ্য থেকে পার্থিব জগতের যে ছবি পাই তাকে পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করার সম্ভাবনাটা বেশী। এখানে দেশ ও কালের একটা সাড়ম্বর বিরাট পরিকল্পনার ফলে তার একটা প্রয়োগ উপযোগী নক্সা পাই। নিউটনের বিশ্বরূপের ব্যাখ্যা ছিল ঈশ্বরের যোগ্য, আয়েনস্টাইনের পরিকল্পনা আমাদের মত ক্ষীণদৃষ্টি ও সীমাবদ্ধ বুদ্ধি মানুষের জন্য।

কিন্তু আপেক্ষিকতাবাদ সম্পূর্ণ নূতন জিনিস। একে বুঝতে হলে আমাদের অনেকগুলি বদ্ধমূল ধারণা বদলাতে হবে, সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিক দৃষ্টি ত্যাগ করতে হবে। যেসব প্রতীতি বহুদিন ধরে স্বীকৃতি পাওয়ার ফলে প্রায় সহজ বুদ্ধিগত হয়ে উঠেছে সেগুলিকে আমাদের ছাড়িয়ে ওঠা দরকার ও সেই সঙ্গে জগতের যে ছবি মাথার উপরের তারার মত আমাদের কাছে স্বাভাবিক ও প্রত্যক্ষ তাকে ভুলতে হবে। আয়েনস্টাইনের ধারণাগুলি ক্রমশ হয়তো আমাদের কাছে সহজ হয়ে উঠবে, কিন্তু এ যুগে পুরাতনকে ত্যাগ করে তার জায়গায় নূতনকে স্থাপন করার কঠিন কর্তব্যটা আমাদের উপর এসে পড়েছে। বিংশ শতাব্দীব এই পৃথিবীকে বুঝতে হলে এই কর্তব্য আমাদের পালন করতে হবে।

১৯০৫ সালে সুইজারল্যাণ্ডের সরকারি দপ্তরে সনদ পরীক্ষকের কাজ করতে করতে আয়েনস্টাইন "Annalen der Physik" নামে একটি পত্রিকায় "গতিশীল বস্তুর তড়িৎ গতি" সম্বন্ধ একটি তিরিশ পাতা ব্যাপী প্রবন্ধ লেখেন। এর মধ্যে জগতের একটা কল্পনাগত ছবি ফুটে উঠেছিল। রূপদর্শনের অধিকার শুধু কবি ও ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টার নেই। বৈজ্ঞানিক এবং বিশেষ করে অল্পবয়স্ক বৈজ্ঞানিক, মাঝে মাঝে সুদূর গগনে পর্বতচূড়ার হঠাৎ যে প্রকাশ দেখেন তা আর কারও চোখে পড়ে না। এ দৃশ্য আর তাঁর চোখে না পড়তে পারে, কিন্তু ওই এক লহমার দর্শন জগতের ছবিটা আমাদের কাছে বদলে দেয়।

ওই এক ঝলক আলোকই যথেষ্ট, বাকি জীবন সেই বৈজ্ঞানিক এক পলকের দেখা ওই দৃশ্যের বর্ণনায়, ব্যাখ্যায় কাটিয়ে দিতে পারেন, পরবর্তী অন্বেষকের কাছে নবদিগন্তের দিক নির্দেশ করতে পারেন।

আপেক্ষিকতাবাদের মূল প্রশ্নটা আলোর গতি সম্বন্ধে। উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবেই প্রশ্নটা প্রথম আয়েনস্টাইনের মনে জাগে। তিনি চিন্তা করতে সুরু করেন যে যদি কোন লোক আলোর গতিতে চলতে পারে তাহলে বিশ্বের ছবিটা তার চোখে কেমন লাগবে। ধরা যাক্ সে একটা আলোর রেখার উপর চড়ে সামনে একটা আরশি ধরে আলোর গতিবেগে এগিয়ে চলেছে। তাহলে ভূতের মত তারও কোনও ছায়া দেখা যাবে না। কারণ আলোক ও আরশি একই গতিতে একই দিকে চলার ফলে ও আরশিটা সামান্য এগিয়ে থাকার জন্য, আলোব বেখা আরশির উপর গিয়ে পড়তে পারবে না ও তাতে প্রতিবিম্ব জাগবে না।

কিন্তু এটা শুধু আরোহণকারীর পক্ষে সত্য। একজন স্থির হয়ে থাকা দর্শকের কথা ধরা যাক। তারও হাতে একটি আরশি আছে যাতে সে রশ্মি-বিম্ব-আরোহীকে এক লহমায় পার হয়ে যেতে দেখবে। এই স্থির দর্শকের হাতের আয়নায় আরোহীর ছায়া এসে পড়বে। অর্থাৎ এই যে দেখার ব্যাপার সেটা নিতান্তই আপেক্ষিক। দর্শকের চোখে তা ধরা পড়ে, আরোহীর কাছে পড়ে না। চোখে দেখা দৃশ্য সম্বন্ধে যে তত্ত্ব আমরা এতদিন স্বীকার করে এসেছি এই বিভ্রান্তিকর ধাঁধা তার বিরোধী। এর কারণটার অনুসন্ধান করতে হবে।

পদার্থ বিজ্ঞানবিদ ও জ্যোতিষবৈজ্ঞানিক বহুদিন ধরে আলোর গতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করছেন। সতেরো শতকে ডেনমার্কের জ্যোতিষী রোমার ( Romer ) প্রমাণ করেন এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় পৌছতে আলোর একটা নির্দিষ্ট সময় লাগে। এর পর আলোর গতিবেগের নির্ভুল পরিমাপ ক্রমশ সম্ভব হয়েছে ও উনিশ শতকের শেষের স্বীকৃত মত হল আলোর রেখা শূন্যস্থলে মিনিটে ১৮৬,০০০ মাইলের নির্দিষ্ট অপরিবর্তনীয় গতিবেগে চলে।

কিন্তু এখন একটা নূতন সমস্যার উদ্ভব হল। গ্যালিলিও ও নিউটনের বলবিদ্যায় নিশ্চল অবস্থা ও সমগতি অর্থাৎ অপরিবর্তনীয় গতিবেগের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। "ক" ও "খ" এই দুই বস্তুর মধ্যে একটি অন্যটির তুলনায় গতিশীল। ট্রেনটা প্ল্যাটফর্ম পার হয়ে চলে যায় নয় প্ল্যাটফর্মটা ট্রেনটা

পার হয়ে যায়। পৃথিবী স্থির তারার দিকে এগিয়ে যায় নয় তারাই পৃথিবীর দিকে এগিয়ে আসে। এর মধ্যে কোনটা সত্য তা বলা সম্ভব নয়। এবং বলবিত্থার ক্ষেত্রে যেটাই সত্য হ'ক তাতে কিছু আসে যায় না।

এখন প্রশ্ন হল গতির দিক থেকে আলোক কি সাধারণ জড়বস্তুর সমান; আলোর গতিও কি নিউটনের ধারণাগত অর্থে আপেক্ষিক, না তা পরম গতি?

আলোক-তরঙ্গ তত্ত্বে এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেছে বলে মনে হয়। তরঙ্গ কোন একটি মাধ্যমে অগ্রগামী গতি; শব্দ-তরঙ্গ যেমন বায়ুকণার গতি। সর্বব্যাপী ঈথরকে আলোক-তরঙ্গের মাধ্যম বলা হয়েছে। আমাদের ধারণায় ঈথর হল অদ্ভুত গুণ সম্পন্ন একটা সূক্ষ্ম জেলি, যার রঙ নেই, গন্ধ নেই, ও এমন কিছু বৈশিষ্ট্য নেই যা দিয়ে তাকে চেনা যায়। ঈথর সমস্ত জড় পদার্থের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে ও আলোর রেখায় কাঁপতে থাকে। এছাড়া ঈথর সমগ্রভাবে স্থির, নিশ্চল। পদার্থ বৈজ্ঞানিকের কাছে ঈথরের এই গুণটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সম্পূর্ণ নিশ্চল হওয়ায় ঈথরে আলোকের গতি নির্ধারণ করার একটা অনুপম পরিবেশ পাওয়া যায়। বস্তুর পরম গতি বার করা অসম্ভব কারণ তার এমন কোন নিশ্চল পরিবেশ নেই যার তুলনায় পরম গতির পরিমাপ করা চলে। কিন্তু আলোকের ক্ষেত্রে ওই পরিমাপের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। এই পরিমাপের জন্য যেটা প্রয়োজন ঈথর তা মেটাচ্ছে।

কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব হল না। ঈথরের অদ্ভুত গুণই তাকে পরীক্ষণকারীর কাছে দুঃস্বপ্নের জিনিস করে তুলল। যে বস্তু বস্তুই নয়, "একটোপ্লাজামের" মত একটা সত্তাহীন জিনিস, একটা চিন্তা মাত্র, তাকে নিয়ে ব্যবহারিক পরীক্ষা চলে কি করে? অবশেষে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে দু'জন মার্কিন পদার্থবিদ, এ, এ, মাইকেলসন ও ই, ডাবলু, মরলি ইনটার-ফেরোমিটার (Interferometer) নামে একটা নিখুঁত সুন্দর যন্ত্র তৈরি করলেন যাতে আলোক ও কল্পিত ঈথরের সম্বন্ধ নির্ণয়ের একটা উপায় বার করা সম্ভব হবে বলে তাঁরা ভেবেছিলেন। যদি পৃথিবী ঈথরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয় তাহলে যে আলোক-রেখা পৃথিবীর গতির দিকে যাচ্ছে তার গতিবেগ উল্টো পথে যাওয়া আলোর গতিবেগের চেয়ে বেশী হওয়া উচিত। এছাড়া নদীর স্রোতের সঙ্গে ভেসে গিয়ে ফিরে আসতে যতটা সময় লাগে তার চেয়ে নদীর এপার-ওপার করতে সময় কম লাগে। সেই হিসাবে

ঈথরে আলোর রেখা যদি একই পথ ধরে চলে তবে গতিবেগ লম্বালম্বি পথে উপর-নিচের পথের গতিবেগের চেয়ে বেশী হবে।

মাইকেলসন-মরলির পরীক্ষণের পিছনে এই যুক্তি ছিল। তাঁরা অনেকগুলি পরীক্ষণের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর গতির অভিমুখী আলোক-স্তম্ভের গতিবেগের তুলনা করে দেখেন। তাঁদের যুক্তিতে এই দুটি গতিবেগ বিভিন্ন হওয়া উচিত ছিল না। কিন্তু এই পার্থক্যটা পরীক্ষায় ধরা পড়ল না। ভিন্নাভিমুখী আলোর গতিবেগ দেখা গেল সমান। পৃথিবী তার আপন গতির দিকে ঈথরকে টানে এই ধারণা অপ্রমাণিত হওয়ায়, আমাদের সমস্যাটার কোন সমাধান শেষ পর্যন্ত দেখা গেল না। হয়তো সত্যই গতিবেগের কোনও পার্থক্য নেই, হয়তো ঈথরের অস্তিত্বই নেই। মাইকেলসন-মরলির পরীক্ষণের ফল একটা মস্ত ধাঁধার সৃষ্টি করেছে।

অনেকে অনেক সমাধানের চেষ্টা করেছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে কল্পনা-সমৃদ্ধ ও আপাতদৃষ্টি অসম্ভব সমাধানের কথা বলেছেন আয়ারল্যাণ্ডের পদার্থবিদ জি, এফ, ফিটজিরাল্ড। তিনি বলেন, যেহেতু পদার্থের মূল সত্তা তড়িৎ-গঠিত ও তড়িৎ শক্তিই তাকে এক করে রাখে, ঈথরের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় নিজের গতির দিকে পদার্থ সঙ্কুচিত হতে পারে, এই সঙ্কোচনেব মাপটা হবে সামান্য কিন্তু তাইতেই গতির অভিমুখে দৈর্ঘ্যের পরিমাপ কমে যাবে। এই ধারণার মধ্যে মাইকেলসন-মরলির পরীক্ষার ফলের ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। পৃথিবীর আবর্তনের সময় ইনটারফেরোমিটারের হাত দুটির সঙ্কোচন ঘটে। ফলে দৈর্ঘ্য পরিমাপের এককটা ছোট হয়ে যাবে ও পৃথিবীর আবর্তনে আলোকের গতিবেগ যেটুকু বাড়ে তা বোঝা যাবে না। পৃথিবীর গতির দিকে আলোকের যে গতিবেগ ও তার সমকোণী রেখায় যে গতিবেগ এইজন্যই এক মনে হয়। ওলন্দাজ পদার্থবিদ এইচ, এ, লোরেন্‌ৎস ( H. A. Lorentz ) ফিটজিরাল্ডের ভাবনা ধারাটাকে আরও বিশদ করে তোলেন। ফিটজিরাল্ডের তত্ত্বটাকেই তিনি গাণিতিকরূপে প্রকাশ করেন ও গতির জন্য যে সঙ্কোচন তার সঙ্গে আলোর গতিবেগের সম্বন্ধটা তিনি নির্ণয় করে দিতে চান। তাঁর অঙ্কের ফলে দেখা গেল মাইকেলসন-মরলির পরীক্ষণে যে স্ববিরোধী তথ্য উপস্থিত হয়েছিল তার ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়েছে। আয়েনস্টাইনের আগে পর্যন্ত বিষয়টির উপর এখানেই যবনিকাপাত হয়েছিল।

আয়েনস্টাইন মাইকেলসন-মরলির তথ্যের কথা জানতেন। সমসাময়িক

জগতের চিত্রে অন্য ত্রুটিগুলিও তাঁর অজানা ছিল না। একটা ত্রুটি বুধগ্রহের আপন কক্ষপথে ঘোরার মধ্যে একটা সামান্য কিন্তু নিয়মিত সময়ের বৈষম্য। দেখা গিয়েছিল যে বুধগ্রহ একশ' বছরে তার বৃত্তরেখার তেতাল্লিশ সেকেণ্ড মাপের চাপ ( Arc ) হারায়। এই সময়ের গরমিলটা সামান্য কিন্তু নিউটনের তত্ত্ব মত এই সামান্যতম গরমিলটাও ঘটা উচিত ছিল না। আর একটি বৈষম্য দেখা যায় ইলেকট্রনের আচরণে। ডাবলু কফ্‌ম্যান ( W. Kaufmann ) ও জে, জে, টমসনের ( J. J. Thomson ) পরীক্ষায় দেখা যায় যে ইলেকট্রনের গতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার ভারটাও বেড়ে যায়। প্রশ্ন হচ্ছে প্রাচীন তত্ত্বগুলি শোধন করে এই বৈষম্যগুলির ব্যাখ্যা সম্ভব হবে না আবার কোপারনিকাসের তত্ত্বের মত চিন্তার জগতে আর একটি বিপ্লবের প্রয়োজন হবে।

আয়েনস্টাইন এরই মধ্যে নিজের পথটুকু তৈরি করে গতিবেগ সমস্যার আর একটি দিকে নজর দিলেন। গতিবেগের পরিমাপের সঙ্গে সময়ের পরিমাপের সম্বন্ধ রয়েছে। অন্যদিকে আয়েনস্টাইন দেখলেন যে সময়ের পরিমাপের সঙ্গে যুগপৎ ঘটনার ধারণাটা জড়িত। এই ধারণাটা কি সহজ ও স্বচ্ছ? অন্য কারও এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল না কিন্তু আয়েনস্টাইন প্রমাণ দাবি করলেন।

সকালে যখন আমি পড়ার ঘরে ঢুকি তখন দেওয়াল ঘড়িতে ঘণ্টা বাজতে সুরু করে। আমার ঘরে ঢোকা ও ঘড়ির ঘণ্টা বাজা যুগপৎ কাজ সন্দেহ নেই। কিন্তু ধরা যাক ঘরে ঢোকার সঙ্গে আমি আধ মাইল দূরের টাউন-হলের ঘড়ির প্রথম ঘণ্টাটা শুনতে পেলাম। ওই শব্দ তরঙ্গ আমার কানের কাছে এসে পৌছতে সময় লেগেছে। অতএব ঘরে ঢুকেই আমি ঘড়ির ঘণ্টা শুনলেও, ঘণ্টা বাজার কাজটা ও আমার ঘরে ঢোকার কাজটা এখানে যুগপৎ ঘটছে না।

আর একরকম সঙ্কেতের কথা ধরা যাক। দূরের একটি তারার আমি আলো দেখছি। জ্যোতির্বিদ জানাচ্ছেন তারার যে রূপটা আমি দেখছি সেটা আজকের নয়, ব্রুটাস যে বছরে সিজারকে হত্যা করেন সেইদিনের তারার রূপটা আমরা দেখছি। এখানে যুগপত্তার অর্থ কি? আমার "এখানে এখন" ধারণার সঙ্গে তারাটির "সেখানে তখন" ধারণার মধ্যে কি কোন যোগ আছে। যেদিন জোয়ান অফ আর্ককে পুড়িয়ে মারা হয় সেদিনের তারার কথাটা দশ পুরুষ পরে যখন তার আলো আমাদের কাছে এসে পৌচচ্ছে

তখন বলে কি কিছু লাভ হচ্ছে ? সে তারার আলো তো আমাদের কাছে না পৌঁছতেও পারত। যুগপত্তার ধারণা একটি স্থানের পক্ষে যেমন বিভিন্ন স্থানের পক্ষে কি ঠিক তেমনই ?

তা যে নয় আয়েনস্টাইন অবিলম্বে বুঝতে পারলেন। যুগপত্তার ধারণা সঙ্কেতের উপর নির্ভর করে। অতএব আলোর গতি কিম্বা অন্য সঙ্কেতের এখানে প্রশ্ন ওঠে। ঘটনাব স্থানগত প্রভেদই যে শুধু সময়ের যুগপত্তার ধারণাকে অস্পষ্ট করে তুলেছে তাই নয়, আপেক্ষিক গতিও যুগপতের প্রশ্নটাকে জটিল করেছে। একজন দর্শক দুটি ঘটনা যুগপৎ ঘটছে বলে দেখছেন। কিন্তু আর একজন দর্শক যিনি প্রথম দর্শকের তুলনায় গতিশীল তিনি ওই দুটি ঘটনাকেই বিভিন্ন সময়ে ঘটতে দেখতে পারেন। আপেক্ষিকতাবাদের নিজস্ব সহজ ব্যাখ্যায় ( পরের পাতা দেখুন ) আয়েনস্টাইন একটি অকাট্য ও সহজ উদাহরণ দিয়েছেন। এই উদাহরণ থেকে বোঝা যায় যে সময়ের পরিমাপ দর্শক-নিভর। একটি দর্শকের কাছে সময়েব যে পরিমাপ সত্য অন্য দর্শকের কাছে তা নাও হতে পারে। এই পরিমাপ কিছুতেই এক হবে না যদি এক পরিবেশেব পরিমাপকে তার তুলনায় গতিশীল অন্য পরিবেশে আরোপ করা হয়।

এই তথ্যগুলির ধারণা আয়েনস্টাইনের কাছে স্পষ্ট হল। আলোর গতিবেগের পরিমাপে সময়ের পরিমাপের প্রয়োজন। সময়ের পরিমাপে যুগপত্তার প্রশ্ন আসে। কিন্তু যুগপত্তার ধারণা সকল দর্শকের কাছে সমান নয়। দর্শকের আপেক্ষিক গতির উপর যুগপতের বিচার নিভর করে।

কিন্তু চিন্তা ও যুক্তি ধারার এইখানে শেষ নয়। আর একটি অনুমিতিব ইঙ্গিত পাওযা যায়। মনে হয় দূরত্বের পরিমাপেও যুগপতের প্রশ্নটা এসে পড়ে। একটা চলন্ত ট্রেনের যাত্রী তার কামরার দৈর্ঘ্যের পরিমাপ সহজেই করতে পারে। একটা ফিতার সাহায্যে তার বাড়ির ঘরের দৈর্ঘ্যটা সে যেভাবে মাপতে পারত চলন্ত ট্রেনে তার কামরার দৈর্ঘ্যটাও সে তেমনভাবে সহজেই মাপতে পারে। কিন্তু একটি নিশ্চল দর্শকের পক্ষে ওই চলন্ত ট্রেনের দৈর্ঘ্যের পরিমাপ করাটা সুসাধ্য নয়। ট্রেনটা সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে। অতএব ফিতা দিয়ে মাপবার উপায় নেই। তাকে আলোর সঙ্কেত ব্যবহার করতে হবে যার থেকে তাকে দেখতে হবে কখন ট্রেনের প্রান্ত বিন্দু দুটি দুটি কল্পিত বিন্দুর সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। অর্থাৎ এর মধ্যে সময়ের বিচার এসে পড়বে। ধরা যাক অত্যন্ত দ্রুতগতি যুক্ত ইলেকট্রনের পরিমাপ করতে

হবে। এই পরিমাপে আলোর সঙ্কেতের ব্যবহার দরকার হবে ও যুগপৎ ঘটনার বিচার করতে হবে। এ ক্ষেত্রেও যারা ইলেকট্রনটিকে দেখছে তাদের আপেক্ষিক গতিশীলতা তাদের পরিমাপের ফলটির মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করবে। বাস্তব সম্বন্ধে আমাদের যে সহজ ধারণা তা ক্রমশই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে; দেশ-কাল সম্বন্ধে যে ধারণা করে এসেছি সেটা ঠিক নয়।
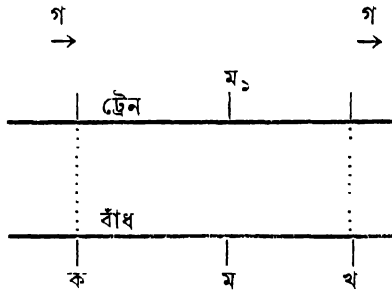
সময়ের আপেক্ষিকতা সম্বন্ধে আয়েনস্টাইনের নিজের দৃষ্টান্ত

উপরের রেখাচিত্রে একটা দীর্ঘ ট্রেন 'গ' গতিবেগে বাঁ দিক থেকে ডান দিকে চলেছে। নিচের রেখাটি একটি বাঁধ যেটা রেলপথের সমান্তরাল। 'ক' ও 'খ' রেলপথের উপর ছুটি স্থান ও 'ম' বাঁধের উপর 'ক' ও 'খ' এর মাঝামাঝি একটি বিন্দু। 'ম' বিন্দুতে একজন দর্শক ছুটি আরশি হাতে দাঁড়িয়ে আছে। আরশি ছুটি ইংরাজী 'V' অক্ষরের মত যুক্ত ও একটি ৯০° কোণের সৃষ্টি করেছে। এইভাবে দর্শক 'ক' ও 'খ' এ ছুটি জায়গাকেই একসঙ্গে দেখতে পারে। 'ক' ও 'খ' এ ছুটি ঘটনার কথা কল্পনা করা যাক, যেমন ছুটি বিদ্যুৎ চমক যা 'ম' এ অবস্থিত দর্শকের আরশিতে একই সঙ্গে ধরা পড়ল। দর্শকেব ধারণায় এ ছুটি ঘটনা যুগপৎ ঘটেছে। অর্থাৎ বিদ্যুৎ চমকের ছুটি আলোর রেখা 'ক' ও 'খ' থেকে বেরিয়ে বাঁধের মাঝের 'ম' বিন্দুতে এসে মিশেছে। এইবার একটি চলন্ত ট্রেনের কথা ধরা যাক যাতে একজন যাত্রী রয়েছে। ট্রেনটা যাবার পথে 'ম১' বিন্দুতে এসে পৌছবে যে 'ম১' বিন্দু 'ম' বিন্দুর ঠিক বিপরীতে রেলপথের উপর অবস্থিত। অর্থাৎ 'ম১' বিন্দু 'ক' 'খ' রেখার মধ্যস্থিত। এখন ধরা যাক ট্রেন-যাত্রী 'ম১' বিন্দুতে যে সময় পৌচচ্ছে ঠিক সেই সময় বিদ্যুৎ চমক ছুটি জেগেছে। 'ম' এ অবস্থিত দর্শক সঠিক বলেছেন যে বিদ্যুৎ চমক ছুটি একই সঙ্গে ঘটেছে। 'ম'১ স্থিত ট্রেন-যাত্রী কি সেই

একই কথা বলবেন? তিনি যে সে কথা স্বীকার করবেন না তা সহজেই বোঝা যায়। 'ম১' বিন্দুটা যদি 'ম' বিন্দুর মত গতিহীন হত তাহলে ট্রেন-যাত্রীটিও বিদ্যুৎ চমক একই সঙ্গে দেখতে পেতেন। কিন্তু 'ম১' স্থির নয় তা 'গ' গতিবেগে ডান দিকে এগিয়ে চলেছে। অতএব বাঁধের সম্পর্কটা মনে রেখে ট্রেন-যাত্রী 'খ' থেকে যে বিদ্যুতের আলোর রেখা আসছে তার দিকে এগিয়ে চলেছে ও 'ক' থেকে যে রেখা আসছে তার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। ট্রেন-যাত্রীর চোখে তাই 'খ' এর বিদ্যুৎ চমক আগে চোখে পড়বে ও তার কাছে 'খ' এর ঘটনা 'ক' এর ঘটনার আগে ঘটেছে বলে মনে হবে।

কার ধারণাটা সত্য, দর্শকের না যাত্রীর? নিজের নিজের পরিবেশে দু'জনকার ধারণাকেই সত্য বলা চলে। বাঁধের সম্পর্কে দর্শকের উক্তিটাই ঠিক, আর চলন্ত ট্রেনের সম্পর্কে যাত্রীর ধারণাটাও নির্ভুল। দর্শক বলতে পারেন যে তাঁর ধারণাটাই ঠিক কারণ তিনি স্থির হয়ে আছেন আর যাত্রী গতিশীল অবস্থায় থাকায় তাঁর দৃষ্টির বিকৃতি ঘটেছে। অন্যদিকে যাত্রী বলতে পারেন গতি সঙ্কেতকে বিকৃত করে না। তাছাড়া, যাত্রী গতিশীল ও দর্শক স্থির হয়ে আছেন বলার যতটুকু কারণ দর্শক গতিশীল ও যাত্রী স্থির হয়ে আছেন বলার যুক্তিটাও তেমনই।

এই দুটি ধারণার একটাকে সত্য বলে মেনে নেওয়ার যথেষ্ট কারণ নেই। দুটি মতের শুধু মিলন ঘটতে পারে যদি এই নীতি মেনে নিই যে কেবলমাত্র পরিবেশ অনুযায়ী যুগপৎ ঘটনার অর্থ ধরা পড়ে, ধরে নিই যে প্রত্যেক পরিবেশের নিজস্ব বিশিষ্ট সময় আছে। এবং আয়েনস্টাইনের ভাষায় সময়ের কথায় যদি বিশেস পরিবেশকে যুক্ত করতে না পারি তাহলে শুধু সময়ের বিচারেব কোন অর্থ হয় না।

যুগপৎ ঘটনার ধারণাটাকে স্পষ্ট করে তুলতে আয়েনস্টাইনকে আইজাক নিউটনের দুটি সনাতন সত্য অনুমানের বিরোধিতা করতে হয়েছিল। নিউটনের সুবিখ্যাত বই, Principia Mathematicaয় সময়ের সুন্দর সংজ্ঞা উপস্থিত করা হয়েছে, "পরম, সত্য ও গণিতসম্মত কাল বাহিরের কোন কিছুর সঙ্গে সম্পর্কহীনভাবে নিজের থেকে, আপন প্রকৃতি অনুযায়ী প্রবাহিত হয়।" এরই সঙ্গে আর এক বিরাট কল্পনার কথা তিনি বলেছিলেন। "পরম শূন্য দেশ বাহিরের কোন কিছুর সঙ্গে সম্পর্কহীনভাবে আপন প্রকৃতিতে

এক ও অচল থাকে।" আয়েনস্টাইন দেখলেন এই সংজ্ঞাগত কল্পনাগুলি বিরাট হলেও প্রমাণ সাপেক্ষ নয়। আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের অমীমাংসিত রহস্যের গোড়ায় রয়েছে এই প্রমাণহীন অনুমান। এই অনুমানগুলিকে আমাদেব ছাড়তে হবে। পরম দেশ-কালের ধারণা জীর্ণ আধ্যাত্ম-বিদ্যার অন্তর্গত। পরীক্ষার মধ্য দিয়ে তার সমর্থন খুঁজে পাওয়া যায় না, অপ্রীতিকর বাস্তব তাকে অস্বীকার করে। পদার্থ-বিজ্ঞানকে এই সত্যকে মেনে নিতে হবে।

এই মানার অর্থ মাইকেলসন-মরলির পরীক্ষায় স্ববিরোধী তথ্যটাকে স্বীকার করা, পদার্থ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাকে গ্রাহ্য করা। সহজ বুদ্ধির দিক থেকে মাইকেলসন-মরলির পরীক্ষার ফলটাকে অসম্ভব বলে মনে হবে, কিন্তু তবু তা প্রমাণিত। বিজ্ঞানকে এই প্রথম সহজ বুদ্ধিকে অস্বীকার করতে হয়নি। আলোর উৎসের সঙ্গে সম্পর্কে কোন দর্শক গতিশীলই হন বা স্থিতিশীলই হন তার কাছে আলোর গতিবেগ যে সমান তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। আয়েনস্টাইন এই তথ্যটির উপর ভিত্তি করে বস্তুর গতি ও আলোর সঞ্চারণের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার নীতি বার করেছিলেন। এই নীতি বা আয়েনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের বিশেষ তত্ত্বের প্রথম উপপাদ্য হল, দর্শকের গতিশীলতা ও আলোর উৎস—নির্বিশেষে দেশ মধ্যস্থ আলোর গতিবেগ, প্রকৃতির একটি ধ্রুবরাশি ( Constant )।

এরপর আর ঈথরের অস্তিত্ব কল্পনা করার প্রয়োজন হল না। আলোর গতিবেগ যে পরিবেশেই মাপা যাক তার ফলটা একই হবে, অতএব একটা কল্পিত পরিবেশের প্রয়োজন নেই, ঈথর রূপ একটা জেলির কল্পনাটাও নিষ্প্রয়োজন।

আর একটি উপপাদ্যের আবশ্যকতা দেখা দিল। নিউটনের আপেক্ষিকতাবাদ জড়-পদার্থের গতি সম্বন্ধে প্রযোজ্য। কিন্তু আগেই দেখেছি আলোর তরঙ্গ এই নীতির অন্তর্গত নয়। আয়েনস্টাইন এই সঙ্কটের একটা সহজ সমাধান বার করলেন। তিনি নিউটনের আপেক্ষিকতাবাদকেই আলোক তরঙ্গের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলেন। আয়েনস্টাইনের দ্বিতীয় উপপাদ্য হল, যান্ত্রিক বা আলোক সম্বন্ধীয় পরীক্ষণে পরীক্ষাগারের স্থিতিশীলতা বা সমগতিশীলতা নির্বিশেষে পরীক্ষণের ফল অভিন্ন হয়। সাধারণভাবে বলতে হলে, পরস্পরের সম্বন্ধে ছাড়া স্থিতিশীলতা ও সমগতিশীলতার মধ্যে কোনও পার্থক্য বার করার পথ নেই।

বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের আর কি কিছু বলবার নেই? এর উপপাদ্যগুলি ভ্রান্তিকরভাবে সরল। তাছাড়া তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি পাঠকের চোখে ওই দুই উপপাদ্য স্ববিরোধী বলে মনে হতে পারে। কিন্তু ওই স্ববিরোধীতার ধারণাটা অলীক ও উপপাদ্য দুটির ফলটা বৈপ্লবিক।

প্রথম উপপাদ্যটির কথা ধরা যাক। এর থেকে এক দিকে আমরা অনুমান করলাম যে আলোর গতিবেগ, 'গ' অন্যদিকে আলোর উৎসটার বেগ যদি হয় 'উ' তাহলে প্রচলিত গণনা অনুযায়ীও আলোর গতিবেগ হবে 'গ'+'উ'। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গতিবেগ 'গ'ই রয়ে যায়। বাস্তব উদাহরণ স্বরূপ একই পবিবেশে একটা গতিশীল উৎসের আলোব গতিবেগ স্থিতিশীল উৎসের আলোর গতিবেগের সমান হয়। একজন পদার্থবিদ বলেছিলেন ঘটনাটা দাঁড়ায় এমন যে একটা চলন্ত সিঁড়ি বয়ে যে লোক উপরে উঠছে সে সেই সিঁড়ির উপর যে লোক দাঁড়িয়ে আছে তার চেয়ে আগে উপরে পৌঁছতে পারছে না। এটাকে অসম্ভব বলে মনে হয়। মনে হবার কারণ আমরা ধরে নিই আলোর চলমান উৎসের গতিবেগটা আলোর সাধারণ গতিবেগের সঙ্গে যোগ করলে তবেই ওই উৎস বহির্গত আলোক রেখার সত্য গতিবেগটা পাওয়া যাবে। এই অনুমান বাদ দিলে কি ফল পাই? আমরা এর আগেই দেখেছি দেশ-কালে পরিমাপে গতির একটা বিচিত্র কাজ আছে। অতএব গতিবেগ সম্বন্ধে প্রচলিত মতগুলি আমাদের ত্যাগ করা দরকার। উপপাদ্য দুটি সত্যই স্ববিরোধী নয়। বিরোধ সৃষ্টি করছে বহুদিন প্রতিষ্ঠিত পদার্থ-বিজ্ঞানের ক্লাসিক্যাল বিধিগুলি। তাদের পরিবর্তনের দরকার ছিল। আয়েনস্টাইন এই পরিবর্তন মেনে নিতে কাল-বিলম্ব করেন নি। তাঁর নিজের উপপাদ্যগুলি খাড়া রাখতে তিনি পুরাণ মতামতগুলি জলাঞ্জলি দিলেন। এর সঙ্গে দেশ, কাল ও পদার্থ সম্বন্ধে আমাদের বহুবাঞ্ছিত ধারণাগুলিও নষ্ট হয়ে গেল।

আয়েনস্টাইনের তত্ত্ব সম্বন্ধে একটা পুরাণ কথা হল যে তাতে সব কিছুকেই আমরা আপেক্ষিকতার নিয়মাধীন দেখি। সব জিনিসই আপেক্ষিক কথার মূল্যটা সব জিনিসই আরও বড় বলার মূল্যের চেয়ে বেশী নয়। বারট্রাণ্ড রাসেল যেমন বলেছেন সব কিছুই আপেক্ষিক হলে এমন কিছু থাকে না যার সম্বন্ধে আপেক্ষিকতার ধারণাটা প্রয়োগ করা যায়। আপেক্ষিক শব্দটা ভ্রান্তিকর। প্রকৃতপক্ষে আয়েনস্টাইন যা আপেক্ষিক নয়, যাকে গণিতশাস্ত্রবিদ বলেন ধ্রুব বা পরিবর্তনহীন (invariant), তার সন্ধানে নেবেছিলেন।

এই ধ্রুবর নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে স্থরু করে এমন পদার্থগত নীতি হয়তো আবিষ্কার করা সম্ভব হবে যাতে দর্শকের অভিজ্ঞতার "বাস্তবতার সারটুকু" পাওয়া যাবে। এই সার হল পার্থিব ঘটনার দেশ-কালগত বৈশিষ্ট্যের সেই অংশ যা দর্শকের বোধগত হলেও, দর্শক-নির্ভর নয় এবং সেই কারণে যা সব দর্শকের কাছেই সমান। আলোর গতিবেগের ধ্রুবত্ব নীতি আয়েনস্টাইনকে পরিবর্তনহীন সত্তার ( invariant ) সন্ধান দিয়েছিল। একে স্বীকার করতে হলে অবশ্য প্রচলিত ঐতিহ্যগত সময়ের ধারণাটাকে ত্যাগ করতে হয়। কিন্তু ওই পরিবর্তনহীনের ধারণাটাই সব নয়। দেশ-কাল পরস্পর জড়িত। তারা একই বাস্তবের অঙ্গ। সময়ের পরিমাপে বিচ্যুতি ঘটলে পরিমাপেও বিচ্যুতি ঘটে।

দেখা যাচ্ছে ফিটজিরাল্ড ও লরেন্‌ৎসের তড়িৎগত প্রকল্প গ্রহণ না করেও আয়েনস্টাইন তাঁদের সিদ্ধান্তে পৌছেছিলেন। তাঁর উপাত্তগুলি থেকেই আমরা জানতে পারি যে আপেক্ষিক গতি ও বিশ্রামের অবস্থায় ঘড়ি ও ফিতেতে বিভিন্ন পরিমাপ পাওয়া যায়। এর জন্য কি যন্ত্রের মধ্যে কোন প্রকৃত বস্তুগত পরিবর্তন দায়ী? প্রশ্নটাকে অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। পদার্থবিদের কাছে পরিমাপের পার্থক্যটাই চিন্তার বিষয়। ঘড়ির স্প্রীং বা মাপের দণ্ডটির যদি সঙ্কোচন ঘটে, তাহলে সেটা দেখা যাবে না কেন? কারণ ওই পার্থক্য মাপতে যে মাপদণ্ডের ব্যবহার করা হবে তারও সঙ্কোচন ঘটবে। এখানে মূল প্রশ্নটা এসে দাঁড়াচ্ছে আমাদের যুক্তি চিন্তার ভিত্তি সম্বন্ধে।

এর আগে কফম্যান ও টমসনের পরীক্ষার কথা বলেছি যাতে দেখা গেছে ইলেকট্রনের গতিবৃদ্ধির সঙ্গে তার ভরের বৃদ্ধি ঘটে। আপেক্ষিকতাবাদে এই বিস্ময়কর তথ্যের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। প্রথম উপপাত্যটি আলোর গতিবেগের ঊর্ধ্বতম সীমা নির্দিষ্ট করে দেয় যার থেকে আমরা বুঝতে পারি কোন জড়-পদার্থের গতি এর বেশী হতে পারে না। নিউটনের সিদ্ধান্তে এমন কোন সীমা নির্ধারিত হয়নি। তাছাড়া বস্তুর ভর সম্বন্ধে তাঁর সংজ্ঞায় ( পদার্থের পরিমাণ ) গতিশীল বা স্থিতিশীল যে-কোন অবস্থাতেই ভরের পার্থক্য ঘটা উচিত নয়। কিন্তু তাঁর গতি সম্বন্ধীয় নিয়মগুলি যেমন সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বলে দেখা গেছে তেমনই ভরের ধ্রুবরাশি সম্বন্ধে তাঁর নিয়মগুলি দেখা যাচ্ছে সম্পূর্ণ সত্য নয়। আয়েনস্টাইনের তত্ত্বে গতিবৃদ্ধির সঙ্গে গতিবেগের পরিবর্তনে বস্তুর বাধাটা বাড়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একটা বস্তুর

গতিবেগকে ঘণ্টায় ১০০ থেকে ১০১ মাইল বাড়াতে যত বলের দরকার হয় তাব চেয়ে বেশী বলের দরকার হবে তার গতিবেগকে ঘণ্টায় ৫০,০০০ থেকে ৫০,০০১ মাইল বাড়াতে। এই বাধার বিজ্ঞানগত নাম জাড্য ( inertia )। জাড্যই জড়ের পরিমাণ। ( আমাদের স্বাভাবিক ধারণা কোন বস্তুর গতিবৃদ্ধির জন্য যে বলের দরকার তা বস্তুর ভরেব উপর নির্ভর করে। আয়েনস্টাইনের সিদ্ধান্ত থেকে বোঝা যায় এই ধারণা হাস্যকর।) এইবার আমাদের ধারণাগুলির সঙ্গতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বেগ বাড়াব সঙ্গে জাড্য বা ইনারশিয়া বাড়ে, বর্ধিত জাড্য বর্ধিত ভর হিসাবে দেখা দেয়। বস্তুব সাধারণ বেগের ক্ষেত্রে জড়মানের বৃদ্ধি হয় অতি অল্প। এইজন্যই নিউটন ও তাঁব পরবর্তী বৈজ্ঞানিকেরা ভরের এই পরিবর্তন ধরতে পারেন নি। একই কারণে সাধারণ গতিশীল বস্তুর সম্বন্ধে নিউটনেব বিধিগুলি প্রযোজ্য। যে রকেট ঘণ্টায় দশ হাজর মাইল বেগে যাচ্ছে তাকেও আলোর সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল গতির কাছে কচ্ছপের গতিতে চলছে বলে মনে হবে। কিন্তু যেখানে অত্যন্ত বেগময় আণবিক কণার বিচার করা হচ্ছে সেখানে ভরের বৃদ্ধির প্রশ্নটা বড় হয়ে ওঠে। হাসপাতালে রঞ্জন-রশ্মিব নলের ইলেকট্রনগুলির গতিবেগ এত বাড়ান হয় যে তার ভর দ্বিগুণ হয়ে ওঠে, সাধারণ টেলিভিশান চিত্রের নলে গতিশক্তিব বৃদ্ধির জন্য ইলেকট্রনের ভর শতকরা পাঁচ ভাগ বেড়ে যায়। এবং আলোর গতিবেগের ক্ষেত্রে বস্তুর গতিবৃদ্ধির জন্য অসীম বলপ্রয়োগেও গতির পরিবর্তন ঘটান অসম্ভব হয়। কারণ সেক্ষেত্রে সেই বস্তুর জড়-পরিমাণটাও অসীম হয়ে ওঠে।

আর এক ধাপ এগোলেই আয়েনস্টাইনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভর-শক্তি সমীকরণ স্থত্রে গিয়ে পৌছব।

ভরের অতিরিক্ত পরিমাণকে একটা বিরাট সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে, অর্থাৎ আলোর গতির বর্গ দিয়ে গুণ করলে গুণফল যতটা শক্তি ভরে পরিণত হয়েছে তার সমান হবে। কিন্তু ভর ও শক্তির এই যে সমানত্ব তা কি শুধু গতির ক্ষেত্রেই ঘটে? যে বস্তু স্থিতিশীল হয়ে আছে সে ক্ষেত্রে কি হবে? তার ভরের সঙ্গেও কি শক্তির সম্বন্ধ রয়েছে? আয়েনস্টাইন এই সম্বন্ধকে স্বীকার করতে দ্বিধা করলেন না। ১৯০৫ সালে তিনি লিখলেন, "বস্তুর ভর বস্তুগত শক্তির পরিমাপ।" এ বিষয়ে তাঁর প্রসিদ্ধ স্থত্র হল শ=ভগ$^২$, যেখানে শ=বস্তুগত শক্তির পরিমাণ, ভ=বস্তুর ভর ও গ=আলোর গতিবেগ। ইংরাজীতে $E=mc^2$।

একই প্রবন্ধে আয়েনস্টাইন জানালেন, "যে সব বস্তুর শক্তি অতিমাত্রায় পরিবর্তনশীল, যেমন রেডিয়ম সল্ট, সেখানে এই সূত্রের পরীক্ষা অসম্ভব নয়। ১৯৩০ এর বছরগুলিতে অনেক পদার্থ-বৈজ্ঞানিক এই পরীক্ষায় নেবেছিলেন। তাঁরা পরমাণুর ভর ও আণবিক প্রতিক্রিয়ায় প্রাপ্ত শক্তির পরিমাপ করেন। পরীক্ষার ফলগুলি আয়েনস্টাইনের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করল। একজন বিখ্যাত পদার্থবিদ, ডঃ ই, ইউ, কনডন, আয়েনস্টাইনের এই বিজয়ে তার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প বলেছিলেনঃ ১৯৩৪ সালে প্রিন্সটনে এক ছাত্রসভার কথা আমার খুব স্পষ্ট মনে আছে। সেই সভায় আয়েনস্টাইনের উপস্থিতিতে একজন গ্র্যাজুয়েট ছাত্র এ বিষয়ের গবেষণার বিবরণ পড়ছিলেন। আইনস্টাইন তখন অন্যান্য অনুশীলনে এত ব্যস্ত যে তাঁর পূর্বের তত্ত্বের প্রমাণ যে পদার্থবিজ্ঞানের পরীক্ষাগারের একটা সাধারণ ঘটনা হয়ে উঠেছে তিনি জানতেন না। তিনি ছোট একটি ছেলের মত খুশি হয়ে বারবার বলতে সুরু করলেন, 'Is das wirklich so?' একি বাস্তবিকই সত্যি? ততক্ষণ তাঁর শ=ভগ² সূত্রের প্রমাণ জড়ো করা হচ্ছিল।"

বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ প্রচারের পর দশ বছর আয়েনস্টাইন বর্ধমান গতিকে তাঁর তত্ত্বের নিয়মাধীন করতে চেষ্টা করেছেন। এই ছোট প্রবন্ধে সব কথা বলা সম্ভব হবে না। অল্প কথায় এর ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করছি।

একটি কোন পরিবেশ সম্পর্কে স্থিতিশীলতা ও গতিশীলতার পার্থক্য বোঝা অসম্ভব হলেও সেই একই পরিবেশে গতির বা দিকের পরিবর্তনটা সহজেই গণনা করা যায়। একটা ট্রেন যখন সরল রেখায় সমবেগে স্বচ্ছন্দে চলে তখন গতির বোধ হয় না। কিন্তু ট্রেনের গতি কমলে কিম্বা বাড়লে, কিম্বা ট্রেন বক্রভাবে চললে তখনই গতির বোধ জাগে। গতি ও দিকের পরিবর্তনের সময় সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য চেষ্টা করতে হয়, প্লেট থেকে ঝোল না পড়ে তার দিকে দৃষ্টি রাখতে হয়। এই পরিণামের কারণ বলা হয় জাড্যগত ( inertial ) বল যা গতিবৃদ্ধি করে। এই নাম দেওয়ার কারণ হল বলগুলির সৃষ্টি হয় বস্তুর জাড্য গুণ থেকে, অর্থাৎ একটি অবস্থার পরিবর্তনের বাধা দেওয়ার শক্তি থেকে। এর থেকে মনে হবে যে কোন সাধারণ পরীক্ষায় গতি বৃদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যাবে যাকে সমান গতিবেগ বা স্থিতিশীলতা থেকে পৃথক করে দেখা সম্ভব হবে। একটা আলোক রেখা-

সমষ্টির উপর গতিবৃদ্ধির পরিমাণটাও যাচাই করে দেখা যাবে। উদাহরণ-স্বরূপ, স্থিতিশীল বা সমগতিশীল ল্যাবরেটরীর মেঝের সমান্তরাল করে একটি আলোক-স্তম্ভের সৃষ্টি করা হল ও ল্যাবরেটারীটির উপর বা নিচের দিকে গতিবৃদ্ধি করা হল। এর ফলে আলোক-স্তম্ভটি আর মেঝের সমান্তরাল হয়ে থাকবে না ও তার যেটুকু বিচ্যুতি ( deflection ) ঘটবে তার পরিমাপে গতিবৃদ্ধি বা ত্বরণের ( accelaration ) পরিমাণ বোঝা যাবে।

আয়েনস্টাইন যখন এ বিষয়ে চিন্তা করছিলেন তখন তাঁর চোখে এই ঘটনা ধারার মধ্যে একটা বিচ্যুতি ধরা পড়ল। যান্ত্রিক বা আলোক-সংক্রান্ত পরীক্ষায় মাধ্যাকর্ষণ ও জাড্যশক্তি সৃষ্ট ত্বরণের পার্থক্যটা বোঝা যাবে কেমন করে? আলোক-স্তম্ভের পরীক্ষার কথা ধরা যাক। এক সময়ে আলোক-স্তম্ভ মেঝের সমান্তরাল হয়েছিল ও পরে তার পথ থেকে বেঁকে বিচ্যুত হয়ে পড়ল। পরীক্ষক বলছেন জাড্যশক্তি সৃষ্ট ত্বরণের জন্য এই বিচ্যুতি ঘটছে। কিন্তু এর নিশ্চয়তা কোথায়? ল্যাবরেটারীর মধ্যে যা দেখেছেন পরীক্ষকের সিদ্ধান্ত তার উপরই নির্ভর করছে। অতএব চলন্ত ট্রেনের মত এখানে জাড্যশক্তি কাজ করছে না তিনি যা দেখছেন তা অদৃশ্য বৃহৎ আকার পদার্থের মাধ্যাকর্ষণের ফল তা তার পক্ষে বলা সম্ভব নয়।

এর থেকে আয়েনস্টাইন আপেক্ষিকতাবাদকে আর ব্যবক করে তোলার সূত্র পেলেন। স্থিতিশীলতা ও সমগতিশীলতার মধ্যে যেমন পার্থক্য করা যায় না তেমনই ত্বরণ ও মাধ্যাকর্ষণের পরিণামটাকে আলাদা করে দেখা যায় না। পরীক্ষাগারে যান্ত্রিক বা আলোক-সংক্রান্ত পরীক্ষায় একটা পরিবেশে ত্বরণ, সমগতি ও মাধ্যাকর্ষণ কাজ করছে কিনা বোঝা অসম্ভব। ( আগামী কালের মহাকাশযানের মেঝের উপর হঠাৎ নিক্ষিপ্ত যাত্রী জানতে পারবে না তার বাহনের রকেট মটরগুলি চলতে সুরু করল, না বিরাট একটা জড়-পুঞ্জের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বিপর্যয় ঘটাল। ) ১৯১১ সালে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ও জাড্যশক্তির সমরূপতা সম্বন্ধে আয়েনস্টাইন তাঁর সিদ্ধান্তগুলি উপস্থিত করেন।

তাঁর চিন্তা ধারার বৈপ্লবিক ফল দেখা গেল। সমরূপতার নীতি থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে এসে পৌছলেন যে মাধ্যাকর্ষণ আলোর রেখার গতিগতকে প্রভাবিত করবে। এর কারণ হল ত্বরণের এমন প্রভাব দেখা যায় ও মাধ্যাকর্ষণ ও ত্বরণের মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব নয়। তিনি বললেন, স্থির তারা থেকে আলোর রেখা যখন সূর্যের বিরাট দেহের পাশ দিয়ে যায়

তখন মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবের ফলে সেই রেখা গতিপথ থেকে বিচ্যুত হবে। অবশ্য আয়েনস্টাইন এ কথা বুঝতেন যে সাধারণ অবস্থায় এই বিচ্যুতি পর্যবেক্ষণ করা সহজ হবে না কারণ সূর্যের উজ্জ্বল আলো তারার আলোর বিলোপ ঘটাবে। কিন্তু সম্পূর্ণ সূর্য গ্রহণের সময় সূর্যের কাছের তারাগুলি দেখা যাবে ও সেই সময় তাঁর বক্তব্য পরীক্ষা করে প্রমাণ করা যাবে। সমরূপতার বিষয়ে লেখা প্রবন্ধে আয়েনস্টাইন বললেন, "যে প্রশ্নের কথা তুললাম তা যদি কিছুটা ভিত্তিহীন ও অদ্ভুত বলেও মনে হয় তবু জ্যোতিষবিদেরা এ বিষয়ে পরীক্ষা করে দেখলে খুব ভাল হয়।" আট বছর পরে ১৯১৯ সালে আর্থার এডিংটনের নেতৃত্বে একটি ব্রিটিশ সূর্যগ্রহণ পর্যবেক্ষক দল আয়েনস্টাইনের অতি বিস্ময়কর ভবিষ্যৎ-বাণীর সমর্থন করলেন।

১৯১৬ সালে আয়েনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিকতাবাদের সাধারণ তত্ত্ব প্রচার করলেন, যাতে তাঁর বিশিষ্ট তত্ত্ব ও সমরূপতা নীতির পূর্ণতর সমন্বয় ঘটল। এই সাধারণ ব্যাপক তত্ত্বে দুটি সুগভীর ধারণার সূত্রপাত হল: এক, চারটি আয়তনযুক্ত অবিচ্ছেদ্য প্রবাহে দেশ ও কালের যোগ (তাঁর বিশেষ সিদ্ধান্তের ফল) ও দুই, দেশের বক্রতা (curvature of space)।

দেশ ও কালের মিলনের ধারণার জন্য আয়েনস্টাইন জুরীচে তাঁর পূর্বতন রুশীয় অধ্যাপক হারমান মিনকাওসকির (Hermann Minkowski) কাছে ঋণী। ১৯০৮ সালে মিনকাওসকি বলেন "দেশ ও কাল এককভাবে অসার অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। দুয়ের সমন্বয় শুধু একটা স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখে।" তিনটি প্রচলিত আয়তনের সঙ্গে কালের চতুর্থ আয়তনযুক্ত হয়ে পুরাতন পরম দেশ ও পরম কালের বদলে একটি নূতন একক দেশ-কালের মাধ্যমের সৃষ্টি হল। এই মাধ্যমের কোন ঘটনা—উদাহরণ স্বরূপ একটা গতিশীল বস্তুকে ঘটনা বলা যেতে পারে—তিনটি আয়তনের গণনায় তার অবস্থানের পরিচয় শুধু দেবে না, একটা চতুর্থ আয়তনের ধারণাগত কখন তা ঘটেছিল তারও পরিচয় দেবে। আমরা জানি "কোথায়" ও "কখনের" ধারণা দর্শকের হয় আলোর সঙ্কেতগত বিচারে। এইজন্য কালের আয়তনের একটা উপকরণ হল আলোর গতিবেগের সংখ্যা।

পরম দেশ-কালের ধারণা বাতিল করলে বিশ্বের পুরাণ ছবি যা অতীত থেকে বর্তমানে ও বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে এগিয়ে চলে তাকেও বাদ দিতে হয়। মিনকাওসকির ও আয়েনস্টাইনের নূতন জগতে পরম অতীত বা পরম ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই। সেখানে পরম বর্তমান অতীত ও ভবিষ্যৎকে

পৃথক করে নেই। বর্তমান "একই মুহূর্তে বিশ্ব-জগতের সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে নেই।" দেশ-কালে একটা রেখার মধ্য দিয়ে বস্তুর গতি বোঝান হয়, যে রেখার নাম দেওয়া হয়েছে "জগত-রেখা"। ঘটনা তার নিজের ইতিহাস রচনা করে। ঘটনার যে সঙ্কেত তা দর্শকের কাছে পৌছতে সময় লাগে; দর্শক যা দেখে শুধু তার বিবরণটুকুই দিতে পারে। অতএব একজনের কাছে যা অতীত, অন্যের কাছে তা ভবিষ্যৎ। এডিংটনের ভাষায় পুরাণ বিশ্বাসগত পরম নিশ্চিত "এখানে-এখন" শুধু "এখন-দেখা"য় পর্যবসিত হয়েছে।

এর অবশ্য এই অর্থ নয় যে প্রত্যেক দর্শক তার নিজের নিজের জগতের কথা বলে। আমরা নিউটনের শৃঙ্খলা থেকে আয়েনস্টাইনের যথেচ্ছাচারে এসে পৌছই নি। তিন আয়তন যুক্ত জগতে যেমন দুটি বিন্দুর মধ্যের দূরত্বের পরিমাপ সম্ভব ছিল, চার আয়তন যুক্ত দেশ-কালের অবিচ্ছেদ্য প্রবাহেও তেমনি দুটি ঘটনায় দূরত্বের সংজ্ঞা দেওয়া ও পরিমাপ করা সম্ভব। এই ঘটনাব দূবত্বকে বলা হয় "অবকাশ" ও তার এক একটা "প্রকৃত পরম পরিমাণ" আছে। এই পরিমাপ সকলের কাছে সমান। অতএব শেষ পর্যন্ত পবিবর্তনশীল জগতে একটা স্থায়ী বস্তুর সন্ধান পেলাম।

বক্র শূন্য দেশের ধারণার সঙ্গে এই ছবির মিল কোথায়? বক্র শূন্য দেশের ধারণাটা কাঁটার মত গলায় বেঁধে। একটা ফুলদানি, বিসকুট বা রেখা বাঁকান হতে পারে কিন্তু শূন্যস্থান বাঁকা হবে কি করে? আবার আমাদের আধ্যাত্ম-দর্শনের বিমূর্ত চিন্তা বাদ দিয়ে, পরীক্ষাযোগ্য ধারণার ক্ষেত্রে ফিরে আসতে হবে।

শূন্য দেশে আলোক-রশ্মি সরল রেখায় চলে। কিন্তু কয়েকটি ক্ষেত্রে, যেমন ওই রশ্মি যখন সূর্যের পাশ দিয়ে যায় তখন আলোর গতির রেখা বেঁকে যায়, এর নানা রকম ব্যাখ্যা হতে পারে। আমরা বলতে পারি মাধ্যাকর্ষণযুক্ত বস্তুর উপস্থিতি আলোক-রশ্মিকে বক্র পথে চালায়। কিম্বা বলতে পারি ওই বস্তু যে শূন্যস্থানের মধ্য দিয়ে আলো যাচ্ছে তাকেই বাঁকিয়ে দেয়। এর মধ্যে একটা কোনও কারণকে বেছে নেওয়ার পক্ষে কোন যুক্তি নেই। দেশ-কালের মত মাধ্যাকর্ষণের ক্ষেত্রের কল্পনাটাও কল্পনামাত্র। আলোর গতিপথের পরিমাণটাই শুধু একটা বাস্তব-গ্রাহ্য সাক্ষ্য সামনে ধরতে পারে। আলোর বক্র পথের ব্যাখ্যা আলোর উপর মধ্যাকর্ষণের পরিণাম হিসাবে দেখার চেয়ে বক্র দেশ-কালের পরিণাম হিসাবে দেখাটা বেশী ফলপ্রসূ।

একটা উপমা দেওয়া যাক। একটা প্রকাণ্ড ঢাকের উপর পাতলা রবারের চাদর টান করে বিছান আছে। একটা অতি হাল্‌কা মার্বেলের গুলি নিয়ে সেই চাদরের উপর গড়িয়ে দিলাম। এখানে গুলিটা সরল রেখায় গড়িয়ে যাবে। এবার কতকগুলি ভারি সীসের টুকরো নিলাম ও রবারের চাদরের বিভিন্ন জায়গায় তা রাখলাম। সীসের টুকরোর ভার চাদরের মধ্যে ঢাল ও ছোট ছোট গর্তের সৃষ্টি করবে। এইবার আবার মার্বেলের গুলিটা চাদরের উপর গড়িয়ে দেওয়া হল। গুলির পথটা এবার সোজা হবে না। পথটা বেঁকে গর্তের মধ্যে গিয়ে পড়বে। দেশ-কালকে ওই রবারের চাদরের সঙ্গে তুলনা করা যাক ও সীসের টুকরোগুলিকে ধরা যাক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মধ্যাকর্ষণযুক্ত বস্তু। এর মধ্যে কোন একট "ঘটনার" কল্পনা করা যাক, যেমন একটা চলন্ত পদার্থ-কণা, আলোক-স্তম্ভ বা একটি গ্রহ। এগুলি হল উপরের পরীক্ষার মার্বেল। যেখানে মাধ্যাকর্ষণযুক্ত বস্তু-ভার নেই সেখানে দেশ-কাল সমতল ও গতির পথ সরল রেখায় চলে। কিন্তু যেখানে বস্তুর ভারের প্রভাব আছে সেখানে দেশ-কাল বক্র হয়ে ঢাল ও গর্তের সৃষ্টি করেছে। কোন বস্তু এর কাছাকাছি এলে তার গতিপথ বেঁকে যায়।

একেই বলে মধ্যাকর্ষণ শক্তির টান। কিন্তু আয়েনস্টাইনের সিদ্ধান্তে মাধ্যাকর্ষণ দেশ-কালেরই একটি অঙ্গ, একটি উপকরণ। তারার আলোর রেখা সূর্যের দিকে বেঁকে তার চারিদিকের ঢালের মধ্যে পড়ে, কিন্তু তার নিজের যথেষ্ট শক্তি থাকায় গর্তের মধ্যে গিয়ে পড়ে না। সাইকেল চালক যেমন একটা ফাঁপা গোল গম্বুজের কানা ধরে তীব্রবেগে ঘোরে, পৃথিবীও তেমনি সূর্যকে প্রদক্ষিণ করার সময় সূর্যের সৃষ্টি করা গর্তের ঠিক ধার ঘেঁসে চলে। যে গ্রহ ওই গর্তের খুব ভিতরে ঢোকে সে গ্রহ গর্তের নিচে পড়ে যায়। (জ্যোতির্বিদের প্রকল্পে এর থেকেই সংঘর্ষ ও নূতন গ্রহের সৃষ্টি হয়।) যেখানে যেখানে জড় পদার্থ আছে সেখানেই ঢাল আছে, কোটর আছে; অন্যদিকে জ্যোতির্বিদ্যার তথ্য অনুসারে বিশ্ব-সীমার মধ্যে জড় পদার্থ সর্বত্র প্রায় সমানভাবে ছড়িয়ে আছে। এর থেকে আয়েনস্টাইন সিদ্ধান্ত করলেন যে দেশ-কাল অল্প বক্রাকৃতি, স্থায়ী কিন্তু সীমারেখাহীন। আয়েনস্টাইনের সিদ্ধান্ত বিশ্বের সম্প্রসারণ প্রকল্পের বিরোধী নয়। সেক্ষেত্রে পদার্থের ঘনত্ব আরও কম হবে। স্থায়ী অথচ সীমারেখাহীন বিশ্বের সঙ্গে পৃথিবীর দুই আয়তনযুক্ত বক্র উপরের অংশটার তুলনা করা যেতে পারে।

এখানে সীমারেখাহীন ক্ষেত্রটি স্থায়ী ও এক হিসাবে সীমিত। এইজন্য কেউ যদি নির্দিষ্ট দিকে চলতে থাকে তবে যেখান থেকে চলতে সুরু করেছিল সেইখানেই ফিরে আসবে।

আয়েনস্টাইনের আবিষ্কার মানুষের অন্যতম গৌরবের বিষয়। এর দুটি জিনিস লক্ষ্য করার মত। প্রথম, বিশ্বকে তিনি একটা যন্ত্র হিসাবে আঁকেন নি, যেখানে মানুষ বাইরের দর্শক বা ব্যাখ্যাকার মাত্র। দর্শক এখানে যা দেখছে সেই বাস্তবেরই অঙ্গ; এইজন্য দেখার মধ্যেও সে বিশ্বের গঠন করছে।

দ্বিতীয় কথা হল, তাঁর তত্ত্ব প্রশ্নের জবাব দেওয়া ছাড়াও আরও অনেক কিছু দিয়েছে। একটা প্রাণপূর্ণ গতিশীল সিদ্ধান্ত হিসাবে এ আমাদের মনে নূতন প্রশ্ন জাগিয়েছে। আয়েনস্টাইন অপ্রতিদ্বন্দ্বী আইনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। তাঁর নিজের নীতিগুলিকেও কেউ অস্বীকার করবে না এ কথা তিনি অন্তত ভাবেন না। মানুষের মনের জগতের তিনি প্রসার ঘটিয়েছেন।

# কেমন করে কথা জীবনের পরিবর্তন সূচিত করে

### এস, আই, হেয়াকাওয়া

এস, আই, হেয়াকাওয়ার জন্ম ভ্যানকুভারে ও তিনি মানিটোবা, ম্যাকগিল ও উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। ডঃ হেয়াকাওয়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন ও ১৯৫৫ সাল থেকে স্যান ফ্রান্‌সিস্‌কো রাষ্ট্রীয় কলেজে তিনি শিল্পভাষার অধ্যাপকের কাজ করছেন। ডঃ হেয়াকাওয়া "ETC: সাধারণ শব্দার্থ তত্ত্বের ব্যাখ্যা"র (Review of General Semantics) সম্পাদক। এ ছাড়া তাঁর লেখা আরও অনেকগুলি বই আছে। তাঁর "Language in Action" পাঠ্যপুস্তক হিসাবে লেখা হয় ও ১৯৪৬ সালে বইটি "এ মাসের বই" (A Book-of-the month Club) হিসাবে নির্বাচিত হয়। ডঃ হেয়াকাওয়া মার্জদস্ত পিটারকে বিবাহ করেছেন। ছবি আঁকা, মাছ ধরা ও জাজ গানে তাঁর সখ।

আমাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া ও সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার যে সামগ্রিক ছক দেখতে পাই তা আপনার, আমার ও সকলের শিক্ষার শেষ ফল। এই মুহূর্তে যদি আপনার মধ্যে "বাঙলা পড়ার ক্ষমতা" রূপ প্রতিক্রিয়ার ছক না থাকত তাহলে এই কাগজের উপর অর্থহীন কালো চিহ্ন ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেতেন না। সমর সঙ্গীত শুনে আপনার দেশ-প্রেম জাগবে কি জাগবে না তা আপনার শিক্ষা নির্ধারিত প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভর করে। একেইভাবে আপনার ধর্মের প্রতীক আপনার মনে ভক্তিভাব জাগায়, সাধারণ লোকের চেয়ে একজন "এম, ডি" ডিগ্রীধারীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উপদেশের কথা আপনি আরও মন দিয়ে শোনেন। অতএব এখানে যে "প্রতিক্রিয়ার ছকের" কথা বলেছি তা হল ঘটনা, কথা ও প্রতীকের সামনে আমাদের সামগ্রিক ব্যবহারের ছবি।

আমাদের প্রতিক্রিয়ার ছক, যাকে আমাদের শব্দ-সঙ্কেতজনিত আচরণ বলতে পারি, তা ছোটবেলায় আমাদের প্রতি ব্যবহারে পিতামাতার কাছে

আমরা যে শিক্ষা বা কুশিক্ষা পেয়েছি, আমাদের স্কুল-কলেজের শিক্ষা, বক্তৃতা ও উপদেশ শুনে শিক্ষা, রেডিও, সিনেমা ও টেলিভিশানের ছবির অভিজ্ঞতার শিক্ষা, সবরকম বই, সংবাদপত্র ও হাস্যকর টীকা-টিপ্পনী পড়ার শিক্ষা, বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে কথাবার্তা ও আমাদের সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতার শিক্ষার একটা মানসিক ও গুরুত্বপূর্ণ অবশিষ্ট ফল। এই যে বিভিন্ন প্রভাব যা আমাদের চরিত্র গঠন করেছে তার কারণে যদি আমাদের ব্যবহার অন্যান্য আর সকলের মত হয় তাহলে বলা হয় আমরা "স্বাভাবিক", "সামাজিক" ও বোধকরি কিছুটা "একঘেয়ে"। যদি আমাদের শব্দ-সঙ্কেতজনিত আচরণ অন্য সকলের থেকে পৃথক হয় তা হলে বলা হয় আমরা "ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন" ও "অসাধারণ"। এই অসাধারণত্ব যদি আমাদের শঙ্কার কারণ হয় তবে আমরা বলি লোকটি অদ্ভুত খেপা।

কোনও কোনও অভিধানে শব্দার্থ তত্ত্বের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "শব্দ অর্থের বিজ্ঞান"। এ সংজ্ঞায় আপত্তি থাকে না যদি লোকের মনে এমন ভাব না জাগে যে শব্দের অর্থের সন্ধান অভিধান দেখাতেই শেষ হয়।

একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে অভিধানিক সংজ্ঞায় একটা শব্দকে আরও কতকগুলি শব্দ দিয়ে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। অতএব সংজ্ঞাটি আরও স্পষ্ট করতে হলে, আমাদের অন্যান্য শব্দগুলিরও সংজ্ঞা দিতে হবে ও এইভাবে শব্দের পর শব্দ ব্যবহার করে যেতে হবে। একটা শব্দকে অন্য শব্দ দিয়ে বোঝান স্থরু করলে গণিতবেত্তা যাকে বলেন, "অশেষ পশ্চাদগমন", আমরা সেই অবস্থায় গিয়ে পড়ব। অন্যদিকে শব্দের ব্যবহারে শব্দের পিছনে ঘোরাঘুরি ছাড়া আর কিছু হয় না। অভিধান খুলে ধৃষ্টতার অর্থ দেখি হঠকারিতা আর হঠকারিতার অর্থ খুঁজতে গিয়ে দেখি তার অর্থ ধৃষ্টতা। অথচ সাধারণ লোকের ব্যবহার দেখে মনে হয় অন্য শব্দের ব্যবহারে একটি শব্দের ব্যাখ্যা সম্ভব। একটি লোক লুই আর্মস্ট্রঙের কাছে জানতে চেয়েছিল, জাজ কি? উত্তরে সুখ্যাত ভেরী বাদক প্রকৃত শব্দার্থবিদের মত বলেছিলেন, "তোমার মনে যদি প্রশ্ন থাকে জাজ কি, তাহলে তার অর্থ তুমি কোনদিনই ধরতে পারবে না।"

এর থেকে বোঝা দরকার শব্দার্থতত্ত্বের কারবার শব্দের অর্থ নিয়ে নয়। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত পদার্থবিদ পি, ডাবল্যু, ব্রীজম্যান একবার বলেছিলেন, "একটা শব্দের অর্থ বোঝা যায় সে সম্বন্ধে লোকে কি বলছে তা শুনে নয়, তাকে কি ভাবে কাজে লাগান হচ্ছে তাই দেখে।" বৈজ্ঞানিক শব্দের সংজ্ঞা

তার প্রয়োগে, তার ব্যবহারের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে বলে ঘোষণা করে ব্রীজম্যান বিজ্ঞানকে ঐশ্বর্যশালী করেছেন।

এই ব্যবহারিক সংজ্ঞা সম্বন্ধে একটি সাধারণ সমালোচনা নিচের উদাহরণে পাওয়া যাবে। আমরা বললাম, "এই টেবিলটা ছ' ফুট লম্বা।" এই কথার ব্যবহারিক সংজ্ঞা পাব একটা গজ নিয়ে টেবিলটাকে এক ফুট, দু' ফুট করে মাপা। কিন্তু যখন বলছি, "মানুষ স্বাধীন হয়ে জন্মায় কিন্তু সর্বত্র সে শৃঙ্খলায় বাঁধা" তখন এই কথাটি সত্য কি মিথ্যা তা কি মানদণ্ড ব্যবহারে জানব?

পদার্থ বিজ্ঞানের যে ক্ষেত্রে ব্রীজম্যান "ব্যবহারিকতার" প্রয়োগ দেখিয়েছেন তার বাইরে এর প্রয়োগ করে দেখা যাক। আমরা যে ভাষা ব্যবহার করি ও অন্যে আমাদের সঙ্গে যোগ-সৃষ্টির জন্য যে ভাষা ব্যবহার করে তার ফলে আমাদের আচরণ কেমন দাঁড়ায় দেখতে হবে। ধরুন একজন কর্মী নিয়োগ কর্তা ( Personel Manager ) কারও আবেদনপত্র পড়ছেন। তিনি এক জায়গায় এসে দেখলেন আবেদনকারী লিখছেন, শিক্ষা: হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং দেখার সঙ্গে সঙ্গে আবেদনপত্রটি বাতিল করে দিলেন ( একটা বাক্যের ফলে তাঁর আচরণ এইভাবে নির্দিষ্ট হল ) কারণ তাঁর হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মানুষকে পছন্দ নয়। এই থেকেই শব্দের অর্থ কি ভাবে কাজ করে তার একটা নমুনা পাওয়া গেল, এ অর্থ অভিধানের অর্থ নয়।

শব্দার্থতত্ত্বের ব্যাখ্যায় আমার যে এতক্ষণ সময় লাগছে তার কারণ আমি ওই ব্যাখ্যার মধ্যে পাঠকদের মানুষের ব্যবহারের একটা নূতন দিকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার চেষ্টা করছি। শব্দার্থতত্ত্ব, বিশেষ করে পোল-মার্কিন বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষক, এলফ্রেড করজিবস্কির ( Alfred Korzybski ) ( ১৮৭৯-১৯৫০ ) শব্দার্থতত্ত্ব বাক্যকে বাক্য হিসাবে গুরুত্ব দেয় না, তার শব্দার্থগত প্রতিক্রিয়ার উপর জোর দেয়। অর্থাৎ প্রতীক, সঙ্কেত ও ভাষার মত প্রতীক-পূর্ণ একটা ব্যবস্থা সম্বন্ধে মানুষের প্রতিক্রিয়া কেমন হয় তার বিচার করে।

আমি মানুষের ব্যবহারের কথা বলেছি তার কারণ যতদূর জানি একমাত্র মানুষেরই জৈব উপকরণ বাদে প্রতীক ও প্রতীক সমষ্টি উদ্ভাবন করবার ক্ষমতা আছে। একটা পতাকার প্রতি আমাদের যে প্রতিক্রিয়া সেটা এক টুকরো কাপড় দেখার প্রতিক্রিয়া নয়; ওই কাপড়ের টুকরোর যে সাঙ্কেতিক

অর্থ আমরা সেইটাকেই দেখি। একটা বাক্যের প্রতি আমাদের যে প্রতিক্রিয়া সেটা কতকগুলি শব্দ সম্বন্ধে প্রতিক্রিয়ার সমান নয়, ওই শব্দ আমাদের মনে যে সঙ্কেতের সৃষ্টি করে তার প্রতি আমাদের বিশেষ মনোভাবের কাজ।

সাধারণ শব্দার্থতত্ত্বের একটা মূল ধারণা হল শব্দের ( বা অন্যান্য প্রতীকের ) অর্থ ওই শব্দের মধ্যে নেই। তার অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় সেই শব্দেব সম্বন্ধে আমাদের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে। আমি যদি আরবী, হিন্দুস্থানী বা সোয়াহিলি ভাষায় একটা অত্যন্ত অশ্লীল গল্প বলি যেখানে আমার শ্রোতারা শুধু ইংরাজী বোঝেন, তাঁরা কেউ রাগও করবেন না, লজ্জাও পাবেন না— আসলে আমার গল্প গল্পই হবে না। তেমনই টাকার নোটের মধ্যে টাকার মূল্যবোধ নেই। ওই নোটটা রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকারের একটা প্রতীক বলেই আমাদের কাছে তার মূল্য। আমাদের শাসনতন্ত্র ভেঙে পড়ায় ওই অঙ্গীকারের মূল্য যদি আজ নষ্ট হয়ে যায় তা হলে ওই টাকার নোট শুধু একটুকরো কাগজে পরিণত হবে। টাকার নোটের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তার মূল্যটা আমরা বুঝে ফেলি না। নোটের প্রতি অন্যান্য লোকের প্রতিক্রিয়া দেখে তার মূল্য ধরতে পারি। যে সামাজিক ব্যবস্থা ও আনুগত্য টাকার মূল্য দেয় টাকার নোটের অর্থবোধের আগে সেটাকে আমাদের বুঝতে হয়। অতএব শব্দার্থতত্ত্ব সমাজের অনুশীলন ও অন্যান্য সামাজিক অনুশীলনের মূল স্বরূপ।

প্রায়ই বলা হয় কথা ফাঁকি ও ফাঁদে ভরা। শক্তিধর সেলস্‌ম্যান, কৌশলী প্রচারক, রাজনীতিবিদ ও আইনজীবির বাক্ চতুরতায় আমাদের প্রতারিত হওয়াটা স্বাভাবিক। কথার মধ্যে আমরা নিজেদের কতটা ফাঁকি দিই জানি না বলেই অন্যের কথার ফাঁদে ধরা পড়ার কথা আমরা বলি। রুশীয়রা যখন "গণতন্ত্র" বলতে এমন কিছু বোঝাতে চায় যা আমাদের ধারণার সঙ্গে মেলে না, তখন আমরা তৎক্ষণাৎ তাদের প্রতারক প্রচার কাজের জন্য গালাগালি দিয়ে থাকি। এবং আমরা যুক্তরাষ্ট্রে যখন ওই "গণতন্ত্র" শব্দটিই রুশীয় অর্থে নয়, আমাদের নিজের অর্থে ব্যবহার করি তখন তারাও আমাদের "ভণ্ড" নামে অভিহিত করতে দেরি করে না। আমাদের সকলেরই বিশ্বাস আমরা যে অর্থে একটা কথা ব্যবহার করছি সেইটাই ঠিক। অন্য অর্থে যদি কেউ সে কথা ব্যবহার করে তবে হয় সে অজ্ঞ নয় সততাহীন।

"গণতন্ত্রের" মত একটা কঠিন ও বিমূর্ত ভাববোধক শব্দ বাদ দিয়ে এখন একটা সাধারণ শব্দ নেওয়া যাক, যেমন মাছি। "মাছির" অর্থ নিশ্চয় জানি। কয়েকটি বাক্যে তার ব্যবহার দেখা যাক :

"মাছি ভনভন করছে।"

"বন্দুক ছোঁড়ার আগে নলের মাছির মধ্যে দিয়ে লক্ষ্য স্থির করে নাও।"

"মাছিমারা কেরানীর মত কাজ করে।"

"মাছি আজ আমাদের বাড়ি এসেছিল।"

আর একটা সাধারণ কথা "কারণের" ব্যবহার দেখা যাক। আমার না যাওয়ার "কারণ" তুমি। কাপালিক "কারণ" পান করে যোগে বসেছে। তুমি "কারণ" জাতিভুক্ত? বেদান্তের "কারণ"-শরীরের কথা শোনা আছে কি? এতগুলি অর্থের মধ্যে ঠিক অর্থটি যে বুঝতে পারি সেইটাই আশ্চর্য।

উপরে যে দৃষ্টান্তগুলি দেওয়া হল তা আমাদের অত্যন্ত পরিচিত একটা নিয়মের অন্তর্গত এবং সেই জন্যই আমরা এ বিষয়ে চিন্তা করি না। নিয়মটা হল বেশীর ভাগ শব্দেরই এমন সব অর্থ আছে যা অভিধানে পাওয়া যায় না। এর উপর যখন দেখি আমাদের প্রত্যেকেরই অভিজ্ঞতা, স্মৃতি, ইচ্ছা-অনিচ্ছা সব ভিন্ন তখন একটি শব্দ আমাদের মনে যে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে সেটা বোঝা শক্ত নয়। গঙ্গা যে একটা নদীর নাম সে বিষয়ে আমরা একমত হতে পারি। কিন্তু গঙ্গার যে অংশ আমি দেখেছি ও আমার মনে আছে, আপনার হয়তো তা নেই; গঙ্গার সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা আপনার থেকে ভিন্ন; গঙ্গার ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে একজনের পড়াশোনা বেশী। গঙ্গার সঙ্গে আমার দুঃখ-স্মৃতি জড়িত, আপনার সুখ-স্মৃতি জড়িত। অতএব আপনার গঙ্গা নদীর সঙ্গে আমার গঙ্গা নদীর মিলবে না। যখন দু'জনে গঙ্গার বিষয়ে কথা বলি তখন বুঝি না যে আমরা দু'জনা দুটি বিভিন্ন স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার কথা বলছি।

একটা শব্দের এত বিভিন্ন অর্থ থাকায় তার ব্যবহারটা এর পরে ঠিক কি অর্থে করতে যাচ্ছি তা আগে থেকে বলা শক্ত। "Mother" (মা) কে শ্রদ্ধা করার শিক্ষা পেয়ে থাকতে পারি। কিন্তু যখন বলি "বোতলে Mother (ভিনিগারের ফেনা) তৈরি হচ্ছে" তখন কি ভাব মনে জাগবে? একটা শব্দের মানে কি হবে আগে থেকে যদি না জানতে পারি, তাহলে

নিচের ঘটনায় আমাদের কেমন মনোভাব হবে জানা কি সম্ভব: (১) আগামী গ্রীষ্মে এক ব্যক্তি, যিনি নিজেকে সমাজতন্ত্রবাদী বলে ঘোষণা করেছেন, তিনি আপনার সহরের দলিল রক্ষকের পদের জন্য দাঁড়াবেন। (২) আগামী শরৎকালে আপনার পাড়ার একটি বড় পণ্যদ্রব্যের দোকানে ধর্মঘট হবে। (৩) আগামী সপ্তাহে আপনার স্ত্রী তাঁর কেশ-বিন্যাস বদলাবেন বলে জানাবেন। (৪) কাল আপনার ছোট ছেলেটি নাক ভেঙে রক্তাক্ত হয়ে বাড়ি ফিরবে। একজন বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ স্থান-কাল ও আনুষঙ্গিক সমস্ত পরিবেশের বিবেচনার উপর নির্ভর করে এই ঘটনাকে গ্রহণ করবেন। এই পরিবেশ সৃষ্টিতে তার নিজের অভিজ্ঞতা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ভয়-ভীতির অংশ থাকবে। কিন্তু এমন অনেক লোক আছে যাদের প্রতিক্রিয়ার ধারাটা এমন ছকে বাঁধা যে তাদের উপর ঘটনার প্রভাবটা কেমন হবে আগে থেকে বলে দেওয়া যায়। শ্রী"ক" সমাজতন্ত্রবাদীকে কিছুতেই ভোট দেবেন না, বিকল্প পদপ্রার্থী অযোগ্য ও অসৎ হলেও নয়। শ্রী"গ" ধর্মঘট বিরোধী। অতএব ধর্মঘটের যথার্থ কারণ আছে কিনা তা তাঁর জানবার প্রয়োজন নেই। অন্যদিক শ্রী"চ" মালিকদের ঘৃণা করেন অতএব ধর্মঘট তিনি সমর্থন করবেনই। শ্রী"ন" ঐতিহ্যগত ফ্যাশান পছন্দ করেন। তাঁর স্ত্রী তাই স্কুল ছাড়ার পর কেশ-বিন্যাসের ধারা বদলাতে পারেন নি। শ্রী"প" রক্তারক্তি দেখলেই অজ্ঞান হয়ে পড়েন।

এই রকম স্থির ও অপরিবর্তনীয় প্রতিক্রিয়ার ধারা, যার কতকগুলি অত্যন্ত স্পষ্ট রূপকে আমরা কুসংস্কার বলি, তা প্রায় অপরিহার্যভাবে ভাষার সঙ্গে জড়িত। শ্রী"ম" ক্যাথলিক পদযুক্ত মানুষ মাত্রকেই ভয় ও অবিশ্বাস করেন ও শ্রী"র" যে ক্যাথলিক নয় তাকে বিশ্বাস করেন না। শ্রী"থ" এমন গোঁড়া "রিপাবলিকান" যে তাঁর কাছে "ডেমোক্র্যাটদের" সবকিছুই খারাপ লাগে। ফ্র্যাঙ্কলিন ডি, রুজভেল্ট যখন মার্কিন রাষ্ট্রপতি হন, শ্রী"থ" শুধু যে ডেমক্র্যাট রাষ্ট্রপতিকেই সহ্য করতে পারতেন না তা নয়, তিনি রাষ্ট্রপতির পত্নী, পুত্র, এমনকি তাঁর কুকুরটাকেও সহ্য করতে পারতেন না। শ্রী"থ" এর আপিস ছিল থিওডর রুজভেল্টের নামে রুজভেল্ট রাস্তার উপর। এইজন্য তিনি তাঁর আপিসের ঠিকানা পিছনের দরজা যে রাস্তায় সেই রাস্তার নম্বর পরিবর্তন করেন। অন্যদিকে "খ" মহাশয় এমন পাকা ডেমোক্র্যাট যে আইসেনহাওয়ারের প্রিয় গল্‌ফ খেলাটা ছাড়তে পারছেন না বলে নিজের প্রতি তাঁর অশ্রদ্ধা জন্মে গেছে। এমন কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের মাথায় নিশ্চয়

একটা বিচ্ছেদহীন জায়গা আছে যেখানে "ধনতন্ত্র", "মালিক", "ধর্মঘটকারী", "বেকার", "ডেমোক্র্যাট", "রিপাবলিকান", "সমাজ নিয়ন্ত্রিত ঔষধ", ইত্যাদি তড়িৎপূর্ণ শব্দের ছোঁয়া লাগান হঠাৎ একটা সর্ট সার্কিট ( Short Circuit ) ঘটে, ফিউজ তারগুলো জ্বলে যায়।

সাধারণ শব্দার্থতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা এলফ্রেড করজিবস্কি এমন বিস্ফোরণ রূপ প্রতিক্রিয়ার নাম দিয়েছিলেন, "একাত্মকরণ আচরণ"। তিনি "একাত্মকরণ" শব্দটিকে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেন। তাঁর মতে যে মানুষের প্রতিক্রিয়াগুলি এমনভাবে ছকে বাঁধা সে একটা শব্দ বা সঙ্কেতের সমস্ত অর্থটাকেই এক করে দেখে; একই নামের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ঘটনাগুলিব একীকরণ করে বসে। এইজন্য, কারও স্ত্রীলোক মটরগাড়ি চালকের সম্বন্ধে বিরোধী প্রতিক্রিয়া থাকলে সব স্ত্রীলোক-চালকই তার চোখে সমান অপটু মনে হয়।

করজিবস্কির মতে শব্দার্থতত্ত্বগত অপরিণত ব্যবহারেব বেশীর ভাগ দৃষ্টান্তকে "একাত্মকরণ আচরণ" নীতি দিয়ে বোঝান সম্ভব। মানুষের স্নায়ুব এলাকায় এই "একাত্মকরণ" পদ্ধতিটা অনবরত কাজ কবে চলেছে। বাইরের জগতে সর্বতোভাবে এক বলতে কিছু নেই। কোনও দু'জন হর্ভাডেব লোক, কোনও দুটি ফোর্ডগাডি, কোনও দু'জন শাশুড়ী বা রাজনীতিবিদ সবদিক দিয়ে এক নয়। অতএব গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এক নামযুক্ত সব কিছুকেই যদি সমান মনে করি তাহলে আমাদের শব্দার্থঘটিত আচরণে নিশ্চয় কোন দোষ আছে।

এখন আমরা সাধারণ শব্দার্থতত্ত্বের আর একটি সংজ্ঞায় পৌছতে পারব। এই সংজ্ঞায় শব্দার্থতত্ত্ব হল সঙ্কেত ও প্রতীকের প্রতি মানুষের যে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া তার একটা তুলনামূলক আলোচনা। যারা কুসংস্কারপূর্ণ, নির্বোধ ও মানসিক দিক দিয়ে অসুস্থ তাদের শব্দার্থঘটিত আচরণের সঙ্গে যারা নিজেব সমস্যাগুলি সমাধান করতে সক্ষম তাদের ব্যবহারের তুলনা করে আমরা আমাদের আচরণকে উন্নত করতে পারি। অর্থাৎ ইচ্ছা করলে শব্দার্থতত্ত্বকে আমাদের মূর্খতা দূর করার কাজে লাগাতে পারি।

প্রকৃতির সর্বত্র "একাত্মকরণ আচরণের" পরিচয় পাওয়া যায়। জীবজগতে "একাত্মকরণ" প্রাণধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয়। বাণমাছ যে কোনও চকচকে জিনিসকে নড়তে-চড়তে দেখলেই তা পুঁটিমাছ বলে ধরে নেয় ও তাকে খেতে যায়। এই বাঁধাধরা প্রতিক্রিয়ার জন্যই সাধারণত বাণমাছ জীবন

ধারণ করতে পারে। কখনও কখনও ওই চকচকে জিনিসটা পুঁটিমাছ না হয়ে ছিপের আগায় বাঁধা একটা কৃত্রিম ফাঁদ হতে পারে। এমন ক্ষেত্রে একটা জটিল অবস্থায় পার্থক্যবোধের ক্ষমতা না থাকাটা. সত্যের কারণ হতে পারে।

আবার মানুষের আচরণের বিচারে ফিরে এলে দেখতে পাই যে বাণমাছের চেয়ে মানুষের পার্থক্য বোধের সমস্যাটা ঢের বেশী জটিল। বাণমাছকে যে সঙ্কেত মেনে চলতে হয় তার তুলনায় আমরা যে সঙ্কেতে চলি বা প্রতীক সৃষ্টি করে তার প্রতি আমাদের প্রতিক্রিয়াগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করতে শিখি সেগুলি সংখ্যায় অনেক বেশী ও প্রকৃতিতে অনেক বেশী ভাবগত ও অবিশেষ। নিচু স্তরের প্রাণীকে তাদের প্রাকৃত পরিবেশের কয়েকটি মাত্র কঠিন সত্যের সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু মানুষের পরিবেশের কথাটা একবার চিন্তা করে দেখুন। এখানে এমন সব প্রতীককে নিয়ে আমাদেব কাজ করতে হয় যা নিচু স্তরের জীবের বিচার করবার কখনও প্রয়োজনই দেখা দেয় না। আমাদের দিনগুলির নাম আছে, সংখ্যা আছে—আমাদের জন্মদিন আছে, ছুটির দিন আছে, শতবার্ষিকী আছে। এর প্রত্যেকটির জন্য একটা নির্ধারিত আচরণের প্রয়োজন আছে। আমাদের ইতিহাস আছে, যা নিয়ে অন্যান্য জীবের কখনও মাথা ঘামাতে হয় না। ভাষায় বাঁধা কতকগুলি নিয়ম আমাদের মেনে চলতে হয় যাকে আমরা বলি আইন, ধর্ম বা নীতি। শুধু যে পরিবেশগত ঘটনা সম্বন্ধে আমাদের সজাগ হতে হয় তাই নয়, ওয়াশিংটন, পারী, টোকিও, মস্কো, বাইরুতে যে ঘটনা ঘটছে সে সম্বন্ধেও আমাদের প্রতিক্রিয়া জাগে। আমাদের সাহিত্য আছে, হাস্যরসের ছড়া আছে, আত্মস্খালনের পত্র-পত্রিকা আছে, আছে বাজার দর, গোয়েন্দা কাহিনী, মনোবিকারের সম্বন্ধে সাময়িক পত্রিকা ও হিসাব রাখার পদ্ধতি। আমাদের টাকা, ঋণ, ব্যাঙ্ক, শেয়ার, প্রতিশ্রুতির দলিল, চেক ও বিলের সমস্যা আছে। চলচ্চিত্র, চিত্রশিল্প, নাটক, সঙ্গীত, স্থাপত্য ও বেশ-বিন্যাসের জটিল সঙ্কেতময়তা নিয়ে আমাদের বিচার-বিবেচনার প্রয়োজন হয়। সংক্ষেপে বলতে হলে আমাদের জীবনের আয়তন এত বড় যে তা নিচু শ্রেণীর জীবের ধারণার অতীত এবং এই বৈচিত্র্যের অনুরূপ আমাদের পার্থক্য-বোধের ক্ষমতা থাকা চাই।

এখন প্রশ্ন উঠবে আমাদের পার্থক্যবোধের ক্ষমতাটা সকল ক্ষমতার সম্মুখীন হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট হয় না কেন? কোন জিনিসের মধ্যে মিল

ও অমিল দুটোই দেখবার চেষ্টা না করে আমরা এমন ভাবি কেন যে সব সৈনিক ( কিম্বা সব মেক্সিকোবাসী, বেসবল খেলোয়াড় বা স্ত্রীলোক চালক ) সমান? এক একটা শব্দের যেন একটিই অর্থ হয় এমনভাবে মানুষ ব্যবহার করে কেন? ব্যক্তির মধ্যে ও জাতির মত ব্যক্তি সমষ্টির মধ্যে কয়েকটি প্রতিক্রিয়ার ধারা তার উপকারিতা শেষ হয়ে যাবার পরেও নিঃশেষ হয় না কেন?

কতকগুলি "একাত্মকরণ প্রতিক্রিয়া" আত্মরক্ষার পদ্ধতি ছাড়া আর কিছু নয়। এই প্রক্রিয়াগুলি জীবনের প্রাচীন ও আদিম অবস্থায় জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ছিল ও সেইগুলিই আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। একদিন অন্ধকার একটি রাস্তায় দুটি লোক আমায় মেরে আমার যা কিছু ছিল কেড়ে নিয়েছিল। অনেকদিন পরে দুটি বিশেষ বন্ধুর সঙ্গে আমি আবার অজ্ঞাতসারে একটা অন্ধকার রাস্তায় এসে পড়ে আমার মনের দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়ার ভয়ে তাড়াতাড়ি একটা আলোকিত দোকানে সোডা খাওয়ার জন্য উৎসুক হয়ে পড়লাম। অর্থাৎ ওই দুই বন্ধুর সম্বন্ধে আমার কোনও ভয় নেই মনে জেনেও আমার সমস্ত অঙ্গ ভয়ার্ত "একাত্মকরণ আচরণে" বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। সৌভাগ্যবশত সময়ে এই প্রতিক্রিয়ার হাত থেকে আমি রেহাই পেয়েছিলাম। কিন্তু শৈশবের অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতার স্মৃতি অত সহজে মরে না। মনোরোগের চিকিৎসকেরা প্রমাণ করেছেন যে আমাদের বহু "একাত্মকরণগত আচরণের" মূলে রয়েছে শৈশবের আঘাতের স্মৃতি।

"একাত্মকরণ আচরণের" আর এক উৎস হল গোষ্ঠীগত আচারের ধারা যা কোন এক সময়ে জাতির জীবনে প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছিল। "সাপ দেখা মাত্রই মেরে ফেল," "গরু পবিত্র জীব তাকে মারবে না", "বিদেশী দেখা মাত্রই গুলি চালাও", "অভিজাত বাড়ির লোক দেখলেই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কর", ও অধুনা "রিপাবলিকানদের কখনও ভোট দিও না," "ব্যবসায় ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপ সহ্য কর না," "নিগ্রোদের সমান হিসাবে কখনও ব্যবহার কর না", ইত্যাদি সাধারণ বাক্যই "একাত্মকরণ আচরণের" একটা মূল কারণ।

কয়েকজন মানুষ, ব্যক্তিগত অনুভূতির দিক দিয়ে বোধহয় বেশীর ভাগ মানুষ, ওই নির্দেশগুলি স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারেন। অর্থাৎ অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন ঘটলে গো-হত্যা জমিদারকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করা,

রিপাবলিকানকে ভোট দেওয়া ও নিগ্রোকে সহপাঠী হিসাবে দেখা সম্বন্ধে যে নির্দেশ রয়েছে তা তারা স্বীকার না করতে পারেন। কিন্তু অন্য লোকের মধ্যে, স্নায়ুতন্ত্রে এই সংস্কারগুলি এমন নিগূঢ়ভাবে গেঁথে যায় যে অবস্থার যেমন পরিবর্তনই হ'ক, তাঁরা তাঁদের প্রতিক্রিয়াগুলি বদলাতে পাবেন না। আবার এমন লোক আছেন যাঁরা তাঁদের প্রতিক্রিয়া ধারা বদলাতে পারলেও লোক-নিন্দার ভয়ে তা করেন না। সাধারণত সামাজিক উন্নতির জন্য এই স্থির একাত্মকরণ অভ্যাস ত্যাগ করা দরকার হয়। সামাজিক ব্যবহারের বাঁধাধরা নিয়ম থাকবেই, ব্যক্তির কতকগুলি অভ্যাস থাকবেই। কিন্তু যখন প্রয়োজনে এর পরিবর্তন করতে পারি না, যখন অসভ্য উপজাতির কাছে দুর্ভিক্ষ রোধের একমাত্র প্রতিক্রিয়া হয় কুমীরের গ্রাসে শিশু-উৎসর্গ, যখন নিরাপত্তার একমাত্র উপায় হয় অস্ত্র-শস্ত্রের ক্রমবৃদ্ধি তখন বিপদ ঘটে। এক্ষেত্রে পার্থক্যগত ব্যবহারের অভাব দেখা যায়।

এ ছাড়া সংবাদপত্র, বেতার ও টেলিভিশানের মত জন-সংযোগের মাধ্যম যদি অনবরত "সাম্যবাদী," "আমলাতন্ত্রবাদী", "ওয়াল স্ট্রীট", "আন্তর্জাতিক মহাজন", "শ্রমিক নেতা", ইত্যাদি শব্দ সম্বন্ধে বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করতে থাকে, তাহলে স্থান-কালগত কোনও দুর্নীতির তারা সংস্কার করতে পারলেও, শেষ পর্যন্ত হাজার হাজার পাঠক ও শ্রোতাদের মধ্যে তাঁরা "একাত্মকরণ আচরণের" সৃষ্টি করবেন, যে আচরণ বুদ্ধি-বিচার সম্মত আলোচনা অসম্ভব করে তুলবে। জন-সংখ্যায় ও প্রচারের আধুনিক মাধ্যম "একাত্মকরণ আচরণ" সৃষ্টি করছে তাতে সন্দেহ নেই।

"একাত্মকরণ আচরণের" আর একটি উৎস হল দিনগত চিন্তা ও বাক্যে ব্যবহৃত আমাদের ভাষা। এ ভাষা বিজ্ঞানের মত বিশেষ উদ্দেশ্যগত, মাপাজোকা, সাবধানে বাছাই করা শব্দ-সমষ্টি নয়। এ ভাষা গড়ে উঠছে সেদিনের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিহীন আমাদের এংলো স্যাকসন, আদিম জার্মান, আদিম ইন্দো-ইউরোপীয় পূর্ব পুরুষদের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বিশৃঙ্খল ও প্রতিদিনের কথাবার্তার উপর। জগত সম্বন্ধে তাদের সীমিত জ্ঞানের উপর নির্ভর করে তারা বলেছিল "সূর্য ওঠে"। আমরা আজ জানি সূর্য ওঠে না। কিন্তু যা বলি তাতে বিশ্বাস না করে সেই একই কথার ব্যবহার করি।

কিন্তু অন্যান্য কথাও আছে যা "সূর্য ওঠার" ধারণার মতই মিথ্যা, কিন্তু যা না বুঝে, যাকে সত্য মনে করে আমরা ব্যবহার করে থাকি।

কেউ হয়তো দেখেছেন বা শুনেছেন যে নিগ্রোরা অলস, এর সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত করে বসেছেন যে নিগ্রোমাত্রই অলস। এই কথার সত্যাসত্য বিচার না করে এর বিভিন্ন অর্থটা বোঝবার চেষ্টা করা যাক। সহজ বুদ্ধি ও তর্কশাস্ত্রের উপর একটা সাধারণ পাঠ্যপুস্তকের বই থেকে জানতে পারি, এই উক্তির তাৎপর্য হল নিগ্রোদের মধ্যে অলসতা প্রকৃতিগত।

এখন তথ্যের বিচার করা যাক। দাসপ্রথার যুগে যখন নিগ্রোদের শ্রমের মূল্য দেওয়া হত না, তখন তাদের বিশেষভাবে পরিশ্রমী ও দায়িত্বশীল হয়ে ওঠার সার্থকতা ছিল না। বিখ্যাত বিমূর্ত ভাবের ফরাসী চিত্রশিল্পী জঁা হেলিয়ঁ ( Jean Helion ) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে জার্মান শিবিরে কয়েদী হয়ে বাধ্যতামূলক শ্রমের অভিজ্ঞতার গল্প করেন। কাজে ফাঁকি দেওয়া, গল্প-গুজব করে সময় নষ্ট করা তখন তাঁর অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল এবং হাঁস-মুরগী পালনের জায়গায় কাজ করার ফলে মুরগী চুরির অভ্যাসটাও তাঁর রপ্ত হয়ে উঠেছিল। নাৎসী তদারককারীর সামনে তিনি কেমন করে ভাল মানুষ হবার ভাব করে থাকতেন তার বর্ণনাও তিনি দিয়েছেন। নিজের অজ্ঞাতসারে তার নিজের ব্যবহারের ছবির মধ্যে দাসত্ব-যুগের আমেরিকার দক্ষিণী নিগ্রোদের একটা নিখুঁত সাহিত্যগত "টাইপ" চরিত্র তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। বাধ্যতামূলক শ্রমের সম্মুখীন হয়ে জঁা হেলিয়ঁর যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল দক্ষিণ প্রদেশস্থ নিগ্রো দাসেদের মনেও তেমনি প্রতিক্রিয়া জাগা স্বাভাবিক। অলসতা অতএব কারও প্রকৃতিগত গুণ নয়। এ কাজের বিশেষ পরিবেশগত একটা প্রতিক্রিয়া যে পরিবেশে শ্রমের মূল্য পাওয়া যায় না, যে পরিবেশ কর্মকর্তাদের প্রতি ঘৃণা জাগায়।

"নিগ্রোরা অলস", "আজকালকার ছেলেরা অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেছে" ইত্যাদি কথার মধ্যে যে প্রকৃতিগত নিগুর্ণতার ইঙ্গিত আছে, তাকে বিজ্ঞানের দিক থেকে স্বীকার করা যায় না। "সূর্য ওঠে" উক্তি যে মনোভাবের প্রকাশ করে এতেও তেমনি অবৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির পরিচয় দেখতে পাই। দুঃখের বিষয় এই যে আমরা এসব কথা শুধু যে বলি তাই নয়, তাতে আমরা বিশ্বাস করি।

কতক লোকের আমরা প্রশংসা করি কারণ তারা সাদাকে সাদা ও কালোকে কালো বলতে ভয় পায় না। আমরা যদি প্রশ্ন করি যে কালোকে কালো বলব কেন? তার হয়তো উত্তর হবে সেটা সত্য বলে। সহজ বুদ্ধির দিক থেকে উত্তরটা আমাদের ভাল লাগে ও তারপর আর কোনও আলোচনার

দরকার বুঝি না। কিন্তু পাঠককে একটা জিনিস বিচার করে দেখতে বলি যদিও আমার প্রশ্নটাকে প্রথম দৃষ্টিতে কথার মারপ্যাচ বলে মনে হবে।

ধরা যাক মাটি খোঁড়ার জন্য কাঠের হাতল দেওয়া ইস্পাতের তৈরি একটা জিনিস যাকে ইংরাজীতে বোঝাতে আমরা জিহ্বা, ঠোঁট ও স্বরনালী দিয়ে "spade" কথাটার উচ্চারণ করছি। কিন্তু আমরা যদি ওলন্দাজ, ফরাসী, হাঙ্গেরীর অধিবাসী, চৈনিক ইত্যাদি লোককে কথাটা বোঝাতে চাই তাহলে আমাদের ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করতে হবে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে আমাদের সহজ বুদ্ধিগত ইংরাজী উক্তি "We call a spade a spade because that's what it is" সম্পূর্ণ ভুল। আমরা "spade"কে "spade" বলছি কারণ আমাদের ভাষা ইংরাজী। মাটি খোঁড়ার জন্য ইস্পাতের তৈরি হাতিয়ারটা গ্যারাজের দরজার গায়ে রাখা জিনিসটা ছাড়া আর কিছুই নয়। ইংরাজীতে একে আমরা "spade" বলি ; "spade" এখানে একটা নাম।

"একাত্মকরণ প্রতিক্রিয়ার" আর একটি উৎসের এখানে খোঁজ পাই। এ হল ভাষার সম্বন্ধে একটা ধারণা যার অল্প কথায় প্রকাশ দেখি "কোদাল একটি কোদাল" উক্তিতে, কিম্বা আরও ভাল, শুয়োরকে শুয়োর বলা হয় কারণ তারা অত্যন্ত নোংরা। আমরা ধরে নিয়েছি যে প্রত্যেক জিনিসের যথার্থ নাম দেওয়া হয়েছে আর ওই নামের মধ্যে সেই জিনিসের রূপটা ব্যক্ত হয়েছে।

আমাদের প্রতিক্রিয়ার ধারায় এই ধারণাটা কাজ করলে আমাদের আচরণটা প্রায়ই অপরিণত অযথার্থ হয়ে দাঁড়াবে। নামের মধ্যে ব্যক্তি, বস্তুর ও অবস্থান প্রকৃত রূপটা ফুটে ওঠে এই ধারণায় আমরা কাজ করব। যদি বলি এই লোকটি ইহুদী, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ বলবেন, "আর আমার জানবার দরকার নেই।" কারণ নামের মধ্যেই যদি কারও প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহলে প্রত্যেক ইহুদীর মধ্যে ইহুদীপনাটাই প্রধান গুণ। উল্টোভাবে বলতে পারি ইহুদীর ইহুদীপনার জন্যই তার নাম ইহুদী। এই ধারণাগত কাজের আর একটি দৃষ্টান্তের পরিচয় পাই যখন দেখি আমার শিক্ষা ক্যানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রে হওয়া সত্ত্বেও আমার সম্বন্ধে কখনও কখনও বলা হয় যে আমার মনটা প্রাচ্যের। বুদ্ধ, কনফ্যুসিয়াস, জেনারেল টোজো, মাও শে-তুঙ, সিগম্যান রী, পণ্ডিত নেহেরু ও Golden Pheasant chop

Suey House-এর মালিক, সকলেরই মনটা যখন প্রাচ্যের তখন আমার সম্বন্ধে ওই কথাটার যে ঠিক কি অর্থ তা বুঝি না। প্রাচ্যের মনটা যতটা মিথ্যা ইহুদীর ইহুদীপনাটাও ততখানি মিথ্যা। তবু দেখি সাংবাদিকরা যখন লেখেন যে স্টালিনের আচরণের জন্য দায়ী তাঁর প্রাচ্য মন যেটা তিনি পেয়েছেন তাঁর জন্মস্থান জর্জিয়া থেকে যে জর্জিয়া তুরস্ক ও আজারবাইজানের নিকটে রয়েছে তখন তাঁরা তাঁদের এই গবেষণার জন্য টাকা পেয়ে থাকেন।

প্রতিদিন আমরা যেভাবে কথা বলি ও শব্দ ও বস্তুর সম্বন্ধের বিষয় যে ধারণা পোষণ করি তার থেকে আমাদের মধ্যে একটা একাত্মকরণ আচরণগত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এই প্রতিক্রিয়ার ফলে আমাদের মনে হয় একটি "নামের" সম্বন্ধে আমাদের মনে একই রকম প্রতিক্রিয়া জাগা উচিত। এই হিসাবে সব "জীবনবীমার দালাল" বা "কলেজের ছাত্র" বা "রাজনীতিবিদ", "উকিল" বা "টেক্সাসবাসী সমান। এই একাত্মকরণ প্রতিক্রিয়ার সম্ভব-হীনতা বুঝতে পারলে আমাদের চিন্তার ধারাটা পরিষ্কার হয়ে যায়। যে কোন দু'জন টেক্সাসবাসী সমান নয়, যে কোন দুটি কলেজের ছাত্র এক নয়। টেক্সাসবাসী ও কলেজের ছাত্রর ছবিটির সঙ্গে তোমার ধারণা মিলতে পারে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই মেলে না। বস্তু ও বস্তুকে বোঝাতে যে শব্দ ব্যবহার করা হয় তাদের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারলে, আমাদের চোখে দুটি জিনিসের বিভিন্নতা ও অভিন্নতা দুই ধরা পড়ে। বৈজ্ঞানিক চিন্তার জন্য এমন মিল ও অমিল দেখার অপরিহার্য প্রয়োজন আছে।

শব্দার্থ ঘটিত প্রতিক্রিয়ার সংশোধনের জন্য করজিবস্কি একটি সহজ ও মূল্যবান রীতির উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন $ক_১$, $ক_২$ নয়, এই সূত্রে প্রত্যেকটি বাক্যকে একটা অনুক্রমণী চিহ্নে (Index number) চিহ্নিত করা উচিত। প্রতিদিনের ভাষায় এর পরিভাষা দাঁড়াবে $গরু_১$ $গরু_২$এর সমান নয়, $টেক্সাসবাসী_১$ $টেক্সাসবাসী_২$ এর সমান নয়, ইত্যাদি। অর্থাৎ শুধু গরু ও টেক্সাসবাসী সম্বন্ধে চিন্তা না করে বিভিন্ন গরু ও বিভিন্ন টেক্সাসবাসীর সম্বন্ধে চিন্তা করতে হবে।

শব্দের সঙ্গে অনুক্রমণী চিহ্ন যোগ করলেই যে আমাদের সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে তা নয়। কিন্তু এখান থেকে আমরা শুরু করতে পারি। কথা বলবার ও লেখবার সময় যদি অনুক্রমণী সংখ্যা যোগের অভ্যাস করি তাহলে সাধারণভাবে চিন্তা করার রীতিটা আমরা ক্রমশ ত্যাগ করতে পারব।

এই অভ্যাসের ফলে আমরা কথা বলার আগে বস্তু ঘটনা ও অবস্থান সম্বন্ধে চিন্তা করতে শিখব, শব্দগত সম্বন্ধকে এড়িয়ে চলতে পারব। যখন কিছু পড়ব বা শুনব তখন এই চিহ্ন ব্যবহার করার ফলে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হবে, সব কিছুকে মূর্ত করে দেখতে পাব। এই চিহ্নিত করার অভ্যাসের ফলে অন্তত কখন কখন কপট বাগাড়ম্বরের সারহীনতাটা ধরতে পারব ও বাণ-মাছের মিথ্যা পুঁটিমাছ ধরার মত নিজেকে বিপন্ন করব না।

শেষে ওয়েনডেল জনসনের ( Wendell Johnson ) কথা দিয়ে আমার বক্তব্যের সারমর্মটা বোঝাতে পারি: "ইঁদুরের কাছে পনির পনির, এইজন্যই ইঁদুরকল কার্যকরী হয়।"

# বিমূর্ত ভাবগত কলা-শিল্পের সমর্থনে

## ক্লেমেণ্ট গ্রীনবার্গ

ক্লেমেণ্ট গ্রীনবার্গের মত আধুনিক কলা-শিল্পের এত বড় সমর্থক অল্পই আছেন। গ্রীনবার্গ নিজে একজন চিত্রশিল্পী ও সমালোচক। "Nation, The Partisan Review" ও "Commetary" পত্রিকায় তাঁর বহু লেখা প্রকাশ করেছেন ও ওই তিনটি কাগজেরই সম্পাদকগোষ্ঠীর তিনি সভ্য ছিলেন। বর্তমানে তিনি নিউইয়র্কে চিত্র ও প্রাচীন যুগের মূর্তি ইত্যাদির ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান "ফ্রেঞ্চ ও কোম্পানীতে" সমসাময়িক শিল্প বিষয়ে উপদেষ্টার কাজ করছেন। ১৯৫৮-৫৯ সালে প্রিন্সটনে তিনি একটি শিল্প সমালোচনা সভার ব্যবস্থা করেন। মিরো ও মাতিস (Miro and Matisse) সম্বন্ধে তাঁর কয়েকটি বই আছে। তিনি স্বর্গত মার্কিন বিমূর্ত অভিব্যক্তিবাদী জ্যাকসন পোলক (Jackson Pollock) সম্বন্ধে একটি বই লেখায় ব্যস্ত।

অনেকেই বলেন আজকের যুগের বিকারের একটি প্রধান লক্ষণ দেখা যায় আধুনিক শিল্পকলায়। চিত্রশিল্পে ও ভাস্কর্যে বোধগম্য মূর্তিগুলি যে উচ্চ সাহিত্যের অস্পষ্টতার মত বিচ্ছিন্ন ও ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে সেটা আমাদের সমাজ-মূল্যবোধের বিচ্ছিন্নতারই পরিচয় দেয়। অনেকে আবার আরও বলেন যে বিমূর্ত ভাবগত বিপ্রতীক শিল্প বিকৃত ও বিকারগ্রস্ত। যাঁরা এমন শিল্পের স্রষ্টা ও যাঁরা এমন শিল্পের প্রেমিক তাঁরা নিজেরাই অসুস্থ কিম্বা নির্বোধ। খুব সহৃদয় সমালোচকেরা বলেন আধুনিক সাহিত্য শিল্প ও বিশেষ করে বিমূর্ত-ভাবের শিল্প একটা রসিকতা, ধাপ্পা ও খেয়াল। এ রেওয়াজটা অল্পদিনের মধ্যেই অপ্রচলিত হয়ে পড়বে। এ ধরণের মন্তব্য প্রায় নিয়মিতই শোনা যায়। কিন্তু কখন কখন সমালোচনার তীব্রতাটা বেড়ে যায়।

"আধুনিক শিল্পের জনপ্রিয়তার অগ্রগমনে ও তার বিরুদ্ধে আক্রমণের ধারায় একটা ছন্দ দেখা যায়। সাধারণত এই বিতর্কে একই বিষয় ও যুক্তির অবতারণা করা হয়, কিন্তু আক্রমণের লক্ষ্যটা বদলে যায়। কখনও ভাবরূপবাদীরা (Impressionist) আমাদের কলঙ্কের কারণ হন, তারপর ভ্যান গগ্ ও সেজান্ এঁদের লক্ষ্য হন, তারপর মাতিস ও পিকাসো ও তাঁর

কিউবিজম ( Cubism ) বা জ্যামিতিক রেখাঙ্কিত ছবিকে আক্রমণ করা হয়। এখনকার বিষয় হয়েছেন জ্যাকসন পোলক। পোলক একজন মার্কিন। এর থেকে পরোক্ষভাবে প্রমাণ হচ্ছে যে মার্কিন চিত্রশিল্প কত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আধুনিক কলাশিল্প ও বিশেষ করে বিমূর্ত ভাবাত্মক শিল্পের সমালোচকদের মধ্যে অনেকে অনুযোগ করেন গত যুগে যে নিঃস্বার্থ ধ্যান কল্পনা ও বস্তুকে বস্তু হিসাবে ও শুধু তারই জন্য উপভোগ করার শক্তি ছিল তা আজ আমরা হারিয়ে ফেলছি। এই ধারণার কথাটা এতবার বলা হয়েছে যে তা একটা একঘেয়ে বুলি হয়ে উঠেছে। সাধারণত এমন প্রচলিত বুলিতে আমি বিশ্বাস করি না, কারণ এতে জটিল বিষয়কে অত্যন্ত লঘু করে ফেলা হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে একটা ব্যতিক্রম স্বীকার করব। যদিও আগেকার দিনে নিঃস্বার্থ ধ্যান-কল্পনা যতটা জনপ্রিয় ও বিশুদ্ধ ছিল বলা হয় ততটা ছিল কিনা তাতে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে, তবু আজকের দিনে বিশেষত এদেশে ( আমেরিকায় ) এমন ধ্যানের যে দরকার আছে তা স্বীকার করতে বাধা নেই।

কোন উদ্দেশ্যে নয়, শুধু এমনই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখা, বসে বসে শোনা, স্পর্শ, গন্ধ ও চিন্তার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলায় যে আনন্দ তা যদি উপভোগ করতে না পারি তবে আমার মতে জীবনটা রিক্ত হয়ে যায়। কিন্তু আমরা জানি পশ্চিমের ও বিশেষ করে মার্কিন জীবনের আবহাওয়া এমন উপভোগের পক্ষে খুব উপযোগী নয়; আমরা জীবনধারণের জন্য সর্বদা ব্যস্ত। এও একটা অতি প্রচলিত বুলি। আর একটা এমন বুলি হল সুন্দরকে সুন্দর হিসাবে গ্রহণ করা, ধ্যান-ধারণার রীতি ও আধ্যাত্মিক জীবনযাপনে বেশী সময় কাটানো ইত্যাদি শিখতে হলে আমাদের প্রাচ্যের দিকে তাকাতে হবে। এটা শুধু একটা প্রচলিত কথাই নয়, অযথার্থ কথা। জীবনধারণের জন্য প্রাচ্যের লোককে আরও বেশী ব্যস্ত থাকতে হয়। যদি বলি প্রাচ্যের মানুষের মধ্যে ধ্যান ও সৌন্দর্যবোধের ক্ষেত্রে যে শৃঙ্খলা দেখা যায় তা বাইরের দুর্দশা ও শ্রীহীনতা না দেখার একটা পদ্ধতি মাত্র তাহলে আশা করি একটা সমস্যাকে অতি সহজ করার দোষে আমিও দোষী সাব্যস্ত হব না।

প্রত্যেক সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে আত্মশুদ্ধি ও আত্মশোধনের স্বয়ংক্রিয় কতকগুলি সামর্থ থাকে। বিশেষ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যদি আমাদের একদিকে বেশীদূর নিয়ে যায় তবে তার মধ্যেই এমন কিছু কাজ করতে সুরু

করে যা অন্যদিকে আমাদের সমান দূরে নিয়ে গিয়ে একটা সাম্যের সৃষ্টি করবে। পশ্চিমী ও বিশেষ করে মার্কিন সভ্যতায় পার্থিব বস্তু উপকরণের উৎপাদনে বেশী সময় নিয়োজিত হয় তাতে সন্দেহ নেই। উদ্দেশ্যমূলক, স্বার্থমূলক কাজের উপর সেখানে বেশী জোর দেওয়া হয়। প্রায়ই শিল্প-সাহিত্যে এর প্রকাশ দেখা যায়। তাতে গতি, ক্রমবিকাশ, সঙ্কল্প, সুরু, মধ্য ও শেষের উপর জোর পড়ে, সমাজের গতিত্ব বেশী গুরুত্ব পায়। পশ্চিমের সঙ্গীতের সঙ্গে অন্য কোনও দেশের সঙ্গীতের ও তার সাহিত্যের সঙ্গে অন্য দেশের সাহিত্যের তুলনা করলে দেখতে পাই এখানে প্লট ও গল্পের সামগ্রিক কাঠামোর জন্য যত চিন্তা শব্দের আলঙ্কারিক প্রয়োগ, চরিত্র ও বর্ণনা বৈভবের জন্য ততটা চিন্তা নেই। পশ্চিমের কবিতার তুলনায় চৈনিক ও জাপানী কবিতার গতি কত ধীর। স্থির হয়ে বসে পড়লে তা আমাদের কত বেশী আনন্দ দেয়। তেমনি অপশ্চিমী গল্পে ঘটনাবলীর অনিশ্চিয়তা অনেক বেশী, সেখানে ঘটনা কোনও যুক্তি-সিদ্ধির উদ্দেশ্য নিয়ে চলে না। আমাদের অত্যন্ত বাক্যালঙ্কার সম্বলিত গীতি-কবিতার সঙ্গে তুলনাতেও আরবী কবিতা অনেক বেশী গ্রন্থিযুক্ত ভাষার আবরণে আবৃত। অন্যদিকে প্রাচ্যের সঙ্গীতকে আমাদের অনেক বেশী একঘেয়ে মনে হয় না কি ?

এখন দেখতে হবে পশ্চিমী শিল্পে গতিশীলতার যে প্রাধান্য, যাকে অতিরিক্ত বলতে পারি কিনা জানি না, তাকে সীমিত বা শোধন করার জন্য ও তার ক্ষতিপূরণ হিসাবে অন্য কিছুর ব্যবস্থা আছে কিনা। পশ্চিমের জীবনেও স্বার্থ-সিদ্ধিগত কাজ পার্থিব উপকরণ সৃষ্টির জন্য যে বিকার দেখা যায় তারও কি কিছু ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা সেখানে নেই ? দ্বিতীয় প্রশ্নের এখানে উত্তর দিতে চেষ্টা করব না। কিন্তু শিল্পের ক্ষেত্রে একটা উত্তর আপনা থেকেই ক্রমশ দেখা দিচ্ছে, ও এই উত্তরের একটি অংশ হল, বিমূর্ত ভাবের শিল্প।

বিমূর্ত ভাবগত অলঙ্করণ প্রায় সার্বজনীন ও চৈনিক ও জাপানী হস্তাক্ষর আধা-বিমূর্ত। কিন্তু একমাত্র পশ্চিমে গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে বিমূর্ত চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্যের আবির্ভাব ঘটেছে। এগুলির সঙ্গে বিমূর্ত অলঙ্কারের তফাৎ এইখানে যে বিমূর্ত ভাবগত চিত্রশিল্প বা ভাস্কর্য একটি ব্যক্তিগত সৃষ্টি যা অন্য কিছুর উপর নির্ভর করে দাঁড়িয়ে নেই, নিজের অধিকারেই সম্পূর্ণ-ভাবে প্রকাশিত। বিমূর্ত শিল্পের ক্ষেত্রে নিঃস্বার্থ ধ্যান-কল্পনার শক্তির আরও বড় পরীক্ষা হয়। এই শিল্পের ক্ষেত্রে যে সচেতনতা দেখতে পাই

তা অন্য কোন শিল্পের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। সঙ্গীত তার প্রকৃতিতেই ভাবমূলক। কিন্তু "বাক্" ও মধ্য বয়সের সোয়েনবার্গের ( Schoenberg ) সঙ্গীতের মত তা যতই বিমূর্ত ও সূক্ষ্ম হ'ক, ভাবাত্মক চিত্রশিল্পের সচেতনতা ও ধ্যানদৃষ্টির সঙ্গে তারও ঠিক তুলনা হয় না। সঙ্গীতের সুরু আছে, মধ্য অবস্থা আছে, শেষ আছে। সাহিত্যের মত সঙ্গীতের পরিণতি আছে। অবশ্য সঙ্গীতের ও সাহিত্যের সামগ্রিক অভিজ্ঞতাটা সম্পূর্ণ স্বার্থহীন—কিন্তু এই স্বার্থহীন ভাবটা লাভ করতে হয় পরোক্ষভাবে। এই অভিজ্ঞতা লাভের সময় আমরা কিছু একটা আশাও করি আবার একই সঙ্গে নিরপেক্ষ হয়ে থাকি। আমার বক্তব্য হল এই যে সৌন্দর্য অনুভূতি নিঃস্বার্থ হতে বাধ্য। কিন্তু আমি তারও মধ্যে যে পার্থক্যের কথা বলেছি সেটাও সত্য।

প্রতিরূপ সৃষ্টির ভিত্তিক যে চিত্রশিল্প তা অনেকটা সাহিত্যের মত। একথাটা বারবার বলা হয়েছে ও বলা হয়েছে ওই পদ্ধতির নিন্দার জন্য। আমার মতে এমন সমালোচনা শুধু অযথার্থ নয় কিছুটা বোকামিরও পরিচায়ক। প্রতিরূপ সৃষ্টিমূলক চিত্রাঙ্কণ সাহিত্যের মত বলায় আমার উদ্দেশ্য ছিল এই যে এখানেও সময় ও কার্যধারার অন্তর্গত কতকগুলি রূপ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আমাদের মনে একই সঙ্গে স্বার্থজড়িত ও নিঃস্বার্থ ভাবের সৃষ্টি করা হয়। এ কথা একটা দৃশ্যের বা ফুলের বা মানুষ বা অন্যান্য জীবের গতিহীন ছবির বেলাতে খাটে। শুধু যে একটা ছবির আকর্ষণের সঙ্গে তার গুণের মাঝে মাঝে গোল করে ফেলি তা নয়, একটা চিত্রের সাফল্যের জন্য তার আকর্ষণের যে কোনও মূল্য নেই তাও নয়। কিন্তু আরও যেটা গুরুত্বপূর্ণ কথা তা হল সৃষ্টির অর্থটা যা সৃষ্টি করছি তার থেকে অভেদ্য। এই খানেই অর্থের সঙ্গে আকর্ষণের তফাৎ। রঁব্রঁ ( Rembrandt ) প্রথমে তার ছবির উজ্জ্বল অংশে রঙের পুরু প্রলেপের ব্যবহার করতেন। পরে তাঁর পোর্ট্রেটগুলিতে নাকের খাঁজে পুরু রঙের ব্যবহার করা হয় যাতে ওই মুখচ্ছবির শিল্প মূল্য আরও বেড়ে যায়। বিমূর্ত শিল্পের একটা পদ্ধতি হিসাবে এই পুরু রঙের প্রলেপের সার্থকতা ও বিশেষ আলোকপাতে নাকটিকে কেমন দেখায় রঙের প্রলেপে তা বোঝান যে একই সঙ্গে ঘটছে সেটাও এখানে একটা মূল কথা। আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা হল মুখের বাস্তব প্রতিকৃতির মধ্যে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে। রঁব্রঁর প্রতিকৃতিগুলিতে মানুষের চরিত্র সম্বন্ধে যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি দেখা যায় সেটাও লক্ষ্য করার বিষয়। চিত্রের সাফল্যের এই যে নানা দিক তার প্রত্যেকটির বিচার দরকার।

কিন্তু যেখানে বাস্তব প্রতিমূর্তি ও ব্যক্তিত্বের প্রশ্ন রয়েছে সেখানে নিঃস্বার্থতার রক্ষার জন্য দর্শকের যে দূরত্বটার প্রয়োজন সেটা বজায় থাকে না, যা থাকে বিমূর্তভাবের অলঙ্করণের ক্ষেত্রে। ভাবরূপবাদের ( impressionism ) প্রায় শেষ পর্যায় পর্যন্ত পশ্চিমী চিত্রশিল্পের মূল প্রবণতা ছিল দর্শকের সঙ্গে ছবির দূরত্ব ও নিঃস্বার্থ সম্বন্ধটাকে একটা অনিশ্চয়ের মধ্যে রাখা। আর কোন শিল্প-ঐতিহ্যে এমন ভাবে ভাস্কর্যের মত তৃতীয় আয়তনের বোধ সৃষ্টি ও আসলের অবিকল প্রতিমূর্তি তৈরি করার চেষ্টা দেখা যায় নি। এই সুস্পষ্টতা পশ্চিমের চিত্র-শিল্পকে প্রাচ্যের চিত্রশিল্পের চেয়ে ঢের বেশী জীবন্ত ও গতিশীল করেছে। পশ্চিমী শিল্পীর ছবিতে তাই যা দেখান হয় তার বাস্তব দিকটা দর্শকদের বেশী অভিভূত করে।

রঁব্রঁ যাদের প্রতিকৃতি এঁকেছেন ব্যক্তি হিসাবে তাদের সম্বন্ধে আমরা কি ভাবি ; করটের প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবিতে যে ভূখণ্ড দেখান হয়েছে, সেখানে হেঁটে বেড়াতে ইচ্ছা করে না কি ? স্টিনের চিত্রে স্বাধীন নগরবাসীর যে জীবন-গাথা রচিত হয়েছে সে সম্বন্ধে আমাদের কি ধারণা ? রেনেসাঁসের চিত্রশিল্পে যে ব্যক্তিদের আলেখ্য আঁকা হয়েছে তাদের সম্বন্ধে আমরা নির্বিকার ঔদাসীন্য বজায় রাখতে পারি না। আমরা ওই শিল্পের বাস্তব দিকটার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি। এই যে যোগ তা এমনিতে দোষের নয়, কিন্তু তা দুষ্ট হয়ে পড়ে যখন তা চিত্রের অন্য সব কিছুর প্রতি আমাদের দৃষ্টি ঝাপসা করে তোলে। এমন ফল আগেও দেখা গেছে, ও এখনও দেখা যাচ্ছে। শিল্পের সমঝদার অবশ্য এখনও হাওয়ার্ড চ্যাণ্ডলার খৃষ্টির (Howard Chandler Christie ) সুন্দর বালিকা মূর্তির চেয়ে ভেলাসকেজের (Velasquez) বামনের ছবি বেশী পছন্দ করেন। কিন্তু এই বোধ শিল্প-সমঝদারের মধ্যেই আবদ্ধ। তার বাইরে আর সকলে মক্স করার পদ্ধতির উপরেই বেশী জোর দেয়, তারা ছবির যেটা প্রতিমূর্তি গড়ার দিক সেইটাই পুথিঁগত ভাবে লক্ষ্য করে।

কিন্তু প্রত্যেক সংস্কৃতির ইতিহাসেই দেখা যায় তা এক চরমে পৌছে নিজের সাম্য রক্ষার জন্য বিপরীত দিকে আর এক চরমে গিয়ে পৌছয়। পশ্চিমের শিল্প-ঐতিহ্যে যখন প্রকৃতিবাদের চরম প্রকাশ ঘটল তখন একই সঙ্গে সেখানে চরম প্রকৃতিবাদ বিরোধিতা দেখা গেল। এই বিরোধিতার প্রথম পরিচয় পাই ভাবরূপবাদের মধ্যে ও পরে তাই বিমূর্ত ভাবের শিল্পের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। একথা বলতে চাই না যে বাস্তবধর্মী শিল্পের পথে বাধা সৃষ্টির জন্য কয়েকজন শিল্পী বিমূর্ত শিল্পের সূচনা করেন। বিমূর্ত ভাবগত শিল্পের সার্থকতা

বাস্তবধর্মী শিল্পের বিরোধিতায় নেই। এ কথাও বলতে চাইছি না যে বাস্তবধর্মী ও প্রস্তুতিবাদী শিল্পের এমন শোধকের দরকার ছিল। প্রথম ও বর্তমান আধুনিকতাবাদী শিল্পী প্রেরণা পেয়েছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন সূত্র থেকে। ভাবরূপবাদের প্রথম উদ্দেশ্য ছিল প্রকৃতিবাদের ব্যাপকতর বিকাশ। শিল্পের ইতিহাসে শিল্পসৃষ্টির ফলটি, উদ্দেশ্যকে প্রায়ই পাশ কাটিয়ে যায়।

আমাদের সংস্কৃতি-শোধক হিসাবে যে বিমূর্ত ভাবগত শিল্পের উদ্ভাবন করেছে তা জীবনেব মূল্য ও ইতিহাসের একটা একেবারে ভিন্ন, নৈর্ব্যক্তিক ও সাধারণ স্তরে দেখা দিয়েছে। এই স্তরে আপাতদৃষ্টিতে এই নূতন শিল্প নিঃস্বার্থ ধ্যানের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তার সবের সংক্ষিপ্তসার। যে সমাজে উদ্দেশ্যসিদ্ধি ও স্বার্থসিদ্ধিটাই প্রধান সেই সমাজের প্রতিযোগী ও বিরোধী এই শিল্প। এই স্তরে বিমূর্তভাবের শিল্প আমাদের কাছে স্বস্তি ও মুক্তির রূপে এসেছে। এ শিল্প স্বয়ংসম্পূর্ণ, নিজের অস্তিত্বের জন্য তাকে অর্থ ও উপযোগিতার উপর নির্ভর করতে হয় না। এবং আমেরিকায় যে এর প্রসার ঘটেছে তার যথেষ্ট কারণ অছে। মার্কিন সমাজ আজ শুধু উদ্দেশ্যমূলক কাজে ও জড়বস্তুর উৎপাদনে ব্যস্ত। অতএব এইখানে উদ্দেশ্যহীন কাজের একটা চূড়ান্ত বিপরীত দৃষ্টান্তেব প্রকাশটাই স্বাভাবিক, এমন কাজের প্রকৃতিটা বড় করে লোকের চোখের সামনে তুলে ধরা উচিত।

বিমূর্ত ভাবগত শিল্প বিরাট কল্পনার সাহায্যে অক্ষরে অক্ষরে এই উদ্দেশ্য সাধন করছে। প্রথমত এতে বাস্তব জীবনের যা কিছু পরিচিত তা বাদ পড়েছে, এখানে বস্তুত্বের ছায়া নেই, তাকে পরোক্ষভাবে ফুটিয়ে তোলারও চেষ্টা নেই। এই শিল্প এমন কোন কল্পিত স্থানের সন্ধান দেয় না যেখানে চর্মচক্ষু খুলে কিছু দেখব, এমন কোন বস্তুর কল্পনা করে না যা চাইব, এমন কোনও মানুষের কল্পনা করে না যার সম্বন্ধে পছন্দ-অপছন্দের প্রশ্ন উঠতে পারে। এখানে শুধু রঙ ও বিভিন্ন গঠনের, আকৃতির প্রকাশ দেখি। এই চিত্রশিল্পে বাস্তব জীবনের কোন কিছুর ছবি আঁকে না—যদি তার মধ্যে তেমন কিছু দেখি সেটা আমাদের দায়িত্ব। বিমূর্ত চিত্রশিল্পের সত্য উপভোগে এদের কোন প্রয়োজন নেই।

দ্বিতীয়ত চিত্রবহুল চিত্রের প্রধান পরিচয় তার স্থিতিশীলতায় যার মধ্যে দেশ-কালের গতিকে জয় করার চেষ্টা হয়। এ কথা বলতে চাই না যে দর্শকের চোখ ছবির উপর চলাফেরা করে না। সে হিসাবে দর্শক ছবির মধ্যেই দেশে-কালে ভ্রমণ করছে। যখন ছবির মধ্যে ব্যাপ্তির ধারণা ফুটে

ওঠে, তখন আমাদের দৃষ্টি এমনভাবে চলাফেরা করার আরও সুযোগ পায়। কিন্তু ছবি দেখার আদর্শ হল তা এক দৃষ্টিতে, এক লহমায় দেখা। ছবির মধ্যে যে ঐক্য আমাদের চোখে তার তৎক্ষণাৎ প্রকাশ ঘটা দরকার। এবং ওই ঐক্যের মধ্যে একটি চিত্রের যেটা সবিশেষ গুণ, দৃশ্যগোচর কল্পনাকে নাড়া দেবার ও সংযত করার অশেষ শক্তি, তার পরিচয় ফুটে ওঠা দরকার। এবং এই অনুভূতিটা অবিভেদ্য একটি মুহূর্তে আমাদের ধরা চাই। চিত্রশিল্পের সত্য ও যথার্থ অভিজ্ঞতায় প্রত্যাশার স্থান নেই। গল্প, কবিতা বা গানের মত একটা ছবি ক্রমশ প্রকাশ্য নয়। হঠাৎ প্রকাশের মত ছবিটা তৎক্ষণাৎ ধরা পড়ে। প্রতিমূর্তি সৃষ্টিমূলক ছবির চেয়ে বিমূর্তভাবের ছবিতে এই "তাৎক্ষণিক" ভাব আরও স্পষ্টভাবে ও ও একান্তভাবে ধরা পড়ে। এই "তাৎক্ষণিক" বোধটিকে স্পষ্ট করতে হলে মনের মুক্তি ও দৃষ্টির বিস্তার চাই যার মধ্যেই ওই "তাৎক্ষণিকতা" আছে। যার এই বোধটি হয়েছে সে আমার কথা বুঝতে পারবে। এই অভিজ্ঞতায় স্থিতিকালের অবিচ্ছিন্ন ধারার একটি বিন্দুতে আমরা একত্রিত হই। মনের মধ্যে যাই থাক ছবিটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে ওই বোধের উদয় হয়। একটিমাত্র দৃষ্টির মধ্যে ছবির পরিচয় বোঝার মত মনোভঙ্গির সৃষ্টি হয়। উত্তেজক যেমন আমাদের মধ্যে স্বয়ংক্রিয় প্রতিক্রিয়া জাগায়, ছবি দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে তেমনিই প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। আমাদের মনোযোগটা সম্পূর্ণ হয়, অর্থাৎ আমাদের মধ্যে আত্মবোধটা আর থাকে না, আমরা ছবির সঙ্গে সম্পুর্ণ একাত্ম হয়ে পড়ি।

ছবি ও ভাস্কর্য আমাদের মধ্যে যে "তাৎক্ষণিক" বোধ জায়গায় তা কিন্তু একটা বিচ্ছিন্ন ও একক অভিজ্ঞতা নয়। মুহূর্তের পর মুহূর্তে এই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে যাতে প্রতি মুহূর্ত আপনা থেকেই সম্পূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য থাকবে। একটা কথার বার বার উচ্চারণের মত শিক্ষিত দর্শকের চোখে ছবির "তাৎক্ষণিকতাটা" বার বার ধরা পড়বে।

এই নিগূঢ় কেন্দ্রীভূত মনোযোগ আমাদের মত সমাজের বেশীর ভাগ লোকের কাছে একটা নূতন অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করে। এই অভিজ্ঞতার আকর্ষণটাই বিমূর্তভাবের শিল্পকে আজ এত জনপ্রিয় করে তুলছে, এবং এইজন্যই আর্টস্কুল, আর্ট গ্যালারি ও আর্ট প্রদর্শনাগারে এই শিল্পের এত নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। এই জনপ্রিয়তার পিছনে হয়তো সাময়িক খেয়াল ও রেওয়াজের প্ররোচনা আছে, কিন্তু তাতে আমার বক্তব্যটা মিথ্যা হবে

না। আমি জানি অতি আধুনিক বিমূর্ত শিল্প, যার সূচনা হয়েছে পোলক ও জর্জেস ম্যাথিয়ের থেকে, তার সঙ্গে প্রগতিশীল "জাজ" সঙ্গীত ও তার ভক্তদের নাম জড়িত হয়ে পড়েছে। কিন্তু তাতে কিছু প্রমাণ হয় না। ওয়াগনারের নামের সঙ্গে জার্মান অতি-জাতীয়তাবাদ যুক্ত হয়েছিল ও ওয়াগনার হিটলারের প্রিয় সঙ্গীতকার ছিলেন। কিন্তু তাতে ওয়াগনাব বচিত সঙ্গীতের গুণ কমে যায় নি। এখানকার জনপ্রিয় লোক-সঙ্গীতেব সূচনা হয় ১৯৩০ সালের সাম্যবাদী ব্যবস্থাব আওতায়। তাতে লোক-সঙ্গীতেব কোন ক্ষতি হয়নি ও তার প্রতি আমাদের আকর্ষণ কমে যায় নি। একই ভাবে বিমূর্ত শিল্প সম্বন্ধে যে অর্থহীন কথা বলা বা লেখা হয় তাতে এই শিল্পের কোন ক্ষতি করে না যেমন বদ-সমালোচনা সাধাবণ ভাবে শিল্পেব কোন ক্ষতি করতে পাবে নি।

এখানে একটা কথা কিন্তু আমি স্পষ্ট কবে বলতে চাই। বিমূর্ত ভাবের শিল্প একটা বিশেষ পৃথক শ্রেণীর শিল্প নয়, প্রতিমূর্তিসৃষ্টি-মূলক শিল্প ও বিমূর্ত শিল্পেব মধ্যে কোন বাঁধাধরা বিভাগ নেই। পশ্চিমের শিল্প-ঐতিহ্যের এ একটা বিকাশ মাত্র। প্রতিমূর্তিসৃষ্টি-মূলক শিল্পে বিমূর্ত ভাবগত শিল্পেব সব পদ্ধতিগুলিরই পরিচয় পাওয়া যায়। বিমূর্ত ভাবগত শিল্প অন্যান্য শিল্পেব চেয়ে যে শ্রেষ্ঠ একথা বলা চলে না। প্রাচীন শিল্পগুরুদের সমকক্ষ চিত্রাঙ্কণ এক ১৯১০ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে আঁকা পিকাসো, ব্রাক ও লেজেবের কয়েকটি প্রায়-বিমূর্ত জ্যামিতিক ছবিতে ছাড়া বিমূর্ত চিত্রশিল্পেব আর কোথাও দেখেছি বলে মনে হয় না। চিত্রবহুল চিত্রেব ক্ষেত্রে প্রতিমূর্তিসৃষ্টি-মূলক শিল্পের চেয়ে বিমূর্ত ভাবগত শিল্প আবও বিশুদ্ধ ও সার-সমৃদ্ধ হতে পাবে, কিন্তু তাতেই বিমূর্ত শিল্প বড এ প্রতিপন্ন হয় না। বিমূর্ত ভাবের শিল্পের ক্ষেত্রে চিত্রের ছবি অনুপাতে খাবাপ ছবি অনেক বেশী দেখা যায়। শুধু আমাদের যুগে যা কিছু বড চিত্রশিল্পেব সৃষ্টি হয়েছে তা প্রধানত বিমূর্ত ভাবগত। মধ্যম ও নিম্নস্তরে চিত্রাঙ্কন বেশী দেখা যায় প্রতিমূর্তিসৃষ্টি-মূলক শিল্পে।

সাধারণ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিমূর্ত ভাবগত শিল্পেব বিশেষ মূল্য এইখানে যে তার রসভোগে নিগূঢ় নিরাসক্ত ধ্যানেব প্রয়োজন হয়। সকল শিল্পের বিচারেই কিছু না কিছু পরিমাণে ধ্যান-চিন্তাব প্রয়োজন ঘটে। কিন্তু বিমূর্ত ভাবগত শিল্পের ক্ষেত্রে ওই নিগূঢ় ও স্থির মনোযোগকে আরও বিশুদ্ধ, অবিমিশ্র, প্রত্যক্ষ ও সারবস্তুগত হতে হয়। আমাদের প্রথমেই যদি বিমূর্ত চিত্রকলার রসভোগের সুযোগ ঘটে তাহলে পবে প্রাচীন শিল্পগুরুদের চিত্রগুলি

আরও ভালভাবে উপভোগ করতে পারি। অর্থাৎ তখন অবান্তরকে বাদ দিয়ে আরও সম্পূর্ণ ও গভীরভাবে ওই চিত্রের অভিজ্ঞতা লাভ হয়।

শেষ পর্যন্ত মনড্রিয়ান ( Mondrian ) ইত্যাদি বিমূর্তভাবের শিল্পীকে যে মানদণ্ডে বিচার করি প্রাচীন শিল্পগুরুদের সেই একই মানদণ্ডে বিচার করি। টিটিয়ানের ছবির ভাবমূর্তির ঐক্যতার মূর্তির চেয়ে বড়। রঁত্রঁর পোট্রেট বিচারে আবার ফিরে আসা যাক। সেখানে দেখি যাদের যা প্রতিকৃতি আঁকা হয়েছে তার থেকে তার রূপগত গুণটিকে পৃথক করা যায় না। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি প্রতিমূর্তিসৃষ্টি-মূলক চিত্রে যখন মূর্তিগুলির সাদৃশ্যের বোধটা আমাদের চেতনার একটা নিম্নস্তরে থাকে তখন সেই চিত্রকে বেশী উপভোগ করতে পারি। ব্যদল্যের বলেছেন তিনি যখন দেলাক্রেয়ার ছবি দূর থেকে দেখেন, যখন মূর্তিগুলো স্পষ্ট দেখা যায় না কিন্তু রঙের ছড়াছড়িটা বোঝা যায় তখন তিনি সেই ছবির অর্থ গ্রহণ করতে পারেন। আমার মনে হয় পূর্ববর্তী যুগে এই সাক্ষাতের উপর নিভর করেই সমালোচক ও সমঝদারেরা চিত্রের ভাল-মন্দের বিচার করতেন। রুবেন্সের ( Rubens ) নগ্ন মূর্তিগুলির যথার্থ মূল্য উপলব্ধির জন্য তাঁরা প্রায় অজ্ঞাতসারে সেই আকৃতির বিশদ বৈশিষ্ট্য বিচারটা বাদ দেন। নগ্নমূর্তির লালচে রঙটা হয়তো চোখের উপর ভাসে। কিন্তু সেই নগ্নতা ও লাল রঙের আর কোন আনুষঙ্গিক বিবরণ প্রায় চোখের বাইরে থাকে।

বিমূর্ত ভাবের শিল্পের এ সমস্যা নেই। অন্তত এমন ভাবাত্মক চিত্র দেখে দেখে আমরা এই সমস্যাকে বিনা চেষ্টাতেই দূরে সরিয়ে রাখতে পারি এবং আমাদের দৃষ্টিকে বাস্তবধর্মী ছবির বিচারে একটা বিশুদ্ধতা দিতে পারি। আমার নিজের ক্ষেত্রে এই অভিজ্ঞতা আমি পেয়েছি। এই অভিজ্ঞতা যে সকলের হয় না তার কারণ তাঁদের চিত্রকলার সঙ্গে পরিচয় ঘটে বিজ্ঞাপন ও সাময়িক পত্রিকার ছবি দেখা একাডেমিক শিল্পের মধ্য দিয়ে। বিমূর্ত চিত্রকলার সম্মুখীন হয়ে এঁরা এমন অভিভূত হয়ে পড়েন যে পূর্বে আঁকা আর সব ছবির কথা ভুলে যান। এটা দুঃখের কথা কিন্তু তাতে বিমূর্ত ভাবগত শিল্পের প্রকৃত বা সম্ভাবনাময় মূল্যটা নষ্ট হয় না। ভাবাত্মক শিল্পের মধ্য দিয়ে চারুকলার সঙ্গে পরিচয় ও নিরাসক্ত ধ্যান-ধারণার অভ্যাস ঘটার গুরুত্ব আছে। এই হিসাবে ভবিষ্যতে বিমূর্ত চিত্রকলার মূল্য আরও বেশী হবে বলে আমার মনে হয়। প্রকৃত পক্ষে এই শিল্প আমাদের ঐতিহ্যে ভাঙন ধরাবার বদলে তার ধারক হবে। জীবনকে লাভ-লোকসানের হিসাব থেকে মুক্ত করে

অন্য ভাবে কি করে ঢের বেশী মূল্য দেওয়া যায় এই শিল্প তার দৃষ্টান্ত হবে। অনেক লোককে আমি তাদের বাড়ির ঘরে বিমূর্তভাবের ছবির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলতে শুনেছি, "এই ছবিতে কি আছে জানি না, কিন্তু এর থেকে আমি চোখ ফেরাতে পারি না।" এই বিস্ময়-বিহ্বলতা স্বাস্থ্যকর ও শুভ লক্ষণ যুক্ত। যা ভালবাসি বা উপভোগ করি নিজেদের কাছে বা অপরের কাছে তার ব্যাখ্যা করতে না পারাটা আমাদের পক্ষে ভাল। এতে আমাদের অভিজ্ঞতাকে প্রসারিত করার শক্তি বাড়ে।

# অনুবর্তিতার অভিশাপ

## ওয়াল্‌টার গ্রোপিয়াস

একচল্লিশ বছর আগে সফল ও কর্মরত স্থপতি ডঃ ওয়ালটার গ্রোপিয়াস তাঁর জন্মস্থান জার্মানিতে নক্‌সা পরিল্পনার একটি বিশেষ ধারার সৃষ্টি করেন যার নাম দেওয়া হয় "বহস" (Bauhaus)। ওই ধারার মধ্যে শিল্পী, নক্‌সাকার ও স্থপতির ভাব-ধারণার মিলন ঘটে ও ভাব-ধারণার সঙ্গে শ্রম-শিল্প ও গৃহ নির্মাণের প্রয়োজনের একটা সম্বন্ধ স্থাপন সম্ভব হয়। ফলে "বহস" পরিকল্পনার বিশেষ প্রভাবটা জগতের সর্বত্র দেখা দিয়েছিল। ১৯৩৭ থেকে ১৯৫২ সাল, এই পনর বছর, ডঃ গ্রোপিয়াস হার্ভার্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিভাগের নকসা পরিকল্পনার স্নাতক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। এখন ম্যাসাচুসেট্‌সের কেম্ব্রিজে "The Architects, Collaborative"-এর প্রাচীনতম সভ্য, "এমারিটাস" অধ্যাপক ডঃ গ্রোপিয়াস কর্মরত স্থপতি ও পরিকল্পনা রচয়িতা হিসাবে তাঁর চিন্তা-ধারার প্রসার করে চলেছেন।

"কোল থেকে কবরে, বিশ্ব-বিশৃঙ্খলার মধ্যে এই যে ক্রমান্বয় শৃঙ্খলা রক্ষার সমস্যা, মহাশূন্যের মধ্যে দিক নির্দেশ, মুক্তির মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা ও বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের যে সমস্যা তা সমাধানের একমাত্র দায়িত্ব শিক্ষার। ধর্ম-নির্ভর দর্শন, বিজ্ঞান, আর্ট, রাজনীতি ও অর্থনীতিরও ওই একই কথা।"

—হেনরি এডামসের "শিক্ষা"

আমেরিকার প্রয়োগ-পদ্ধতি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ঈর্ষার বিষয় হলেও তার "জীবনধারা" বাইরের লোকের নির্বিচার শ্রদ্ধা পায় নি। আমরা জগতের কাছে প্রমাণ করেছি যে একটা কর্মশক্তিশীল জাতির পক্ষে জীবনের পার্থিব সম্পদ ও নাগরিক অধিকারের মানটা অভাবনীয়ভাবে উঁচু করে তোলা সম্ভব। আমেরিকার দৃষ্টান্ত অন্যান্য দেশ সযত্নে অনুসরণও করেছে। অন্যান্য জাতি আমাদের যাদুকরী প্রয়োগ-সূত্রটা গ্রহণ করতেও উদ্‌গ্রীব।

কিন্তু তবু তারা স্বীকার করতে চায় না যে এই মার্কিনী ছাপমারা প্রয়োগ-বিদ্যায় শেষ পর্যন্ত মহৎ জীবনের কোন ছক পাওয়া সম্ভব। আমাদের নিজেদের মনেই সন্দেহ জেগেছে যে আর্থিক সমৃদ্ধি ও নাগরিক অধিকারটাই হয়তো সব নয়।

আমাদের বিফলতাটা কোথায় ?

আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতির বিশ্লেষণে ও তার সমাধানের উপায় নির্দেশের চেষ্টায় আমি এ দেশে ( আমেরিকায় ) ও তার বাইরে আমার শিক্ষক ও কর্মরত স্থপতি জীবনের অভিজ্ঞতাটা কাজে লাগিয়েছি। প্রাচীন জাতি, বিশেষত যে জাতি আজ সামন্ততান্ত্রিক ও ঔপনিবেশিক অবস্থা থেকে সবে মুক্তিলাভ করে আধুনিক শিল্প-ভিত্তিক সমাজ গডতে চলেছে তাদের উপর মার্কিনী সভ্যতার প্রভাবটা লক্ষ্য করবার আমার বিশেষ সুযোগ ঘটেছিল। প্রত্যেক জায়গায় যন্ত্রযুগের সূচনা যে বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রমের সৃষ্টি করেছে তাতে শিল্পীকরণের উপকারের চেয়ে তার সমস্যাটাই বেশী করে চোখে পড়ছে।

আমার ক্রমশই নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মেছে যে আমাদের নেতৃত্বটা এদের ন্যায্য ও উপযুক্ত পথ দেখাতে অক্ষম হয়েছে। প্রয়োগবিদ্যা ও বৈজ্ঞানিক কৌশলের সঙ্গে প্রয়োগের যথার্থ নীতিটা আমরা অন্যদেশে রপ্তানি করতে পারিনি। এই না পারার প্রধান কারণ আমাদের দেশেই এই নীতিগুলি ঠিকমত রূপায়িত হয় নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ মানুষের তৈরি সবচেয়ে বড় যা জিনিস, আমাদের নগর, ব্যক্তি বিশেষের অতি উত্তম পরিকল্পনা সত্ত্বেও, ক্রমশ বিশৃঙ্খল ও শ্রীহীন হয়ে উঠছে। গ্রাম্য পরিবেশ রক্ষার সমর্থকদের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও, ব্যবসায়ী শোষণের জন্য, আমাদের সুন্দর গ্রামাঞ্চলের বেশীর ভাগ অংশ "বুলডোজারের" চাকার তলায় তার অস্তিত্ব হারাচ্ছে। আমাদের ছোট ছোট সহরগুলি তাদের স্থানীয় বৈশিষ্ট্য ও সামাজিক মনটি বজায় রাখবার চেষ্টা করছে—রাশিকৃত উৎপাদন আরোপিত অনুবর্তিতার বিরুদ্ধে তারা পরাজয়ের যুদ্ধ লড়ছে। শুধুমাত্র ব্যবসায়ের খাতিরে বিশেষ রুচির ধারা স্বীকৃতি পাচ্ছে, নূতনত্বের গড্ডালিকা প্রবাহে মানুষ তার যথার্থের বোধ ও গুণের স্বাভাবিক অনুভূতিটা হারিয়ে ফেলছে। দোকানদারী প্রচার মানুষের উপর প্রচুর পণ্যদ্রব্যের যে ভার জোর করে চাপিয়ে দিচ্ছে তা মানুষ মাত্রকেই এত বিভ্রান্ত করছে যে তারা নিজের ইচ্ছায় কাজ করার শক্তি হারিয়েছে, বিক্রয়-বিরোধিতা বজায় রাখতে পারছে না।

আমাদের প্রবল অর্থনৈতিক প্রগতির লক্ষ্যটা কি হওয়া উচিত? দ্রুত

যাতায়াত ও বিস্তৃত যোগাযোগের যে অদ্ভুত ও নূতন পদ্ধতি আজ আমাদের হাতে তা দিয়ে ঠিক কি উদ্দেশ্য সাধন করতে চাই? এতদিন পর্যন্ত আমাদের গতিবৃদ্ধি হয়েছে কিন্তু তাতে আমরা আমাদের গণতান্ত্রিক লক্ষ্যের যে প্রাথমিক কল্পনা তার কাছাকাছিও পৌঁছতে পারিনি। বরং আধুনিক সভ্যতার যন্ত্রপাতির তলায় আমরা চাপা পড়েছি, তাদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা আমাদের উপর একটা আধিপত্য বিস্তার করেছে, যে আধিপত্য ব্যক্তি বিশেষের নিজের শক্তি সম্ভাবনাকে বোঝা ও ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতাকে খর্ব করেছে। আমাদের মস্তিষ্ক-প্রসূত যে যন্ত্র তারই আনুগত্যের ফলে আমাদের ব্যক্তিগত বৈচিত্র্য ও কর্ম ও চিন্তার স্বাধীনতা—আমেরিকার ছবির যে দুটি মূল উপাদান—তা ক্রমশ লুপ্ত হতে চলেছে। আমরা এখন বুঝতে পারছি গণতন্ত্রের গঠনে অনুবর্তিতা নয়, অনুগমন নয়, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যটাই আসল। বৈচিত্র্যের সঙ্গে ঐক্যের মিলন ঘটাতে না পারলে আমরা শেষ পর্যন্ত যন্ত্র-মানুষ, রোবটে, পরিণত হব।

এখানে "গণতন্ত্র" কথাটা রাজনৈতিক অর্থে ব্যবহার করছি না। আমি আধুনিক জীবনের একটা বিশেষ রূপের কথা বলছি, যা রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কশূন্যভাবে, ব্যাপক শিল্পীকরণ, বর্ধিত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জনসাধারণের উচ্চশিক্ষার ও গণভোটের অধিকারকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

নূতন বৈজ্ঞানিক ও প্রয়োগমূলক আবিষ্কারের উৎসাহ আমরা জগতে সঞ্চারিত করেছি। কিন্তু আমরা যন্ত্রের পূজায় এত ব্যস্ত যে যন্ত্রের সেবায় মনুষ্যত্বের মূল্যগুলি ত্যাগ করেছি। আমাদের অজুহাত এই যে প্রয়োগ-বিদ্যা ও বিজ্ঞানের অতি দ্রুত অগ্রগতি আমাদের সৌন্দর্য ও সৎ-জীবনের ধারণাকে বিভ্রান্ত করে তুলেছে। ফলে প্রাচুর্যের মধ্যে আমরা উদ্দেশ্যহীন ও অসহায় বোধ করছি।

এই পরাজয়ের ভাবটাকে জয় করতে পারি যদি বুঝি যন্ত্রের নয়, আমাদের মনের কেন্দ্রস্থলের জড়ত্ব বা সজাগ তৎপরতা আমাদের নিয়তি নির্ধারণ করবে। নিজেদের উপর কর্তৃত্ব হারান যন্ত্রের দোষ নয়, মনের দোষ।

বিশেষ ক্ষেত্রে একদেশদর্শী অতি দক্ষতালাভের ফলে আমরা আমাদের জটিল জীবনের ক্ষেত্রে ঐক্য আনার শক্তি হারিয়েছি এবং এই ঐক্য নেই বলেই আমাদের সাংস্কৃতিক সম্বন্ধে ফাটল ধরেছে। মানুষ আজ তার অস্তিত্ব হারাতে বসেছে। ব্যবহারিক বিজ্ঞানের জয়যাত্রা জীবনের যাদুকরী প্রভাবটাকে নষ্ট করেছে। শিল্পী, কবি, দ্রষ্টা আজ "সংগঠনকারী মানুষের" সৎ-পুত্রে পরিণত

হয়েছে। আমাদের সংগঠনগত লক্ষণীয় ঐক্য আমাদের সাংস্কৃতিক অনৈক্যকে ঢাকতে পারছে না। একদেশদর্শী উন্নয়নেব ফলটার কথা এলবার্ট আয়েনস্টাইনের একটি উক্তির মধ্যে পরিস্ফুট হয়, "আমাদের একালের বৈশিষ্ট্য হল যন্ত্রের নিখুঁত রূপ ও উদ্দেশ্যের বিভ্রান্তি।"

আমরা আমেরিকাবাসীরা আমাদের জরুরি কর্তব্যটা কি তা যে বুঝতে পেরেছি, এমন কোন সাক্ষ্য চোখে পড়ছে না। "বৃহত্তর" থেকে "মহত্তর", পরিমাণের থেকে গুণ যে বড় তা যে বুঝতে পেরেছি বলে মনে হয় না। আমাদের পরিবেশকে সুন্দর করে গড়া ও সার্থক রূপ দেওয়া যে দরকার তা বুঝি কিনা জানি না। এই বোধ জন্মালে পার্থিব সমৃদ্ধির সঙ্গে নৈতিক বল যুক্ত হবে, জীবনের যে ক্ষেত্র আমাদের অজানা ছিল তার পথ খুলে যাবে।

আমাদের জীবনধারার যে সম্ভাবনাটা সুপ্ত হয়ে আছে তাকে পূর্ণ করে তোলায় আমাদের এত দ্বিধা কেন? যে জাতি সার্বজনীন অবৈতনিক শিক্ষার অঙ্গীকারে আবদ্ধ সে জাতি তার শিশুদের জন্য যথেষ্ট স্কুল ও শিক্ষকের ব্যবস্থা করতে অক্ষম কেন? সুন্দর স্বাস্থ্যকর গৃহ-নির্মাণে আমাদের এত অনাগ্রহ কেন? আমাদের সহরগুলিকে সুসংযত পরিকল্পনা ও স্থাপত্যগত সাম্যের আদর্শরূপে কেন গড়তে পারি নি?

এর একটা কারণ হতে পারে আমেরিকার 'পিউরিটান" ঔপনিবেশিকেরা নীতিগত ব্যবহারের ধারাটা বাঁধতে এত ব্যস্ত ছিল যে সৌন্দর্য-নীতির কথা ভাববার সময় পায় নি। আজও পর্যন্ত অতীত জগতের কতকগুলি নীতিবাক্য আমাদের শাসন করছে। সৌন্দর্য জ্ঞান যে নৈতিক শক্তির বিকাশ ঘটায়, এদের বিকাশ যে পরস্পর-নির্ভর, সে সত্য পিউরিটানেরা অগ্রাহ্য করেছিল। আমাদের সমাজে সুন্দরের একটা সংস্কৃত বোধের তাই অভাব ঘটেছে। ফলে আমাদের সামাজিক ও স্বাভাবিক শিল্প-শক্তি অনুন্নত রয়ে যায় ও শিল্পীকে আমরা স্বপ্নরাজ্যে নির্বাসিত করি।

এ দেশে সৌন্দর্যবোধের যে মানটা দেখা যায় সেটা এসেছে প্রাক্-শ্রমশিল্প যুগ থেকে। এর একটা দৃষ্টান্ত দেখি প্রাচীন নিদর্শন যোগাড় করার টানের মধ্যে। কিন্তু গতযুগের শিল্প-প্রেরণার সঙ্গে আজকের জনতার প্রয়োজনের কোনও সম্পর্ক নেই।

দৈনিক আট ঘণ্টা কাজের মধ্য দিয়ে বস্তু উৎপাদনে এই প্রয়োজন মেটেনি। আমরা বুঝতে শিখেছি যে আমাদের এই নির্ভয় নূতন পৃথিবীতে (Brave New Woıld) কতকগুলি উপকরণের অভাব ঘটেছে—অভাব ঘটেছে

সৌন্দর্যের ও অন্তরের সম্পদের। এদের অভাবে আমাদের জীবনটা পূর্ণ হতে পারছে না, পরিণতিলাভ করতে পারছে না, যে পূর্ণতা ও পরিণতি জীবনে নূতন রূপের বিকাশ ঘটায়। ফলে যে দৃষ্টিগোচর সাংস্কৃতিক জীবনধারা আমাদের সৃষ্টি করা উচিত ছিল তা আমরা পারি নি। শুধু বুদ্ধি প্রয়োগের মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক সমস্যার সমাধান হয় না। প্রত্যেক মানুষের অন্তরে অমাদের গভীরতর স্বরের ঝঙ্কার তুলতে হবে যাতে সে নূতন রূপ সৃষ্টি করতে পারে ও নূতন রূপ-সৃষ্টি উপভোগ করতে পারে।

যে সমাজ শুধু তথ্য সংগ্রহে ও ব্যবসায়ী উদ্ভাবনে ব্যস্ত সে সমাজে এই জাগরণ কেমন করে সম্ভব? যে দেশে শিল্পীকে উৎসাহিত করবার জন্য, চারু শিল্প সম্পদ রক্ষার জন্য এত প্রতিষ্ঠান রয়েছে সে দেশের সম্পর্কে এই প্রশ্নটা অদ্ভূত শোনাবে। একথা সত্য যে ওই প্রতিষ্ঠানগুলির, মিউজিয়াম, শিল্প সমিতি ও সংস্থাগুলির, যথেষ্ট মূল্য আছে। কিন্তু তা শুধু সেই মানুষদের মধ্যে শিল্পের রসানুভূতি জাগায় যারা মনে করে ওই বিলাসে সময় ও অর্থব্যয় করা তাদের পক্ষে সম্ভব। স্কুল-কলেজের উপর ওই প্রতিষ্ঠানগুলির প্রভাব অল্প। সেখানে ইংরাজী ভাষা, ইতিহাস ও গণিত অধ্যয়নটা শিল্পকলা শিক্ষার চেয়ে বড।

এক সময় ছিল যখন শিক্ষিত ও সংস্কৃত একটি গোষ্ঠী আপন শক্তির প্রভাবে প্রবোচনার মধ্য দিয়ে তাদের রুচির মান আমাদের উপর চাপাত। পরে এদেশে, ভাল বা মন্দের জন্যই হ'ক, ব্যবসায়ের নেতারা তাদের খেয়াল-খুশী যাতে অন্য লোক অনুসরণ করে তার জন্য প্রভাব বিস্তার করে। আমাদের যুগে সাংস্কৃতিক নির্দেশ আসে আমাদেরই সহ-নাগরিকদের কাছ থেকে—স্কুল-বোর্ড, নাগরিক সমিতি, স্ত্রীলোকের ক্লাব থেকে যাদের সাংস্কৃতির ক্ষেত্রে মতামত গ্রহণের জন্য আমরাই নির্বাচন করি। এইটাই হওয়া উচিত কারণ গণতন্ত্রের দাবি হল প্রত্যক ব্যক্তি তার বিশ্বাস ও অন্তর্দৃষ্টির প্রভাবটা পরিবেশে সঞ্চারিত করুক।

কিন্তু এই সব নাগরিকদের বিচার বিশ্বাসযোগ্য হওয়ার মত শিক্ষা আছে কি? বৈচিত্র্য ও বিশৃঙ্খলা, সামগ্রিক ঐক্য ও আহরণ যে এক বস্তু নয় তারা জানে কি? যাদের ভাল-মন্দের বিচার শক্তির বিকাশ ঘটেনি তাদের কাছে বেশী কিছু আশা করাটা ভুল। একটা প্রেরণাময় পরিবেশ সৃষ্টির সম্ভাবনাটা কি ও কতখানি তা তাদের আগে বোঝা দরকার। প্রচলিত বুলি আওড়ালে বা একটা বিশেষ অবস্থার সুযোগ নিলেই এই বোধ জাগবে না। এখন যা

দেখা যাচ্ছে তাতে এদের শিক্ষা এমন হয় না যাতে সামগ্রিক উৎকর্ষ ও দৃষ্টি-গোচর সৌন্দর্য এরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। শক্তিশালী বিক্রয় ব্যবস্থার মাধ্যমে আধা-শিল্পকলার দৃষ্টান্ত এদের কাছে যথেচ্ছ ব্যবহৃত আকার ও রঙের মারফৎ পৌঁছয় তাতে তাদের ইন্দ্রিয়বোধটা অসাড় হয়ে যায়।

আমাদের বাধাপ্রাপ্ত সৃজনী শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। যে জন্মগত অধিকারকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করেছি তাকে ফিরে পাওয়া অবশ্য সহজ হবে না। কিন্তু স্কুল থেকে এই চেষ্টা স্থরু করতে হবে, যখন ছেলে-মেয়েদের মন-গড়ার বয়স।

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় তথ্য সংগ্রহের উপর যে বিশেষ জোর দেখা যায় তার পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক ও প্রয়োগবিদ্যাগত জ্ঞানের সঙ্গে অনুভূতিগত অভিজ্ঞতার যোগ সাধন করতে হবে। আমাদের জাতীয় জীবনে কঠোর নীতি-পরায়ণতার প্রতি যে পক্ষপাত আছে, ভাবাবেগগত প্রতিক্রিয়ার প্রতি যে অবিশ্বাস আছে, তার ফলে আমাদের স্বাভাবিক প্রবণতাগুলি চাপা পড়ে গেছে, আমাদের কল্পনা পাখা মেলতে পারছে না। এই সংস্কারগুলি আমাদের কাটিয়ে উঠতে হবে ও শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের মনোভাবকে আরও উদার করে সেখানে অনুভূতির স্থান করে দিতে হবে। আমাদের অনুভূতিকে দাবিয়ে রাখতে নয়, তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখতে হবে। কল্পনা-শক্তির বিকাশ যে আবহাওয়ার সৃষ্টি করবে তাতে শিল্পী-জীবন সহজ হবে। শিল্পী সমাজ বহির্ভূত জীব বলে গণ্য হবে না, সমাজ-জীবনেরই একটি অঙ্গ বলে বিবেচিত হবে।

কিণ্ডারগার্টেন স্কুলে আমরা শিশুদের কল্পনাশ্রিত খেলার ছলে তাদের পরিবেশের পুনঃসৃষ্টিতে উৎসাহ দিয়ে থাকি। এই উৎসাহ ও আগ্রহ স্কুল ও কলেজ-জীবনে আরও নিগূঢ় করে তোলা দরকার। ব্যবহারিক দিক থেকে রূপ, রঙ ও ব্যাপ্তিগত সম্বন্ধের আকার দেওয়ার সমস্যা তাদের অনুশীলন করা দরকার ও এদের মূর্ত করে তোলার জন্য প্রকৃত বস্তুর ব্যবহার করা দরকার। এখন শিক্ষা-ব্যবস্থায় বই পড়ার উদ্দেশ্য শুধু বইপড়া নয়, আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে পথ দেখান। এই শিক্ষায় আমাদের আবাসিক অবস্থার যে ছবি সে সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে একটা গঠন-মূলক মনোভাবের সৃষ্টি হবে যাতে পরে সেই অবস্থার উৎকর্ষ সাধনে আমরা যোগ দিতে পারব।

পরিবেশ-পরিকল্পনার ব্যবস্থাটাকে বুঝতে হলে তার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে হয়। এই যুক্ত হওয়ার ইচ্ছাটা যখন সমাজের সর্বস্তরে দেখা দেয় তখন

সৃষ্টিধর্মী মানুষের প্রতিবেদনশীলতাটা আরও সহজ হয়ে ওঠে ও তারা সকলের ইচ্ছাটাকে রূপ দিতে পারে। তখন শিল্পীর কাজ ও আবেদন কোন এক বিশেষ শ্রেণীর মানুষ নয়, সকল মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আধুনিক শিল্পী সম্বন্ধে একটা অনুযোগ, তারা তাদের স্বতন্ত্র জগতে ঘোরে, প্রতিবেশীর কাছে তারা অপরিচিত হয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃত শিল্পী তার সমাজেরই স্পষ্ট সমালোচক। সে সমাজের লক্ষ্য ও মূল্যজ্ঞানটা যদি অস্পষ্ট হয় তবে শিল্পীর কাছে তা ধরা পড়বে। শিল্পী মনের সুখের খোরাক যোগাতে পারছেন না বলে অনুযোগ না করে তাঁর বক্তব্যটা আমাদের বুঝতে চেষ্টা করা উচিত। দর্শন ও বিজ্ঞানের অগ্রগমনের সঙ্গে সৌন্দর্যের আদর্শটা নিয়ত বদলে যায় এবং শিল্পী নিজের যুগের আধ্যাত্মিক ও বৈজ্ঞানিক ধারণা সম্বন্ধে সংবেদনশীল হওয়া সহজ প্রবৃত্তিতে তা প্রকাশ করেন। শিল্পীর কাজটিকে যদি না বুঝতে পারি তবে সে দোষটা আমাদের কারণ যে শক্তিগুলি আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ করছে, তাকে আকার দিচ্ছে, সেই শক্তিগুলি সম্বন্ধে আমরা নিষ্ক্রিয় ও নির্বিচল। দুর্বোধ্যতা ও খামখেয়ালিপনার জন্য শিল্পীকে দোষ দেওয়া বৃথা যখন যে সমসাময়িক অবস্থার তিনি প্রতীক সৃষ্টি করছেন সেই অবস্থা সম্বন্ধেই আমরা নির্বিকার, আগ্রহশূন্য। শিল্পী সমগ্র মানুষের ছবি আঁকেন। সে হিসাবে প্রকৃত গণতন্ত্রের স্বাস্থ্যরক্ষায় তাঁর যে বিরাট অবদান সেটা আমাদের হৃদয়ঙ্গম করা দরকার। যে অতি যান্ত্রিকতা আজ আমাদের পীড়ার বিষয় হয়ে উঠেছে তার প্রতিষেধক হল শিল্পীর মুক্তি, স্বাধীনতা ও প্রবৃত্তির বিকাশ। বিজ্ঞান ও শ্রমশিল্পের দুর্দান্ত গতিকে রোধ করার জন্য আমাদের বিচ্ছিন্ন সমাজে শিল্পীর সুস্থিত প্রভাবের আজ বিশেষ প্রয়োজন।

শিক্ষার কি আবহাওয়ায় শিল্পীর কল্পনাকে জাগিয়ে তোলা যায়, কিসে তার রচনা-কৌশলের বিশুদ্ধ প্রকাশ ঘটে—এই সমস্যা সমাধানের প্রবল আগ্রহে, কোনও একজন "দ্রষ্টার" পক্ষে যে আমাদের শিক্ষা ও শ্রম-শিল্পের ধারাটা পরিবর্তন করা অসম্ভব তা বুঝে, প্রায় চল্লিশ বছর আগে আমি এক দিগ্-দর্শনকারী সংস্থার প্রতিষ্ঠা করি। জার্মানীতে প্রথমে ওয়েমারে ও পরে দেস্তোতে ( Dessau ) এই সংস্থা গড়ে তোলা হয় যার নাম Bauhaus School of Design। প্রগতিশীল চিত্রশিল্পী, ভাস্কর ও স্থপতি এই স্কুলের শিক্ষক শ্রেণীভুক্ত হন। ছাত্র বাছাই করা হয় শক্তিশালী ও সম্ভাবনাপূর্ণ যুবকদের মধ্য থেকে যারা আমাদের শ্রমশিল্পগত সমাজের অধীনতা স্বীকার করে নেয় নি, এবং যারা আর্টচর্চার জন্য সমাজ থেকে

নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বপ্নরাজ্যে নিজেকে নির্বাসিত করে নি। ব্যবসায়ী ও কারিগরি গোঁড়া-মনোবৃত্তি ও সৃষ্টিধর্মী শিল্পীর কল্পনার মধ্যে যোগসূত্র সৃষ্টি করার জন্য এদের আমরা শিক্ষিত করে তুলতে চেয়েছিলাম।

এই উদ্দেশ্যে আমরা মনোবিদ্যা ও জীববিদ্যাগত উপকরণের উপর নির্ভর করে একটা শিক্ষার যোগ্য ও অতি ব্যক্তিত্বময় ভাষার সৃষ্টি করার প্রয়াসী হয়েছিলাম। এই ভাষার মধ্য দিয়ে ছাত্রদের আমরা দৃষ্টিগোচর তথ্যের প্রকৃত জ্ঞান দেবার চেষ্টা করেছিলাম। এ ছাড়া আরও চেষ্টা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত শিল্প-সৃষ্টির জন্য একটা সাধারণ পটভূমিকা তৈরি করা যাতে সৃষ্টির কাজ অনিয়ম ও উপেক্ষার হাত থেকে বাঁচে ও ব্যক্তিতন্ত্রের বদলে তাতে যুগের সত্য আত্মাটা ধরা পড়ে। আমরা কোনও নূতন পদ্ধতির ব্যবস্থা দিতে চাইনি। আমরা চেয়েছিলাম আমাদের যুগের ভাব-চিন্তাকে প্রতিফলিত করতে পারে এমন কতকগুলি মূল্যের সৃষ্টি করা। এই লক্ষ্যে পৌছানর একমাত্র উপায় হল পদার্থগত ও প্রয়োগগত ও মানুষের মনস্তত্ত্বগত নিয়মগুলির বাধা-বন্ধনহীন সন্ধান। মনের উপর রূপ, রঙ, গঠন বিন্যাস বৈষম্য, ছন্দ, আলো ও ছায়ার প্রভাব কেমন হয় প্রথমে ছাত্রদের সে বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। সামঞ্জস্য ও মানবিক মানদণ্ডের নিয়মগুলির সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। রূপ-সৃষ্টির জন্য চোখের যে ভ্রমগত ছবিটা একান্ত প্রয়োজন তার মধ্যে পরিভ্রমণ করতে তাদের উৎসাহ দেওয়া হয়েছিল। বিভিন্ন জিনিস ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ছাত্রদের সৃষ্টির অভিজ্ঞতার নানা স্তর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যাতে তারা ওই মালপত্রের সম্ভাবনা ও নিজেদের শক্তি-দুর্বলতাটা বুঝতে পারে।

এই প্রাথমিক পাঠ শেষ হলে ছাত্রদের নিজেদের নির্বাচন করা কারুকার্যে বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হত। "বহস" বিদ্যালয়ে কারুকার্য শিক্ষাটা একটা লক্ষ্য ছিল না, তা ছিল পথ দেখাবার একটা ব্যবস্থা মাত্র। উদ্দেশ্য ছিল এমন কতকগুলি নক্‌সা তৈরি করা যারা বস্তু সামগ্রীর সঙ্গে ও কর্ম কৌশল সম্বন্ধে পূর্ণ পরিচয় থাকায় রাশিকৃত শ্রমশিল্প উৎপাদনের জন্য "মডেল" বা ছাঁচ তৈরি করতে পারবে। এই "মডেল"গুলির পরিকল্পনাটাই যে "বহস" স্কুলে হবে তা নয়, "মডেল"গুলিই সেখানে তৈরি হবে। বৃহৎ শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে এই নক্‌সাকারদের পরিচয় থাকা দরকার। সেইজন্য তাদের কারখানায় পাঠান হত। অন্য দিক কারখানার কর্মীরা নিজেদের সমস্যা নিয়ে আসত "বহস" স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রদের কাছে।

"বহস" স্কুলে ব্যবসা সংক্রান্ত ক্ষণস্থায়ী উপকরণ তৈরির শিক্ষা দেওয়া হত না। এই স্কুলকে একটা গবেষণাগারের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারত যেখানে নক্সা তৈরির সমস্ত সমস্যা নিয়ে পরীক্ষা চলে। শিক্ষক ও ছাত্রের কাজের মধ্যে একটা সমন্বয় ঘটেছিল যার ভিত্তি বাইরের নিপুণতার উপর গড়া হয় নি, গড়া হয়েছিল নক্সা তৈরি সম্বন্ধে একটা মৌলিক মনোভাবকে কেন্দ্র করে। এর ফলে নূতন নয়, বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করা সম্ভব হত।

অর্থাৎ "বহস" স্কুলের উদ্দেশ্য কোন রীতি, বিশেষ শৈলী বা মত প্রচার করা নয়, নক্সা তৈরির কাজটাকে প্রাণবন্ত করে তোলা। আমাদের ইচ্ছা ছিল মনের মধ্যে একটা সৃষ্টির স্তর গঠন করা যার ফলে সমসাময়িক স্থাপত্য ও তার পরিকল্পনা সামাজিক শিল্প হিসাবে নূতন করে প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারে।

আমেরিকার নক্সা পরিকল্পনায় ও নক্সা সম্বন্ধের পাঠ্য তালিকায় "বহস" স্কুলের যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়। এদেশে (যুক্তরাষ্ট্রে) বিশেষ করে "বহস" পদ্ধতিটা একান্তভাবে কার্যকরী হয়েছে কারণ আর কোন দেশে একত্রীকরণ রীতিটা এতখানি প্রচলিত হয়নি এবং সেইজন্য অন্য কোথাও রাশিকৃত হারে গৃহনির্মাণের জন্য একটা নির্দিষ্ট মাপকাঠির এতটা প্রয়োজন দেখা যায় না। যন্ত্রযুগের যাত্রাপথে কোথায় গিয়ে পৌছলাম তা দেখবার জন্য জগতের মানুষ আমেরিকার দিকে তাকায়। সেখানে যদি তাই সাংস্কৃতিক তাৎপর্যপূর্ণ বস্তু-সামগ্রী উন্নত প্রয়োগ-পদ্ধতিতে পুঞ্জীভূত হারে উৎপাদন করার দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ করা হয়, তার প্রভাবটা বহুদূর গিয়ে পড়বে। এ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের নক্সাকার ও উৎপাদকের সাফল্য জগতের অন্যান্য দেশের লোককে মুগ্ধ করেছে। কিন্তু অনেক সময়েই এই সাফল্য নিকৃষ্ট গঠন ও নিকৃষ্ট পরিকল্পিত বস্তু সামগ্রীর নিচে চাপা পড়ে। এই মানদণ্ডের ওঠা-নামার পিছনে ক্রেতা-আকর্ষণে নিযুক্ত শিল্পের অস্থায়ী মনোভাবের পরিচয় দেখা যায়, যে শিল্পে গুণের চেয়ে চিত্ত-বিনোদনের কদর বেশী। উপযোগিতা ও সৌন্দর্যবোধের সমন্বয়ে নির্দিষ্ট মনের বস্তু-সামগ্রীর উৎপাদনের প্রতি কারও বিশেষ উৎসাহ দেখা যায় না। প্রত্যেকটি তুচ্ছ শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয়ের জন্য অর্থহীন প্রচারে প্রচলিত বুলি প্রশ্নটাকে আরও অস্পষ্ট করে তুলেছে। আমাদের এই বিরাট শিল্প-ভিত্তিক সভ্যতার কোন উপকরণে স্থায়ী মূল্যবোধের প্রকাশ দেখা যায়, এর কোন দিকটা আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দেয় ও কোন উপকরণ এই যন্ত্রযুগের সাংস্কৃতিক

পটভূমিকা রচনার কাজে লাগাতে পারি তা বোঝার চেষ্টা কারও মধ্যে দেখা যাচ্ছে না। সাংস্কৃতিক সাফল্যের মূলে যে সংখ্যা বা পরিমাণ নয়, যা অপরিহার্য ও আদর্শগত তার নির্বাচন রয়েছে, সে কথা আমরা ভুলে যাই।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য আসে নির্বাচনের মধ্যে। বিচারের অভাব সাংস্কৃতিক যথেচ্ছাচারের সৃষ্টি করে। সত্য আদর্শলাভের জন্য যে আত্ম-সংযমের দরকার সেটা বোঝা উচিত, বোঝা উচিত যে শুধু সংগ্রহ করার চেয়ে স্বেচ্ছায় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করায় বেশী উদ্দীপনা আছে, সুন্দরকে উপভোগের সম্ভাবনা আছে। জাতীয় কর্মসূচীতে বৈচিত্র্যের জন্যই শুধু বৈচিত্র্যের ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত অতি বড় ভোগীব মনেও বিরক্তির উদ্রেক করবে ও অন্য দেশে আমাদের অতি বড় ভক্তদেরও আমাদের প্রতি বিরূপ করে তুলবে।

পরিমিতির চিন্তাটা কোনদিনই মার্কিনবাসীর মনে ধরে নি। তাদের জাতীয় ইতিহাসের প্রথম দিকে বিরাট পরিকল্পনার মধ্যে তারা প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে সকলের জন্যই পার্থিব সুখের ব্যবস্থা সম্ভব। কিন্তু এখন নূতন পথের সন্ধান করবার সময় এসেছে। এখানকার একটি বড় আদর্শ হল সমবায়ী প্রচেষ্টা ও সমন্বয়ী পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে আধুনিক জগতের বিশৃঙ্খল দৃশ্যের মধ্যে একটা দৃষ্টিগোচর শৃঙ্খলা সৃষ্টি করা।

স্থপতি হিসাবে গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের ধারণাটার প্রয়োগ ও নমনীয় আদর্শ সৃষ্টির সমস্যাটা আমি সমাধান করতে চাই। আগে থেকে তৈরি করা বাড়ি ( prefabricated ) জোড়া দিয়ে গড়ে তোলার পদ্ধতিটার বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু আমাদের গোড়াতেই ভুল হয়েছে বাড়ির বিভিন্ন অংশ তৈরি না করে সম্পূর্ণ বাড়িটা অভিন্নভাবে গড়া। এমন বাড়ির মধ্যে ঐক্য নেই, আছে একঘেয়েমি। মানুষ আগে থেকে তৈরি করা বাড়ি অপছন্দ করে কারণ তারা "উর্দিভুক্তি" ( regimentation ) সহ্য করতে পারে না। জোড়া দেওয়া বাড়ি তৈরির নূতন ধারায় বাড়ির বিভিন্ন অংশগুলিকে বিভিন্নভাবে সংযুক্ত করে বৈশিষ্ট্যের ক্ষুধা মেটান হয়। এইভাবে এগোলে কিছুদিনের মধ্যেই অল্পবিত্ত মানুষের জন্য সুলভ, সুন্দর ও স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ বাড়ি তৈরি সম্ভব হবে।

ইতিহাসের নজির এই আশার সমর্থন করে। সতেরো শতকে জাপানে শিল্প-রুচি সম্মত এমন জোড়া দেওয়া বাড়ির চলন ছিল। অবশ্য এটা তখন একটা কারিগরি বৃত্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। আজও জাপানে প্রয়োজনমত যে

কোন আকারের একটা বাড়ির বিভিন্ন অংশ কিনে তাড়াতাড়ি জোড়া দিতে পারা যায়। প্রত্যেক বাড়ির অংশগুলি এক, কিন্তু প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্র। প্রত্যেকটির মধ্যেই সৌন্দর্য ও মর্যাদার পরিচয় পাওয়া যায় ও সেইজন্য একই পরিবেশে সুন্দরভাবে খাপ খেয়ে যায়। এর তুলনায় আমাদের বড় রাস্তার বাড়িগুলির আকৃতিহীন আকার, রঙের ও মালপত্র ব্যবহারের কদাচার আমাদের অত্যন্ত চোখে লাগে। এই ধরণের জাপানী বাড়িতে অবশ্য আধুনিক জীবন-যাত্রার সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু এর পিছনে যে পরিণত নির্বাচন পদ্ধতি আছে তা আমাদের নূতন প্রযুক্তি-রীতির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা দরকার।

যে ধ্যান-ধারণা এমন সৌন্দর্য-নীতির সৃষ্টি করে তার শুধু ব্যক্তিগত হলে চলে না, সকলের মধ্যে সে ধ্যান-ধারণার পরিচয় থাকা দরকার। একটা প্রতিষ্ঠিত সমাজ-ব্যবস্থায় আপন অবদানে স্বাক্ষর রাখতে হলে এমনই স্পষ্ট মনোবৃত্তির পটভূমিকা-শিল্পীর দরকার। সমস্ত বড় সাংস্কৃতিক যুগে মানুষের তৈরি পরিবেশে একটা রূপের ঐক্য দেখা গেছে। পরে একেই আমরা একটা যুগের শৈলী বলি।

এই লক্ষ্যে পৌছতে হলে সমাজে শিল্পীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা চাই। আমাদের আধুনিক উৎপাদনের যুগে ইন্‌জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক ও ব্যবসায়ীর পাশে শিল্পীর বিশিষ্ট স্থান চাই। এরা একত্র না হলে সুষ্ঠু প্রয়োগ ও সুন্দর রূপের সংযোগ দেখা যাবে না। ব্যবসার ক্ষেত্রে কর্ম-প্রেরণার বিকাশ দরকার। গণতন্ত্রের পূর্ণ পরিণতি নির্ভর করে শিল্পীর সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদালাভের উপর।

আমেরিকার মার্জিতরুচি-মানুষ আজ সারা জগতে আকুল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এমন জিনিসের খোঁজে যাতে পুঞ্জীভূত উৎপাদনের ও বিক্রয়-সংস্থার ছাপ মারা নেই। এ জিনিসের তারা নিজের দেশে অভাববোধ করছে তাই এই ভাবাবেগগত অনুসন্ধানী যাত্রা। বহু পুরুষ ধরে কারিগরেরা সযত্নে উপযোগী অথচ সুন্দর যে আদর্শ জিনিস গড়ে তুলেছিল সংস্কৃত-মানুষ "কিউরিও" হিসাবে তার খোঁজ করছে। কিন্তু আমেরিকার নকলে অন্য দেশও উন্নত হচ্ছে। অতএব ওই কিউরিও অনুসন্ধানের সুযোগ ও উত্তেজনা ক্রমশই কমে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে যে কোন দেশই নিজের ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে এগোতে চাইছে, তারাই একটা বিশেষ কর্তব্য সাধনের সুযোগ হারাচ্ছে। একটি দেশের ঐতিহ্য, তার বিশেষ দর্শন এই কর্তব্যের দাবি করে, দাবি করে গুণ ও সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে এই যন্ত্রযুগের দুর্দশা তারা রোধ করুক।

যতদিন আমাদের "মার্জিত" গোষ্ঠীভুক্ত লোকের এ ধারণা থাকবে যে জনতার রুচি শোধন করা অসম্ভব ও অবুঝ জনগণের উপর একটা সৌন্দর্যের জ্ঞান চাপিয়ে দিতে হবে ততদিন গণতান্ত্রিক সমাজের বিশেষ চাহিদাটা মেটান যাবে না। এই "মার্জিত" গোষ্ঠীর ধারণাটার সূত্রপাত হয়েছে সেই যুগে যে যুগে একটা বিশেষ গোষ্ঠী রুচির ও উৎপাদনের মানটা স্থির করে দিতে পারত। আমাদের বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এ নীতি চলতে পারে না। যে সমাজ-ব্যবস্থা সকলকে সমান অধিকার দিয়েছে, আজ সেই অধিকারের অপব্যবহারে, মানুষের অজ্ঞতা ও অসাড়তার জন্য, সেই অধিকার যাতে নষ্ট না হয়ে যায় সমাজের সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এর জন্যই প্রয়োজন জনসাধারণের অনুভূতি ও বিচারশক্তির ক্রমশ বিকাশ, উপর থেকে আদর্শ চাপিয়ে দেওয়া নয়। সৌন্দর্যমূলক সৃষ্টিশক্তি কয়েকজন মাত্র মানুষকে আশ্রয় করে স্থায়ী হতে পারে। সমসাময়িক অবস্থার কুৎসিত দিকটাকে ঢেকে রাখা তার কাজ নয়, তা সে পারেও না। এটা সকলের কাজ। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, এটাই হল সংস্কৃতির আদর্শ ও এর মধ্যেই তার সূক্ষ্ম প্রকাশ হবে।

আগামী যুগে হয়তো সমাজে এই ঐক্যের প্রকাশ দেখা যাবে। তখন শিল্পীর ভূমিকা হবে সমাজের আদর্শ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার একটা মানবিক মূর্তি গড়া। একটা তাৎপর্যপূর্ণ শৃঙ্খলাধারার মূর্ত প্রতীক সৃষ্টির ক্ষমতা থাকায় শিল্পী আবার হয়তো সমাজের দ্রষ্টা ও উপদেষ্টার পদ ফিরে পাবেন। তিনি বিবেকের ধারক হিসাবে হয়তো আমেরিকার আজকে স্ববিরোধী সমস্যার সমাধান করতে পারবেন।

# প্রসার্যমান মনোজগত

## বার্ট্র্যাণ্ড রাসেল

তৃতীয় আর্ল রাসেল, এম্‌বারলির ভিস্‌কাউণ্ট রাসেল, গণিতবিদ, দার্শনিক, শিক্ষক ও লেখক বার্ট্র্যাণ্ড রাসেল নিজেকে বলেন "সুখী দুঃখবাদী"। রাসেল একজন নোবেল লরিয়েট। ১৯১৮ সালে শান্তিবাদী মতের জন্য তাঁকে কিছু দিন জেল খাটতে হয়। ১৯৬০ সালে নোবেল পুরস্কার দেবার সময় তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়, 'ইনি আমাদের যুগের যুক্তিবাদ, মানবিকতাবাদের একজন শ্রেষ্ঠ মুখপাত্র ও পশ্চিমে বক্তৃতার ও চিন্তার স্বাধীনতার নির্ভীক সমর্থক।" এখন লর্ড রাসেলের বয়স ৮৭ বৎসর। তিনি কিছুদিন করে ওয়েল্‌সে নিজের দেশের বাড়িতে কাটান ও কিছুদিন থাকেন লণ্ডনের টেম্‌সের ধারের বাড়িতে।

আমাদের মানস জীবনের উপর আধুনিক জ্ঞানের প্রভাব বিভিন্ন রূপে ও নানা ভাবে এসে পড়েছে। ভবিষ্যতে প্রভাবটা আরও বাড়বে বলে মনে হয়। মনের জীবনকে সাধারণত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়ঃ চিন্তা, ইচ্ছা ও অনুভূতি। এই শ্রেণীবিভাগ বিজ্ঞানসম্মত নয় কিন্তু আমাদের আলোচনার পক্ষে সুবিধাজনক। সেই জন্য একে মেনে চলব।

আধুনিক জ্ঞানের প্রাথমিক প্রভাবটা যে আমাদের চিন্তার ক্ষেত্রে এসে পড়েছে সেটা প্রত্যক্ষ। কিন্তু ইচ্ছা-অনিচ্ছার ক্ষেত্রেও এই প্রভাবের গুরুত্বটা আমরা ক্রমশই বুঝতে পারছি ও অনুভূতির জগতেও তার কাজটা অল্প গুরুত্ব-পূর্ণ হবার কথা নয় যদিও এই স্তরে প্রভাবটার স্পষ্ট প্রকাশ এখনও ধরা পড়ছে না। আমাদের বুদ্ধি-চিন্তার উপর আধুনিক জ্ঞানের প্রভাবের কথা নিয়ে প্রথমে সুরু করব।

একদল জ্যোতির্বিদের মতে আমাদের জড়-জগত ক্রমাগত বিস্তৃত হচ্ছে। যা কিছু আমাদের থেকে দূরে আছে, তা আরও দূরে চলে যাচ্ছে, এবং যত দূরে যাচ্ছে ততই পিছিয়ে যাওয়ার গতি বেড়ে চলেছে। যাঁরা এই মতে বিশ্বাস করেন তাঁদের ধারণায় বিশ্ব-জগতের অতি দূরের জিনিস অবিরতই আমাদের দৃষ্টির বাইরে চলে যাচ্ছে কারণ তাদের অপসরণের গতি আলোর গতিবেগের

চেয়ে বেশী। এই প্রসার্যমান বিশ্ব-জগতের ধারণাটা চিরকাল মেনে নেওয়া হবে কিনা জানি না, কিন্তু এটা জানি আমাদের মনের জগতের প্রসার ঘটছে। বিজ্ঞান যেমন ভাবে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে দেখিয়েছে তেমন করে ওকে দেখতে হলে আমাদের কল্পনাকে দেশে ও কালে এতদূর বিস্তৃত করতে হবে যা পূর্ববর্তী যুগে কখনও করতে হয় নি ও যা আজও অত্যন্ত কষ্টসাধ্য।

শূন্যে জগতের বিস্তারের ধারণাটার সূত্রপাত করেন গ্রীক জ্যোতির্বিদেরা। এনাক্সাগোরাস, যাঁকে পেরিক্লিস এথেন্সে ডেকে এনেছিলেন এথেন্সবাসীকে দর্শন শিক্ষা দেওয়ার জন্যে, তিনি ঘোষণা করেন পেলেপেনসাস পাহাড়ের মতই সূর্যটা বড়। এনাক্সাগোরাসের সমসাময়িকেরা তাঁর এই উক্তিটাকে একটা অসম্ভব অতিরঞ্জন বলে ধরে নেন। কিন্তু অল্প কিছুদিন পরেই জ্যোতির্বিদেরা পৃথিবী থেকে সূর্যের ও চাঁদের দূরত্বটা মাপার উপায় আবিষ্কার করলেন। এই পরিমাপ অভ্রান্ত না হলেও তার থেকে একথা সহজেই প্রমাণিত হল যে সূর্যটা পৃথিবীর চেয়ে অনেকগুণ বড়। সিসেরোর শিক্ষক পসিডোনিয়াস পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বটার যে হিসাব দেন সেটা সেদিনের পক্ষে শ্রেষ্ঠ হিসাব ছিল। সত্য মাপের অর্ধেকটা তাঁর গণনায় ধরা পড়ে। পসিডোনিয়াসের পরে যে সব জ্যোতির্বিদদের আবির্ভাব হয়েছিল তাঁদের গণনায় আরও ভুল ছিল। কিন্তু তাঁরা সকলেই বুঝতে পেরেছিলেন যে সৌর জগতের তুলনায় আমাদের এই পৃথিবীর আকারটা একেবারে অকিঞ্চিৎকর।

মধ্য যুগে বুদ্ধির অবনতি ঘটে। গ্রীকরা যে জ্ঞান-সঞ্চয় করে লোকে তা ভুলে যায়। মধ্য যুগে বিশ্বের সব চেয়ে ভাল ছবি পাওয়া যায় দাঁতের 'প্যারাডিসো'তে (Paradiso)। তাঁর কল্পনায় চাঁদ, সূর্য, নানা গ্রহ, স্থির তারকা ও স্বর্গ কতকগুলি সমকেন্দ্রিক বৃত্তের মধ্যে রয়েছে। বিয়াত্রিসের পরিচালনায় দাঁতে চব্বিশ ঘণ্টায় এই সব বৃত্তগুলি ঘুরে এসেছিলেন। আধুনিক মানুষের কাছে এই ব্রহ্মাণ্ডের ছবিটা অত্যন্ত ছোট ও সরল বলে মনে হবে। যে দুনিয়ায় আজ আমরা বাস করি তার সঙ্গে দাঁতের জগতের তুলনায় হয় ঝঞ্ঝা-ক্ষুব্ধ সমুদ্রের সঙ্গে চিত্র-বিচিত্র ওলন্দাজকৃত গৃহাভ্যন্তরের দৃশ্যের। দাঁতের জগতে কোন রহস্য নেই, অতল গহ্বর নেই, অজানা জগতের অভাবনীয় সমাবেশ নেই। সে জগত মানুষের উপযোগী, আরামদায়ক, স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ। কিন্তু আধুনিক জ্যোতিষের সঙ্গে পরিচিত মানুষের কাছে এই বিশ্ব একটা বদ্ধ ঘরের মত মনে হবে। এর শৃঙ্খলাটা স্বর্গের মুক্ত হাওয়ার স্বাদ না দিয়ে আমাদের কারাগারের কথা মনে করিয়ে দেবে।

সতেরো শতকের গোড়া থেকে বিশ্বের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা দেশে ও কালে বহুদূর বিস্তার লাভ করেছে। অল্প কিছু দিন আগে পর্যন্ত মনে হয়েছিল এই বিস্তৃতির বোধ হয় কোন শেষ নেই। দেখা গিয়েছিল যে পৃথিবীর থেকে সূর্যের দূরত্বটা গ্রীকদের অনুমানের চেয়ে অনেক বেশী ও কতকগুলি গ্রহ সূর্যের চেয়েও অনেক দূর। সূর্যের আলোক আমাদের কাছে পৌছতে আট মিনিট সময় লাগে কিন্তু সব চেয়ে কাছের নিশ্চল তারার আলো পৌছয় প্রায় চার বছরে। যে তারাগুলিকে আমরা খোলা চোখে দেখতে পাই সেগুলি আমাদের প্রতিবেশী। তারা ছায়াপথভুক্ত এক বিরাট গোষ্ঠি। এই এক গোষ্ঠিভুক্ত তারাগুলিকে আমরা খোলা চোখে দেখতে পাই। কিন্তু এমন শত-সহস্র গোষ্ঠি বিশ্বাকাশে রয়েছে। এর সংখ্যার হিসাব এখনও পাওয়া যায় নি ও দূরবীনের যত শক্তি বাড়ছে ততই নূতন তারকা-গোষ্ঠির আমরা সন্ধান পাচ্ছি।

কল্পনার সাহায্যের জন্য কতকগুলির সংখ্যার হিসাব দেওয়া যেতে পারে। আমাদের সবচেয়ে কাছের নিশ্চল তারাটির দূরত্ব প্রায় পঁচিশ লক্ষ কোটি মাইল। ছায়াপথের মত বহু কোটি তারকাপুঞ্জ রয়েছে ও তাদের একটি থেকে আর একটি যেতে আলোর সময় লাগে প্রায় কুড়ি লক্ষ বছর। বিশ্বে জড় বস্তুর পরিমাণ বিশাল। সূর্যের ওজন প্রায় দুই বিলিয়ন বিলিয়ন বিলিয়ন টন। ছায়াপথের ওজন সূর্যের ওজনের চেয়ে প্রায় ষোল কোটি গুণ বেশী। ছায়া-পথের মত বহুকোটি তারকা-গোষ্ঠী রয়েছে। কিন্তু এত জড় পদার্থ থাকা সত্ত্বেও বিশ্বের বেশীর ভাগ অংশ, অনেক বড় অংশ শূন্য বা প্রায় শূন্য।

সময়ের গণনাতেও মনের এমনই বিস্তার দরকার। এই প্রয়োজন প্রথম বোঝা যায় ভূবিদ্যা ও প্রত্নজীববিদ্যার অনুশীলনে। জীবাশ্ম ( ফসিল ), পালবিক প্রস্তর ও আগ্নেয় প্রস্তরে পৃথিবীর বহু প্রাচীন ইতিহাসের কথা লেখা আছে। তারপর আসে সৌরজগত ও নীহারিকার উৎপত্তি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত। এখন অত্যন্ত শক্তিশালী দূরবীন দিয়ে এত দূরের তারা দেখতে পাই যার আলো আমাদের কাছে পৌছতে পঞ্চাশ কোটি বছর লেগেছে। অর্থাৎ আমরা এখন যা দেখছি তা এখনকার ঘটনা নয়, তা ঘটেছিল সেই বহু বহু দূরবর্তী অতীতে।

যে বর্ণনা দিলাম তা থেকে আমাদের মনোরাজ্যে চিন্তার ক্ষেত্রে কতদূর প্রসার ঘটেছে তার পরিচয় পাওয়া যাবে। এখন দেখাতে চাই ইচ্ছা ও অনু-ভূতির ক্ষেত্রে এই বিস্তৃতির ফলটা কেমন হয়েছে বা হওয়া উচিত।

যারা আমাদের এই ছোট পৃথিবীকে নিয়ে ব্যস্ত, যাদের দৃষ্টি পৃথিবীর সীমানা ছাড়িয়ে বাইরের দেশকাল পর্যন্ত পৌছয় নি, তাদের কাছে ব্রহ্মাণ্ডের অতল গহ্বরের ছবিটা বিভ্রান্তিকর ও কষ্টকর বলে মনে হবে। বিশাল বিশ্বের তুলনায় আমাদের ক্ষুদ্রতা বোধটা আমাদেব হাত-পা অবশ করে দেবে। কিন্তু এটা যুক্তিযুক্ত নয় ও এই মনোভাব স্থায়ী হওয়া উচিত নয়। শুধু একটা পরিমাণ বা আকারের পূজা করার কোন যুক্তি নেই। একটা বোগা লোকের চেয়ে মোটা মানুষকে আমরা বেশী শ্রদ্ধা দেখাই না। একটা জলহস্তীর চেয়ে স্যার আইজাক নিউটনের চেহারাটা অনেক ছোট। তাই বলে জলহস্তীর চেয়ে নিউটনের মূল্য কমে যায় না। মানুষের মনেব পরিধির বিচার তার দৈহিক আকারের বিচারে হতে পাবে না। মনের পরিমাপ কবতে হলে তা করতে হবে সেই মন, চিন্তা ও কল্পনার মধ্যে বিশ্বের আয়তন ও জটিলতাটা কতখানি ধরতে পারছে তার বিচাবে। বিশ্ব-পবিচয়ের বিকাশের সঙ্গে জ্যোতির্বিদের মনটারও পদে পদে বিস্তার ঘটা উচিত। আমি তাঁব মনের বুদ্ধি-বিচারের দিকটার কথা শুধু বলছি না, তাঁর সামগ্রিক মনের প্রসারতার কথা বলছি। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যদি সমগ্র ভাবে বড হয়ে উঠতে চায় তাহলে বুদ্ধির সঙ্গে তার ইচ্ছা ও অনুভূতিটাবও বিকাশ দবকাব। এ যদি না হয়—যদি বুদ্ধি হয় বিশ্বব্যাপী ও ইচ্ছা ও অনুভূতিটা হয় সঙ্কীর্ণ—তা হলে মনেব জগতে একটা এমন অসামঞ্জস্য ও বিকাব দেখা দেবে যাব ফলটা কিছুতেই ভাল হতে পারে না।

এতক্ষণ বিচারবুদ্ধির কথা নিয়ে আলোচনা কবেছি, এইবার মানুষের জ্ঞান বা বোধির কথা বলব, যার মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষা, ইচ্ছাশক্তি ও অনুভূতিব সমন্বয়ের অভিব্যক্তি দেখা যায়। বিচারবুদ্ধি বাডলেই জ্ঞানগভতা বাডে না।

ইচ্ছাশক্তির বিষয় নিয়ে সুরু করা যাক। অনেক জিনিস আছে যা চাইলে পাই, আবার এমন জিনিস আছে যা পাওয়ার বাইরে। ক্যানুট্ সম্বন্ধে গল্প আছে তিনি সমুদ্রের জোয়ারের জলকে অগ্রসর হতে বারণ করেছিলেন। যা মানুষের ক্ষমতার বাইরে তাকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ কবার হাস্যকর ইচ্ছার এ একটা দৃষ্টান্ত। অতীত কালে, মানুষের ইচ্ছামত কাজ করার ক্ষমতাটা ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। খারাপ লোক, তাদের যতই অসৎ উদ্দেশ্য থাক, মানুষের ক্ষতি করতে পারত কম। সৎ লোক, তাদের উদ্দেশ্য যতই সাধু হ'ক, মানুষের শুধু একটা নির্দিষ্ট সীমিত পরিমাণ উপকাব করতে পারত। কিন্তু জ্ঞান বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ইচ্ছামত কাজ করার ক্ষমতা অনেক বেড়ে গেছে।

আজকের বিজ্ঞান-চালিত জগতে ও বিশেষ করে অদূর ভবিষ্যতের বিজ্ঞান-চালিত জগতে, অসৎ লোক যে ক্ষতি করতে পারবে ও সৎ লোক যতটা ভাল করতে পারবে তা আমাদের পূর্বপুরুষদের অত্যুগ্র কল্পনারও বাইরে ছিল।

মধ্যযুগের প্রায় শেষ পর্যন্ত আমরা চার রকমের মৌলিক পদার্থের কথা জানতাম, মাটি, জল, বায়ু ও অগ্নি। এই তত্ত্বের সীমিত স্বরূপ যতই স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল ততই বৈজ্ঞানিক-স্বীকৃত মৌলিক পদার্থের সংখ্যা বেড়ে উঠতে লাগল যতক্ষণ না তাব হিসাব এসে দাঁড়াল বিরানব্বুই-এ। পরমাণু সম্বন্ধে আধুনিক পরীক্ষায় দেখা গেছে প্রকৃতিতে যে মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায় না তাও কৃত্রিম উপায়ে উৎপাদন করা সম্ভব। দুঃখের বিষয় এই নূতন মৌলিক পদার্থ ধ্বংসাত্মক। এমন পদার্থের অতি অল্প পরিমাণ ব্যবহার বহু লোকের মৃত্যুর কারণ হতে পারে। এই হিসাবে সাম্প্রতিক বিজ্ঞান মানবকল্যাণের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে রোগ জয় করতে ও মানুষের আয়ু বাড়াতে বিজ্ঞান যা করেছে তাকে অলৌকিক বলে মনে হবে।

মানুষের এই শক্তি বৃদ্ধি পৃথিবীর সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই পৃথিবীর উপর জীবনটাকে যেমনভাবে আজ গড়তে পারি, বা খেয়াল হলে ধ্বংস করতে পারি, তেমন আগে কোনদিন পারিনি। যদি হঠাৎ তেমন খেয়ালের বশবর্তী হয়ে মানুষের অস্তিত্ব শেষ না করে দিই তবে কিন্তু আমাদের শক্তির বিকাশের অগাধ সম্ভাবনা আমাদের সামনে থাকবে। খরচটা প্রয়োজনীয় ও ফলপ্রসূ বলে বোধ হলে আজ আমরা চাঁদে অভিক্ষেপ যন্ত্র পাঠাতে পারি। অনেকে বলেন সময়ে চাঁদকে তাঁরা মানুষের জীবন-ধারণের উপযোগী করে তুলতে পারেন। মঙ্গল ও শুক্রগ্রহকে জয় না করতে পারারও কোন কারণ নেই। অন্যদিকে সেনেটার জনসন সেনেটে যে কথা ঘোষণা করেছেন, আমাদের নিজেদের গ্রহেও বিজ্ঞানের সাহায্যে অভূতপূর্ব ও আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটান সম্ভব। তাঁর কথায়, বিজ্ঞান আজ "পৃথিবীর আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখে, বিজ্ঞান অনাবৃষ্টি ও বন্যা সৃষ্টি করতে পারে, জোয়ারের স্রোতকে উল্‌টো মুখে বহাতে পারে, সমুদ্রের উচ্চতা বাড়াতে ও গরম দেশকে হিমমণ্ডলে পরিণত করতে পারে।"

এই বিরাট শক্তির যেদিন অধিকারী হব তখন তাকে কিভাবে কাজে লাগাব? মানুষ এতদিন তার অজ্ঞতা ও অপটুতা-অক্ষমতার জন্য নিজের জীবনটাকে রক্ষা করে আসতে পেরেছে। মানুষ হিংস্র জীব এবং প্রতি যুগেই

কোন না কোনও ক্ষমতাবান লোক অন্যের যতদূর সম্ভব ক্ষতি করবার করে এসেছে। কিন্তু তখন তাদের হাতিয়ারগুলি ছিল অনুন্নত, কাজেই তাদের ক্ষমতাটাও ছিল সীমাবদ্ধ। এখন আমাদের বুদ্ধি বেড়েছে, প্রয়োগকৌশল উন্নত হয়েছে। অতীতের অত্যাচারী মনোবৃত্তির নির্দেশে যদি এখনও চলি তাহলে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য। আমরা বিরাট সরীসৃপ ডাইনোস্তোরের মত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব। তারাও একদিন সৃষ্টির অধীশ্বর ছিল। সেদিনে যুদ্ধ জয়ের জন্য তারা দেহের উপর অসংখ্য ধারাল শিং গজিয়ে তুলেছিল। যদিও কোন বিরাটতর ডাইনোস্তোরের হাতে তাদের পরাজয় স্বীকার করতে হয়নি, তবুও তারা পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তাদের জায়গা ছেড়ে গিয়েছিল ইঁদুরের মত ছোট ছোট জীবের জন্য।

আমাদের ভাগ্যেও ওই একই জিনিস ঘটবে যদি বুদ্ধি-বৃত্তির সঙ্গে বিচক্ষণতার সংযোগ না ঘটাতে পারি। মনের চক্ষে দেখতে পাচ্ছি একদিন হাইড্রোজেন বোমা সমেত দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষেপণযন্ত্র চাঁদে গিয়ে নাববে ও দু'জনাই দু'জনকে নিশ্চিহ্ন করবে। ভবিষ্যতের এই ছবি আমার কাছে খুব আকর্ষণীয় বলে বোধ হয় না। আমার মতে যতদিন না নিজের সংসারে আমরা শৃঙ্খলা আনতে পারি ততদিন চাঁদের শান্তিটুকু আমাদের না ভাঙাই উচিত। আজও পর্যন্ত আমাদের নিবুর্দ্ধিতা পৃথিবীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে, তাকে বিশ্ব-জগতের মধ্যে বিস্তৃত করার জয়টা ঠিক জয় হবে না।

ইচ্ছা পূরণের যে ক্ষমতা বিজ্ঞান আজ আমাদের হাতে দিয়েছে তাকে যদি অভিশাপে পরিণত করতে না চাই, তবে আমাদের সেই ইচ্ছাটাকে সংযত করতে হবে। মহৎ উদ্দেশ্যলাভের জন্য তাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। এতদিন প্রতি রবিবারে প্রতিবেশীকে ভালবাসার উপদেশ পেয়েছি ও সোম থেকে শনিবার পর্যন্ত প্রতিবেশীর প্রতি ঘৃণা দেখিয়ে এসেছি। একদিন ভালবাসার কথা শুনেছি, ছয়দিন ঘৃণা করার সুযোগ পেয়েছি। ঘৃণা করার ফলটা অবশ্য এ পর্যন্ত আমাদের অক্ষমতার জন্যই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু নূতন যে জগতে প্রবেশ করছি সেখানে এ সীমারেখা মুছে যাবে। তখনও যদি ঘৃণাবৃত্তি না ছাড়তে পারি তবে একদিন বিপর্যয় আসবে সর্বাঙ্গীন ও সমগ্রভাবে।

এই বিচার থেকে আমরা অনুভূতির কথায় এসে পড়ি। জীবনের লক্ষ্য স্থির করায় অনুভূতির নির্দেশ থাকে। যে প্রবল শক্তি আজ আমাদের হাতে এসেছে তার ব্যবহারটা নিয়ন্ত্রিত হবে আমাদের ভাবাবেগের জগতে। মনের

অন্যান্য বৃত্তিগুলি যেমন ক্রমশ বিকশিত হয়েছে, আমাদের অনুভূতিগুলিরও সেইভাবে বিকাশ ঘটেছে। অতি প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ দল-বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং যুগের পর যুগ দল বেড়ে উঠে ক্রমশ পরিবার থেকে উপজাতি, উপজাতি থেকে জাতি ও জাতি থেকে জাতিসঙ্ঘের উদ্ভব হয়েছে। এই রূপান্তরের সময় জৈব প্রয়োজনে দুটি বিপরীত নীতিজ্ঞান ও নীতিগত ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এক নীতি আপন গোষ্ঠীগত মানুষের জন্য। বিপরীত নীতি গোষ্ঠী বহির্ভূত মানুষের জন্য। ঈশ্বরের দশটি আদেশের মধ্যে একটি হল চুরি বা খুন করবে না। কিন্তু নিজের দলের বাইরে এই নিষেধটা মানা না মানার অন্য নীতি আছে। ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তির অনেকেরই খ্যাতি রটেছে ভিন্ন দলের মানুষ মাবাব কাজে তার নিজের দলের মানুষকে বিশেষভাবে কুশলী করে তোলার জন্য। আজও পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডের অভিজাত পরিবার নিজেদের নর্মানগোষ্ঠীভুক্ত বলে প্রমাণ করতে পারলে ও নর্মানরা স্যাক্সনদের হটিয়ে দিয়েছিল বলে প্রমাণ করতে পারলে গর্ব অনুভব করে।

আমাদের ভাবাবেগগত জীবন আজ এমনভাবে গঠিত যে এক দলের সঙ্গে অন্য দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক যে বিরোধিতা তা তার পক্ষে প্রাণ ধারণের দিক থেকে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আধুনিক প্রয়োগকৌশলে যে নূতন জগতের আজ সৃষ্টি হয়েছে সে জগতের আর্থিক উন্নতি আজ দলগত বিরোধ ও জয়-পরাজয়ের উপর নির্ভর করে না। এক অসভ্য জাতি অন্য আর এক অসভ্য জাতিকে পরাজিত করতে পারলে সেই বিরোধী জাতির নর-মাংসই শুধু খেতে পায় না, তাদের জমি-জমা পায় ও নিজেদের জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য বাড়িয়ে তুলতে পারে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত বিজয়ী জাতি তার জয়ের এই সুখ-সুবিধা কোনও না কোনভাবে উপভোগ করে এসেছে।

কিন্তু এখন তার ঠিক উল্‌টো ঘটছে। এখন অর্থনৈতিক উন্নতি লাভ হয় দুই জাতির সহযোগিতায় তাদের পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নয়। প্রতিদ্বন্দ্বিতা যে চলেছে তার কারণ আধুনিক প্রয়োগ-বিদ্যার সঙ্গে আমাদের অনুভূতির এখনও মিল হচ্ছে না। প্রতিদ্বন্দ্বিতা যেভাবে চলেছে তাতে বিপর্যয় যে অবশ্যম্ভাবী তা স্পষ্ট, কিন্তু তবুও বিভিন্ন জাতি একে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে রয়েছে। এর কারণ আমাদের প্রয়োগকৌশল যতটা উন্নত হয়েছে আমাদের ভাবাবেগ ততটা উন্নত হতে পারেনি।

প্রয়োগকৌশলের অনুভূতিশূন্য বিস্তার সার্থক হয় না কারণ তাতে অভিপ্রায়ের সমন্বয় ঘটে না। প্রয়োগ-সমৃদ্ধ জগতে একদিকে যা ঘটে অন্যদিকে

তার ফলটা দেখা যায়। আমাদের অনুভূতির মধ্যে যদি এর একটা দিক ধরা পড়ে, তাহলে সমস্ত যন্ত্রটাই অচল হয়ে যায়। এর দৃষ্টান্ত বিবতনের সর্বস্তরে দেখা গেছে। সমুদ্রের জলে যে স্পন্‌জ ( sponge ) থাকে তার সঙ্গে একটা ফ্ল্যাট বাড়ির তুলনা চলতে পারে। এই স্পন্‌জ ছোট ছোট বিভিন্ন প্রাণীর আবাসস্থল। এই প্রাণীদের মধ্যে কেউ অন্য কারও উপর নিভরশীল নয়, নিজের নিজের পৃথক স্বার্থ নিয়ে তারা বেঁচে থাকে। উন্নত জীবের দেহেও বিভিন্ন জীবকোষগুলির কিছুটা পৃথক সত্তা আছে, কিন্তু সারা দেহের বর্ধন না হলে জীবকোষগুলিও বাডতে পায় না। ক্যানসারে কতকগুলি জীবকোষ সাম্রাজ্যবাদীর ভূমিকা নিয়ে দেহের অন্যান্য অংশে তার প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করে কিন্তু এইভাবে সারা দেহের মৃত্যুতে সে নিজেরই মৃত্যু ডেকে আনে। স্বার্থের দিকে মানুষের দেহটা "একক"। পায়ের বুড়ো আঙুলের স্বার্থটা হাতের কড়ে আঙুলের স্বার্থের বিরোধী হতে পারে না। দেহের কোন অংশের উন্নতি করতে গেলে সর্বাঙ্গের সহযোগিতায় সারাদেহের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করতে হয়।

নিখুঁতভাবে না হলেও মানুষের সমাজেও এমনি ধরণেরই একটা ঐক্য ঘটেছে। স্বাস্থ্য ভাল থাকলে যা খাই তা সারা শরীরকে পুষ্ট করে। তখন বলি না অন্যের উপকারের জন্য আমাদের মুখটা কতই না নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ করছে। বিজ্ঞান-নিভর সমাজকে তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে হলে এমনইভাবে এক হতে হবে, নিঃস্বার্থ হতে হবে। জগতের বিভিন্ন দেশের পরস্পর নির্ভরতাই অনুভূতির ক্ষেত্রটার প্রসারটাকে আজ প্রয়োজনীয় করে তুলেছে।

সম্ভাব্য ভবিষ্যতের একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। ধরা যাক দক্ষিণ গোলকের কোন দেশ দক্ষিণ মেরুদেশকে বসবাসের উপযোগী করে তুলতে চায়। তাদের প্রথম কাজ হবে বরফ গলান যা আগামী যুগের বিজ্ঞান সম্ভব করে তুলতে পারবে বলে বোধহয়। বরফ গলানর ফলে সমুদ্রের উচ্চতা সর্বত্র বেড়ে যাবে। যার ফলে হল্যাণ্ডের বেশীর ভাগ অংশ, লুসিয়ানা ও অন্যান্য নিচু জমি সব ডুবে যাবে। যে দেশের লোককে ডোবাবার চেষ্টা হবে তারা নিঃসন্দেহে প্রতিবাদ করবে। এই অতি অদ্ভুত উপমাটি উত্থাপন করার কারণ হল আমি এমন কোন দৃষ্টান্ত নিতে চাই না যাতে রাজনৈতিক বিরোধগত বিরাগের সৃষ্টি হয়। যে কথা বলতে চাইছি তা হল পরস্পর নির্ভরতার জন্য উদ্দেশ্যের একতা থাকা দরকার না হলে বিপর্যয় ঘটা

অনিবার্য। এই উদ্দেশ্যের একতা লাভ সম্ভব হবে না যদি না অনুভূতির ঐক্য থাকে, সকলের অনুভূতির মধ্যে একটা সাম্য থাকে। প্রবাদ বাক্য আছে বেড়ালেরা লড়াই করে যতক্ষণ না তাদের ল্যাজের ডগাটুকু শুধু বাকি থাকে। পরস্পরের মধ্যে প্রীতি থাকলে তারা সুখে বেঁচে থাকতে পারত।

ধর্ম আমাদের প্রতিবেশীকে ভালবাসতে ও অন্যের শুভ কামনা করতে শিখিয়েছে। দুঃখের বিষয় কর্মী, তৎপব মানুষ এ কথায় কর্ণপাত করেনি। কিন্তু যে নূতন জগত সৃষ্টি হতে চলেছে সেখানে এই দয়া-দাক্ষিণ্যের অনুভূতি শুধু যে নৈতিক কর্তব্য তাই নয়, আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজন। যদি হাতটা পায়ের সঙ্গে ও পাকস্থলীটা যকৃতের সঙ্গে বিরোধ বাধায়, তা হলে শরীরটা আর বেশীদিন টিকতে পারে না। এ দিক থেকে মানুষের সমাজটা ক্রমশই প্রায় মানুষের দেহের মত হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমাদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে হলে আমাদের এখন অনুভূতি চাই যার মধ্য দিয়ে সামগ্রিকভাবে সমস্ত সমাজ-জীবনের কল্যাণ চাইব। দেহের যেমন কোন একটি অঙ্গের প্রতি আমরা বেশী প্রীতি দেখাই না, জগত-সমাজের ক্ষেত্রেও আমাদেব সমাজের কোন একটি অংশের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখালে চলবে না। অন্য কোন সময়ে এমন পক্ষপাত শূন্য অনুভূতিটার মহত্ত্বটা বোঝা যেত কিন্তু আজ মানুষের ইতিহাসে এই প্রথম এই অনুভাবনাটা একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। এই অনুভূতি না থাকলে তার চাওয়াটা সার্থক হবে না।

দ্রষ্টা ও কবি বহুদিন আত্ম-প্রসারের এই রকম ছবি দেখেছেন। তাঁরা বলেছেন যে মানুষ প্রকৃত জ্ঞানী হতে পারে, যে জ্ঞান শুধু তথ্য জানার মধ্যে নেই, শুধু ইচ্ছা বা শুধু অনুভূতিতে নেই, তার মধ্যে এই সবেরই সমন্বয় ঘটে।

গ্রীকদের মধ্যে কয়েকজনের, বিশেষ করে সক্রেটিসের বিশ্বাস ছিল তথ্যের অবগতির মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ মানুষ তৈরি করা সম্ভব। সক্রেটিসের মতে কেউ ইচ্ছা করে পাপ কাজ করে না, কি করছে জানলে মানুষ উচিত ব্যবহারের পথ থেকে বিচ্যুত হত না। আমি এ কথায় বিশ্বাস করি না। অতি শিক্ষিত ও অত্যন্ত কু-মতলবী শয়তানের ছবি আমরা কল্পনা করতে পারি, এবং দুঃখের বিষয় মানুষের ইতিহাসে এমন শয়তানের পরিচয় আমরা যে না পেয়েছি তা নয়। অজ্ঞানের জায়গায় জ্ঞানের সন্ধানে নাবলেই সব হয় না। সেই সঙ্গে অমঙ্গল ইচ্ছার বদলে মঙ্গল

ইচ্ছা চাই। শিক্ষা প্রকৃত জ্ঞানের সবটুকু না হলেও, তার একটি মূল উপকরণ।

সদ্যোজাত শিশুর জগত তার সাক্ষাৎ পরিবেশের মধ্যে আবদ্ধ। যা প্রত্যক্ষভাবে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য তারই মধ্যে এই ছোট জগতটা সীমাবদ্ধ। এখানে এখনই যা দেখছি বা জানছি তাই দিয়ে ওই জগত গড়ে উঠেছে। জানার মধ্যে এই সীমানা দূরে সরে যায়। স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর জীবনে অতীত ও সুদূর ভবিষ্যতের ছবিটা স্পষ্ট করে তোলে। শিশু যখন বৈজ্ঞানিক হয়ে ওঠে তখন তার জগতে ধরা পড়ে অতি দূরবর্তী দেশ-কালের সেই অংশ যার কথা আমি আগে বলেছি। বিজ্ঞতা লাভ করতে হলে এই জ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে তার অনুভূতির প্রসার চাই। ধর্মতত্ত্ববিদ বলেন ঈশ্বর জগতকে সমগ্রভাবে অবিচ্ছিন্নভাবে দেখেন, তার মধ্যে স্থান-কালগত কোন আবদ্ধতা নেই, তার মধ্যে ইন্দ্রিয়ের ও অনুভূতির য আবদ্ধতা আমাদের সকলের মধ্যেই কিছু না কিছু পরিমাণে দেখা যায়, া সম্পূর্ণ লুপ্ত। এমন সর্বাঙ্গীন অপক্ষপাত আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, আমাদের জীবনধারণের পক্ষেই অসম্ভব। কিন্তু আমাদের ক্ষমতার সীমানার মধ্যেই যতদূর সম্ভব অন্তরের এই প্রসারতা লাভ করা দরকার।

দৈনিক জীবনে আমাদের নিয়ত অশান্তি, ভাবনা-চিন্তা ও নিরাশার সামনে পড়তে হয়। আমাদের পরিবেষ্টনী আমাদের সামনে যে বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত করে তাকে নিয়েই আমরা সহজে লিপ্ত হয়ে পড়ি। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানীলোক প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে এমন বিশাল জগত আমরা সৃষ্টি করতে পারি যেখানে প্রতিদিনের অশান্তি আমাদের বিচলিত করতে পারে না, যেখানে যে লক্ষ্য আমাদের গভীর ভাবাবেগ জাগরিত করে তার মধ্যে বিশ্ব-চিন্তার বিশালতাটা ধরা পড়ে। এই অভিজ্ঞতা কারও বেশী হয়, কারও কম হয়। কিন্তু যার মধ্যে চেষ্টা আছে সে তার জগতটাকে কিছুটা বিস্তৃত করতে পারবেই, সে নিজের মধ্যে এমন একটা শান্তির সৃষ্টি করতে পারবে যা তার কাজে বাধা দেবে না, কিন্তু সেই কাজের মধ্যে বিক্ষোভও জাগবে না।

মনের যে অবস্থার কথা এতক্ষণ বর্ণনা করতে চাইছি তাকেই প্রকৃত জ্ঞান বলি। এবং এই জ্ঞান সত্যই মণি-মাণিক্যের চেয়ে মূল্যবান। আজকে এমন জ্ঞানের, বিজ্ঞতার মানুষের একান্ত প্রয়োজন। এই বিচক্ষণতা লাভ করতে পারলে প্রকৃতির উপর আমরা যে আধিপত্য পেয়েছি তা দিয়ে

আমাদের জীবনটাকে সুখ ও শান্তির মধ্যে এমনভাবে গড়তে পারি যা আগে আমরা কখনও কল্পনাও করতে পাবি নি। এ যদি না পারি, বুদ্ধির বিস্তার আমাদের সংশোধনাতীত ধ্বংসের মুখে নিয়ে যাবে। মানুষ বহু ভাল ও বহু মন্দ কাজ করেছে। তার কোন কোন ভাল কাজ আমাদেব অশেষ মঙ্গলসাধন করেছে। যাঁরা এই মঙ্গল চান বর্তমানের এই পথ নির্বাচনের দিনে তাঁদের সমস্ত অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করতে হবে যাতে আমরা প্রকৃত জ্ঞানের পথটা বুদ্ধিমানের মতো বেছে নিতে পাবি।

——*——